# রাষ্ট্রদর্শনে গণতন্ত্রের অবস্থান এবং বাংলাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ**

**গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক**

ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

**গবেষক**

মোসাঃ রেবেকা সুলতানা
নিবন্ধন নং: ০২, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬
দর্শন বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
# দর্শন বিভাগ

## প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, গবেষক অত্র অভিসন্দর্ভে যেসব পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছেন। নির্দেশিত অংশ ব্যতীত বাকি অংশ গবেষকের নিজের। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের পিএইচ.ডি. বা উচ্চতর কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

**ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ**
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, অত্র অভিসন্দর্ভে যেসব পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি। নির্দেশিত অংশ ব্যতীত বাকি অংশ আমার নিজের। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের পিএইচ.ডি. বা উচ্চতর কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

মোসাঃ রেবেকা সুলতানা
পিএইচ.ডি. গবেষক

*Dhaka University Institutional Repository*

# কৃতজ্ঞতা

"রাষ্ট্রদর্শনে গণতন্ত্রের অবস্থান এবং বাংলাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা"-এ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক ও লেখকদের অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ এবং দৈনিক ও বার্ষিক পত্রিকাদি থেকে অনেক দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ সকল রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক লেখকদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বর্তমান গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে অপরিসীম ধৈর্য সহকারে সহযোগিতা করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম করেছেন। তিনি প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি আমার ঋণ ও গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

এছাড়া গবেষণাকর্মকে যাঁরা তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাজাহান মিয়া, ড. নাইমা হক, অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামান, বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন। তাঁদের সকলের প্রতি আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার মা-বাবার আশীর্বাদ এ গবেষণাকর্মে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এ গবেষণা কাজে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দর্শন বিভাগের সেমিনার, পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার সহ আরও অনেক গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এছাড়া আমাকে সহযোগিতার জন্য এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. শাখার কর্মকর্তা জনাব সতীশ চন্দ্র মজুমদার ও বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা পানু গোপাল পালকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোসাঃ রেবেকা সুলতানা

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| *প্রত্যয়নপত্র* | *ii* |
| *ঘোষণাপত্র* | *iii* |
| *কৃতজ্ঞতা* | *iv* |
| ভূমিকা | ১ |
| **প্রথম অধ্যায়** | **৬-২৬** |
| গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা | |
| ১.১ ভূমিকা | ৬ |
| ১.২ গণতন্ত্র | ৭ |
| ১.৩ গণতন্ত্রের স্বরূপ | ৯ |
| ১.৪ গণতন্ত্রের প্রকারভেদ | ১০ |
| *১.৪.১ শুম্পিটারিয়ান গণতন্ত্র* | ১১ |
| *১.৪.২ জনসাধারণবর্তী গণতন্ত্র* | ১২ |
| *১.৪.৩ উদারনৈতিক গণতন্ত্র* | ১৩ |
| *১.৪.৪ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র* | ১৪ |
| *১.৪.৫ সামাজিক গণতন্ত্র* | ১৬ |
| *১.৪.৬ পরামর্শমূলক গণতন্ত্র* | ১৭ |
| ১.৫ গণতান্ত্রিক আদর্শের উদ্ভব ও বিকাশ | ১৮ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | **২৭-৫৬** |
| আদর্শিক ধারণায় গণতন্ত্র | |
| ২.১ ভূমিকা | ২৭ |
| ২.২ আদর্শিক গণতন্ত্রের ধারণা | ২৭ |
| ২.৩ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা | ২৮ |
| ২.৪ গণতন্ত্র ও সাম্য | ৩২ |
| ২.৫ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার | ৩৫ |

২.৬ গণতন্ত্র ও জনমত ৩৭
২.৭ গণতন্ত্র ও সুশাসন ৪০
২.৮ আদর্শ রাষ্ট্র ও নৈতিকতা ৪২

**তৃতীয় অধ্যায়** **৫৭-৯৩**
উদারনৈতিক গণতন্ত্র বনাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

৩.১ ভূমিকা ৫৭
৩.২ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ৫৭
৩.৩ পরোক্ষ গণতন্ত্র ৫৭
৩.৪ উদারনৈতিক গণতন্ত্র ৬০
৩.৫ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ৬৪
*৩.৫.১ সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট* ৮৩
৩.৬ উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের তুলনা ৮৫

**চতুর্থ অধ্যায়** **৯৪-১২৫**
সংবিধান ও গণতন্ত্র

৪.১ ভূমিকা ৯৪
৪.২ সংবিধান ৯৫
৪.৩ সংবিধানের উৎসসমূহ ১০০
৪.৪ সংবিধান প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ১০২
*৪.৪.১ মঞ্জুরির দ্বারা সংবিধান প্রতিষ্ঠা* ১০২
*৪.৪.২ পরিকল্পনার দ্বারা সংবিধান প্রতিষ্ঠা* ১০৩
*৪.৪.৩ বিপ্লবের দ্বারা সংবিধান প্রতিষ্ঠা* ১০৩
*৪.৪.৪ বিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান প্রতিষ্ঠা* ১০৪
৪.৫ সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ ১০৪
*৪.৫.১ লিখিত সংবিধান* ১০৪
*৪.৫.২ অলিখিত সংবিধান* ১০৫
*৪.৫.৩ সুপরিবর্তনীয় সংবিধান* ১০৬
*৪.৫.৪ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান* ১০৬
৪.৬ সাংবিধানিক সরকার ১০৭
*৪.৬.১ সাংবিধানিক সরকারের বৈশিষ্ট্য* ১০৮
*৪.৬.২ উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য* ১১০
৪.৭ সংবিধান ও গণতন্ত্র ১১২
৪.৮ বাংলাদেশের সংবিধান ১১৩

*Dhaka University Institutional Repository*

৪.৯ সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বাংলাদেশ ১১৮
৪.১০ গণতান্ত্রিক সংবিধানের কয়েকটি শর্ত ১২০

**পঞ্চম অধ্যায়** **১২৬-১৬০**

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন

৫.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১২৬
৫.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা ১২৬
৫.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ ১২৮
*৫.৩.১ অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার* ১২৮
*৫.৩.২ বিশেষ অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার* ১২৮
*৫.৩.৩ প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার* ১২৯
৫.৪ বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৩০
৫.৫ বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈশিষ্ট্য ১৩৫
*৫.৫.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য* ১৩৬
*৫.৫.২ প্রধান উপদেষ্টার যোগ্যতাসমূহ* ১৩৬
৫.৬ নির্বাচন ১৩৭
৫.৭ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৩৮
*৫.৭.১ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৩৯
*৫.৭.২ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৩৯
*৫.৭.৩ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৪০
*৫.৭.৪ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৪০
*৫.৭.৫ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৪০
*৫.৭.৬ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৪৩
*৫.৭.৭ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৪৫
*৫.৭.৮ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৪৬
*৫.৭.৯ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৪৮
*৫.৭.১০ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৫২
*৫.৭.১১ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৫৩
৫.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন ১৫৫

**ষষ্ঠ অধ্যায়** **১৬১-১৭৩**

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা

৬.১ ভূমিকা ১৬১
৬.২ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ১৬৩

*Dhaka University Institutional Repository*

৬.৩ স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপসমূহ ১৬৫
*৬.২.১ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন* ১৬৫
*৬.২.২ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা* ১৬৬
*৬.২.৩ গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণ* ১৬৭
*৬.২.৪ উদারনৈতিক মূল্যবোধ* ১৬৮
*৬.২.৫ হুইসেলব্লোয়ার আইন প্রয়োগ* ১৬৮
*৬.২.৬ সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন* ১৬৯

**সপ্তম অধ্যায়** **১৭৪-২২৭**

গণতন্ত্রের সংকট ও ভবিষ্যৎ

৭.১ ভূমিকা ১৭৪
৭.২ গণতন্ত্রের চর্চায় নির্বাচন ও সুশাসন ১৭৬
৭.৩ বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের অবস্থান ১৭৯
৭.৪ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতি ১৮৫
৭.৫ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা ১৮৭
৭.৬ গণতন্ত্রের সংকট ১৯১
৭.৭ সংকট উত্তরণের পথ ১৯৭
৭.৮ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ও সমাধান ২০৮
৭.৯ সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা ২১১

**অষ্টম অধ্যায়** **২২৮-২৩৫**

উপসংহার

*গ্রন্থপঞ্জি* ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

# ভূমিকা

রাষ্ট্রদর্শনের মূল সূত্রের প্রণেতা প্লেটো ও এরিস্টটল গণতন্ত্রকে উত্তম শাসনব্যবস্থা না বললেও সময়ের পরিবর্তনে গণতন্ত্র আজ অধিকাংশ দেশে একটি গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। বিভিন্ন যুগে গণতান্ত্রিক আদর্শের চর্চা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গেলেও আধুনিক যুগেই তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। আধুনিক রাষ্ট্রদার্শনিকেরা, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লক, রুশো, বেন্থাম, মিল, জেফোরসন, ডিউই, রলস, মার্কস প্রমুখ গণতন্ত্রকে একটি রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। গণতন্ত্রের মূল চেতনা জনগণের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ ও কল্যাণকে কেন্দ্র করে গ্রিসে যে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজকের পৃথিবীতে তা আরও প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পাশাপাশি অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশসহ অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ দেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। কাজেই সার্বিক বিচারে গণতন্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করে রাষ্ট্রদর্শনে এর অবস্থান ও ভূমিকা নিরূপণ করা এবং বর্তমান বাংলাদেশে এ মূল্যবোধের চর্চা এবং এর প্রাসঙ্গিকতা যাচাই অত্যন্ত জরুরী বিধায় এ গবেষণা কাজটি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রদর্শন হলো রাষ্ট্র, সরকার ও আইন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে আলোচনা অগ্রসর হয় যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৈতিক আদর্শের আলোকে। গণতন্ত্র রাষ্ট্রদর্শনের তেমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ। তবে গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। ধারণাগত পার্থক্য থাকলেও গণতন্ত্রের মূল কথা হলো জনগণের শাসন। প্রাচীনকাল থেকেই সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। কোনো কোনো দেশে সমানাধিকারের দার্শনিক ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রকে উদারতাবাদের সংক্ষিপ্ত রূপও বলা যেতে পারে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আইনের চোখে সমানাধিকার, অন্যায়ের প্রতিবিধানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানানোর অধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং সুশীল সমাজ বিদ্যমান। প্রাচীন গ্রিসসহ প্রাচীন রোম, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মতো অন্যান্য সভ্যতাও গণতন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে মূলত মধ্যযুগীয় ইউরোপ, আমেরিকা ও ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে।

গণতন্ত্রকে কেউ শুধুমাত্র একটি শাসনব্যবস্থা বা সরকার পদ্ধতি, কেউ শুধু সমাজব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও গণতন্ত্র মূলত একটি জীবনাদর্শ। গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ মানুষের শ্রদ্ধাবোধকে জাগ্রত করে

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপিত করে প্রকৃত সুখ ও শান্তির সন্ধান দিতে পারে। এখানে জনগণের অধিকার ও ন্যায়বিচারের উল্লেখ থাকে। বহুজনের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ ধারণাটির প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পেরিক্লিস। তবে আধুনিককালে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের যে ধারণা আমরা পাই তার ভিত্তি উদারনৈতিক মূল্যবোধ। পরবর্তী পর্যায়ে পাই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধারণা, যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্যনীতিকে গুরুত্ব দেয়। গণতন্ত্রের এ ধারাগুলো বিশ্বের মৌলিক ধ্যান-ধারণাকে বদলে যেতে সাহায্য করেছে। এগুলোর প্রভাব সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছে গণতন্ত্র। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র কেমন হওয়া দরকার সে-বিষয়টি গবেষণায় গুরুত্ব পেয়েছে। গণতন্ত্রের ধারণা ইতিহাসের শুরুতে কেমন ছিল, পরিবর্তনের বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় বর্তমানে এর বিকাশ কোন পথে, গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোনটি বেশি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র কোন পথে, এ বিষয়গুলো নৈতিক ও যৌক্তিক (দার্শনিক) বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গবেষণায় যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গণতন্ত্র হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের প্রকৃতি, কারণ ও পরিণতি নিয়ে তেমন দার্শনিক আলোচনা দেখা যায় না। যে-কারণে গণতান্ত্রিক ধারণা মানুষের কাছে পরিষ্কার নয়। এখানে গণতন্ত্রের চর্চায় নির্বাচন-ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্র বলার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গণতন্ত্র মানে শুধুমাত্র সুষ্ঠু নির্বাচন নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বে সার্বভৌমত্ব অর্জন করে এবং জনগণ নিজেদের স্বার্থে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কাজেই নির্বাচন শুধুমাত্র ক্ষমতা পরিবর্তনের হাতিয়ার ছাড়া আর কোনো মাত্রা যোগ করতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ভূমিকা রাখতে পারে দেশের নাগরিক-সমাজ ও বিজ্ঞজনদের মতামত। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে প্রত্যেক রাজনীতিবিদ ও সরকার নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। বর্তমান গবেষণা কর্মটিকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে গণতন্ত্রের স্বরূপ, উৎপত্তি, বিকাশ, প্রকারভেদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিক-সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। সমানাধিকারের দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে প্রাচীনকালের হলেও বিশ শতকে এসে তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপ নেয়। এ শাসনব্যবস্থার মূলমন্ত্র হলো জনমতের প্রতিফলন। গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় সার্বজনীন স্বাধীনতা, প্রগতিশীল ও আলোকিত জনগণের অভিমত প্রকাশের সুযোগ। গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সমাজের সকল মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি-মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র যে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তা মোকাবেলা করে কীভাবে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে এর বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখা যায় তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আদর্শিক ধারণা হিসেবে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র বলতে আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর আদর্শকে বোঝায়, যা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যক্তির নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, কর্তৃত্ববাদ, জাতীয়তাবাদ এসব বিষয়ের সমন্বয় করা যায় গণতান্ত্রিক আদর্শে। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে যেসব আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে অন্যতম হলো স্বাধীনতা, সাম্য, মানবাধিকার, জনমত, সুশাসন, নৈতিকতা ইত্যাদি। এ আদর্শগুলো কীভাবে গণতন্ত্রকে কার্যকরী রাখে এবং আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে তা বিস্তারিতভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্র বনাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে উদারনৈতিক দর্শনচিন্তা ও ভাবধারা প্রতিপন্ন হয়। মার্কসবাদ ও লেলিনবাদের ওপর ভিত্তি করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্র হলো মেহনতি মানুষের গণতন্ত্র। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়। অতি সাম্প্রতিককালে (১৯৯০ সাল পরবর্তী পর্যায়ে) উদারনৈতিক ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা রূপে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে স্বীকৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ভারত, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের অধিকার, স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের উদার মনোভাব এবং অহেতুক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা থেকে নিজেকে বিরত থাকা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করে সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে, বুর্জোয়াদের শাসনক্ষমতা থেকে অপসারিত করে প্রলেতারিয়েত শ্রেণিকে সে-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। শ্রমিক-শ্রেণির একনায়কত্ব হলো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলো সর্বজনীন রাষ্ট্র। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস যে আদর্শ শাসনব্যবস্থার কথা বলেন তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নয়; তা হলো এক শ্রেণিহীন, শোষণহীন, রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থা।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংবিধানের অর্থ, প্রকার, বৈশিষ্ট্য, উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের সংবিধান ও তার নৈতিক ভিত্তি, সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনো রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি কীরূপ তা সংবিধানের মাধ্যমে জানা যায়। এজন্য সংবিধানকে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবিও বলা হয়। সংবিধানের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে শাসন করার নৈতিক ভিত্তি ও প্রকৃত

ক্ষমতা। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের রাষ্ট্রদর্শনে সংবিধান বিষয়ে যে ধারণা ছিল তা আধুনিককালের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উৎস বলে মনে করা যায়। প্রাচীন গ্রিসে সংবিধান বলতে রাষ্ট্রকেই বোঝানো হতো, রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র কোনো বিষয় হিসেবে সংবিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কিন্তু আধুনিককালেই সংবিধান রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে, রাষ্ট্র পরিচালনার লিখিত দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান কেবলমাত্র একটি পুস্তক বা দলিল নয়। এটিকে বলা যায় বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা—রাষ্ট্রের নাগরিক ও সাধারণ মানুষের জীবনের সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা', 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' এই তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে যেসব আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত রয়েছে সংবিধানের মৌল ক্ষমতা-কাঠামোকে যদি তা বাস্তবায়নের উপযোগী করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের সংবিধান অবশ্যই পৃথিবীতে 'গণতান্ত্রিক সংবিধান'-এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, এর প্রকৃতি, যৌক্তিকতা এবং নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো এক ধরনের ভিন্নধর্মী শাসনব্যবস্থা। যখন কোনো রাষ্ট্রে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তার প্রেক্ষিতে যে ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে পারে সেটিই হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনও এমন কাজ করবে না, যা জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করবে। এটি হবে পক্ষপাতহীন একটি সরকার। সকল রাজনৈতিক দলের এ সরকারের ওপর আস্থা থাকবে। নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, সুষ্ঠু নির্বাচনে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারই অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জনগণ ধরেই নেয় এ সরকারের আমলে তিন মাস অন্ততপক্ষে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই এ ধরনের সমস্যা রয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর রাখা যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা, বিশেষ করে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি নৈতিক ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে কি না, সংকীর্ণ ও অযৌক্তিক রাজনীতি চর্চা থেকে বেরিয়ে কীভাবে উদারনৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তিবাদিতা চর্চার মাধ্যমে এ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এদেশে এখনও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী পারিবারিক আইনগুলো বিদ্যমান, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সেই দিক থেকে একে যথার্থ ধনতান্ত্রিক তথা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশ বলা যায় না। সরকার অনেক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী ও শ্রেণির স্বার্থে চালিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যখন যে-দল ক্ষমতায় আসে তখন সে-দলের একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে সরকার পরিচালিত হতে দেখা যায়। গোষ্ঠীতন্ত্রের আড়ালে

স্বৈরতন্ত্র ক্রিয়াশীল থাকে। কাজেই এখানে যে সঠিক গণতন্ত্রের চর্চা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এ অবস্থার অবসান করে কীভাবে যথার্থ গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া যায় তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সংকট ও ভবিষ্যৎ, গণতন্ত্রকে কীভাবে সর্বজনীন রূপে চর্চা করা যায়, প্রকৃত গণতন্ত্রে কীভাবে উপনীত হওয়া যায় তা আলোচনা করা হয়েছে। গণতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনীতি, সংস্কৃতি তথা জনগণের সামগ্রিক জীবন ও তার আশপাশের পরিবেশকে উন্নত ও জনগণকে সমস্যা থেকে মুক্ত করার সার্বিক কর্মপদ্ধতি। আত্মস্বার্থের প্রাধান্য গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। এখানে স্বার্থপরতা বড় বাধা। ক্ষমতাসীন দলীয় শাসকেরা তাদের নিজ দলের লোকদের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় সাধারণ জনগণের মধ্যে সংকীর্ণতা তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে তারা গণতন্ত্রের সুফল পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে না। গণতন্ত্রে অনেক সময় রাজনীতিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না। কেউ কেউ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। আবার কেউ কেউ নৈরাশ্য প্রকাশ করে। তবে যে কথাটি আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন তা হলো, প্রত্যেক জাতিকে নিজের গণতন্ত্রকে নিজে জেনে নিতে হবে। গণতন্ত্র কেউ কাউকে দান করতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ দর্শক নয়, বরং জুরি। তারা সাক্ষ্য-প্রমাণের শুনানি গ্রহণ করেন এবং নির্বাচনের দিন ভোটের মাধ্যমে তাদের রায় দেন।

অষ্টম অধ্যায় উপসংহারে দেখানো হয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনুসন্ধান ও সমালোচনার অধিকার, প্রগতি ও উপলব্ধির দ্বার  উন্মুক্ত করে দেয়। সামাজিক বৈষম্য ও অসমতাই সামাজিক সংকটের মূল কারণ। মানুষ স্বাধীনতা, মানবিকতা ও মানব মুক্তির নৈতিকতার ধারণা নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। গণতন্ত্রের অর্থ মুক্তি থেকে ব্যাপক। এতে থাকে বাস্তব কর্মপদ্ধতি। গণতন্ত্র হচ্ছে মুক্তির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। মুক্ত থাকার জন্যই প্রয়োজন গণতন্ত্র। সকল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নাগরিকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকে। তবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে যথার্থ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যার ভিত্তিতে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তা সত্ত্বেও উদারনৈতিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাজনৈতিক রূপ বিধায় সংকট থেকেই যায়। এ সংকট থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। কাজেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে গণতান্ত্রিক মূলবোধকে দেশের সকল নাগরিক বাধাহীনভাবে চর্চা করতে পারে। জনগণ যাতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই উপযোগী করে তৈরি করতে হবে। তাহলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্রের সুষ্ঠু, সুন্দর ও সর্বজনীন বিকাশের মধ্যেই রয়েছে আগামী দিনের বাংলাদেশের সুন্দর ভবিষ্যৎ।

**প্রথম অধ্যায়**

# গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

## ১.১ ভূমিকা

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তায় গণতান্ত্রিক চেতনার (spirit of democracy) উন্মেষ ঘটে। গণতন্ত্র একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যার মাধ্যমে রাজনীতি বৈধতা অর্জন করে। ভিন্ন মত এবং পথের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে গণতন্ত্র একটি সুস্থ ও সুন্দর রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার সুষম বণ্টন ও সমস্বার্থের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে মানবিক জীবনবোধ গড়ে তোলা সম্ভব। এটি দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার এক কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা। এটি এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে শান্তিপূর্ণ পথে, সকলের সম্মতিসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিশ্বাস করা হয়। আবার গণতন্ত্রকে একটি 'প্রক্রিয়া'ও বলা হয়, যেখানে ব্যক্তি স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ ও অনন্য একক রূপে স্বীকৃত হয়। কারও ওপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়াই সে আপন মহিমায় ভাস্বর হতে পারে। প্লেটো-এরিস্টটলের সময় থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত নানা আলোচনা-পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা-নীরিক্ষার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত কারও শাসন করার অধিকার নেই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। এখানে শাসক ও শাসিত সকলে মিলেই কাজ পরিচালনা করে। গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে সর্বজনীন শিক্ষা, উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক সাম্য ও সহনশীলতা। তবে বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ সাম্য নানাভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। উন্নত দেশে এই শর্তগুলোর অধিকাংশ উপস্থিত থাকলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এগুলো অনুপস্থিত থাকার কারণে গণতন্ত্রকে সঠিক অর্থে কার্যকর হতে দেখা যায় না। যদিও পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির কারণে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে, তবে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আর গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস আর আস্থা প্রকাশ করার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারে। সে-কারণে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঠিক চর্চার ওপর এটির টিকে থাকা নির্ভর করে।

## ১.২ গণতন্ত্র

কাউকে কোনো কিছু করার অনুমতি প্রদানকে রাষ্টদর্শনে গণতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের সম্মতির মধ্য দিযে শাসক শাসন করার ক্ষমতা লাভ করে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বৈধতা অর্জন করে থাকে। বহু প্রতিযোগী গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রই উত্তম ব্যবস্থা। বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রকে যেভাবে দেখা হয়, প্রাচীন যুগে এভাবে দেখা হতো না। যেমন, প্লেটো ও এরিস্টটল গণতন্ত্রকে উত্তম শাসনব্যবস্থা বলে স্বীকৃতি দেননি।[১] এ প্রসঙ্গে এরিস্টটল উল্লেখ করেন: "সার্বভৌমত্ব যদি জনগণের একটি বৃহৎ অংশর মধ্যে থাকে তখনই তা হবে সরকারের রূপ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেটির বিকৃত রূপ হলো গণতন্ত্র।"[২] তবুও গ্রিক ও রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বীকৃত ছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে গণতন্ত্রের ধারণার সূত্রপাত হয়। এ সময় হেরোডটাস (Herodotus)[৩] গণতন্ত্রকে বহুজনের শাসন এবং সমাজে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা বলে গণ্য করেছেন। তবে রাষ্ট্রদার্শনিক বিচারে গণতন্ত্র ক্ষমতায় যাওয়ার একটি প্রতিযোগিতা। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Democracy'। শব্দটি প্রথম প্রয়োগ হয় ষোল শতকে। এটি 'Demos' (জনগণ) এবং 'Kratia' (শাসন) থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের শাসন, যে সরকার-ব্যবস্থায় সরকারের সদস্যরা সরাসরি জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গণতন্ত্র একটি আদর্শ ব্যবস্থা হলেও পুঁজিবাদী সমাজে গণতন্ত্র জনগণের শাসনের পরিবর্তে ধনীদের শাসনে পরিণত হয়। ফলে গণতন্ত্রের মূল চেতনা ব্যাহত হয়। প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত হলো নাগরিকের অধিকার ও সুযোগের সমতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমতা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সর্বস্তরে জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের শাসন। এ ব্যবস্থায় জনগণই হবে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। জনগণ যখন প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবে তখনই সে ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা যাবে। এ প্রসঙ্গে এরিস্টটল বলেন: "যে ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যেকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না সেটা গোষ্ঠী শাসন এবং যেখানে থাকে সেটা গণতন্ত্র।"[৪]

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি তা 'কুলীনতন্ত্র' বা অ্যারিস্টোক্রাসি এবং যেখানে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে তা গণতন্ত্র। গণতন্ত্র শব্দটি দ্বারা বিশেষ এক সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা শাসনব্যবস্থা বোঝায়। এর দ্বারা বিশেষ এক অর্থব্যবস্থাকেও বোঝায়। ফলে গণতন্ত্রের ধারণায় অস্পষ্টতা রয়েছে। তবে গণতান্ত্রিক সমাজে বল প্রয়োগ সমর্থন করা হয়

না। জন্মগত ও ধনগত বৈষম্যকে বিশেষ কোনো মর্যাদা দেয়া হয় না। প্রত্যেকের অবদানকে স্বীকার করে সমান মূল্যবান হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে সাম্যকে গুরুত্ব দেয়া হয়, তবে সাম্যই যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি পর্যাপ্ত স্বাধীনতা বা অধিকার প্রয়োজন। সমানাধিকার হলেই চলে না, অধিকারের বিষয়টিও পর্যাপ্ত হওয়া দরকার। বিভিন্ন রাষ্ট্রদার্শনিকের সংজ্ঞায় গণতন্ত্রের এ ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক হেরোডটাস বলেন: "গণতন্ত্র বলতে এমন এক সরকারকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা বৈধভাবে কোনো বিশেষ শ্রেণি ও শ্রেণিসমূহের ওপর নয় বরং সমগ্র সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর অর্পণ করা হয়।"[৫] জেমস ব্রাইস এ মত সমর্থন করেন বলে আর সি আগারওয়াল উল্লেখ করেন।[৬] এ সংজ্ঞার বিশ্লেষণে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৈধতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং জনগণের সম্পৃক্ততা ও মতের প্রতিফলনই হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৈধতার ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সিলীর[৭] সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যায়, "গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই অংশ থাকে।"[৮] এ সংজ্ঞায় জনগণ, সরকার ও বিরোধী দলের সাথে মতবিনিময়, সংলাপ, আলাপ-আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। মূলকথা হলো এখানে জনগণের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণের এ অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠতারই প্রকাশ। এই অর্থে গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলে বিবেচনা করা যায়।

আব্রাহাম লিঙ্কন[৯] জনগণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা আজও সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়। তিনি বলেন গণতন্ত্র হলো এমন শাসনব্যবস্থা যা "জনগণের কল্যাণে, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত জনগণের শাসন।"[১০] এ সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, গণতন্ত্র জনগণের শাসনব্যবস্থা। বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: জনগণের শাসনব্যবস্থা দ্বারা সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্যকে (obedience) বোঝায়, যেখানে জনগণ সরকারের সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়। এ অংশটি দ্বারা দুটি বিষয় বোঝানো হয়। যথা: (১) জনগণই সরকারের উৎস এবং (২) সরকারকে জনগণ থেকে আলাদা করে দেখা হয় না। প্রাচীন গ্রিকরা মনে করত গণতন্ত্র হলো বহুজন পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক শাসনে সকলের ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্র জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী। এ শাসনব্যবস্থা জনগণ উপেক্ষা করতে পারে না। এই অর্থে গণতন্ত্রকে সর্বসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসন বলে বর্ণনা করা হয়। এখানে শাসনসংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার ব্যাপারে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। জনগণের জন্য সরকার বলতে জনগণের কল্যাণ সাধনকে বোঝায়। গণতন্ত্র কেবল রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদি তা করা হয় তবে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ সাধন করা যায় না। এ জন্য প্রয়োজন হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্রকে কেবল রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে দেখলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সীমিত হয়ে পড়বে। গণতন্ত্রে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

অর্থাৎ জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাকেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা হয়। এই অর্থে গণতন্ত্র হলো জনগণের জন্য একটি কল্যাণকর আদর্শ।

### ১.৩ গণতন্ত্রের স্বরূপ

গণতন্ত্র হলো এমন শাসনব্যবস্থা, যেখানে সকলেই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। গণতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এর দুটি অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা: (১) ব্যাপক অর্থ ও (২) সংকীর্ণ অর্থ। সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্রকে সরকারি ব্যবস্থার একটি রূপ হিসেবে দেখা হয়। এ প্রসঙ্গে ডি. ডি. রাফায়েল বলেন: "জনগণের দ্বারা সরকার গণতান্ত্রিক সরকারের একটি অপরিহার্য ধারণা। এক কথায়, জনগণের দ্বারা সরকার বলতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে বোঝানো উচিত। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই অসম্ভব।"[১১] এ বক্তব্যে গণতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেমন:

১. এ সরকার জনগণের সম্মতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত,
২. জনগণের সার্বভৌমের ধারণাটি গণতান্ত্রিক সরকারে প্রতিফলিত হয়। জনগণের ইচ্ছা বা স্বার্থই শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়।
৩. তত্ত্বগতভাবে জনগণের শাসন হলেও কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন।
৪. গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্বশীল সরকার। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত বলে এ সরকার দায়িত্বহীন কাজ-কর্ম করতে পারে না।
৫. গণতান্ত্রিক সরকার জনপ্রিয় সরকার। স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতি এ সরকারের প্রধান নীতি, যা সরকার কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারেনা।

সরকারের একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না। ব্যাপক অর্থে তাই একে একটি সমাজব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়, যা সত্য, ন্যায় ও জনকল্যাণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত গণতন্ত্রে ধনবৈষম্য থাকে না, সেখানে বলপ্রয়োগ বা শোষণের কোনো স্থান নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ থেকে এর কয়েকটি দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে: সরকারের একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্র, জীবনাদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক।

**সরকারের একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্র:** এই অর্থে গণতন্ত্রকে একটি সরকারী ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রকে সরকারের একটি ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি মনে করেন গণতন্ত্র হলো জনগণের সরকার। জনগণ দ্বারাই এ সরকার পরিচালিত হবে। সকল নাগরিক এ সরকার-ব্যবস্থার অংশ। সকল নাগরিক রাষ্ট্রের কল্যাণেই কাজ করবে। অর্থাৎ গণতন্ত্র হলো সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে সবাই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সকল নাগরিকের মতামত নিয়ে সরকার পরিচালনা করা কঠিন। এজন্যই জন লক চুক্তির সাহায্যে রাজনৈতিক সমাজ গঠন করে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে শাসন পরিচালনার ওপর জোর দেন। সুতরাং এ সরকার পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার সকলের হাতে থাকলেও গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। কাজেই বলা যায় যে, গণতন্ত্রে সরকার জনগণের কল্যাণেই নিয়োজিত থাকবে। আমরা সেই জাতীয় সরকারকে গণতান্ত্রিক বলব, যে সরকারের সদস্যরা সরাসরি জনগণের নিকট দায়বদ্ধ এবং দায়বদ্ধতার মধ্যে কোনো মাধ্যম থাকবে না।[১২]

**জীবনাদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র:** গণতান্ত্রিক মানুষই হলো গণতান্ত্রিক সমাজের রূপকার। গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাকে নির্দেশ করে। মানুষকে প্রকৃত সুখ ও শান্তির সন্ধানে নিয়োজিত করে। প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। কেননা এ শাসন ব্যবস্থায় সকল নাগরিক সমান এবং প্রতিটি ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তি, জাতি ও আদর্শের মানুষকে ভালোবাসবে ও তাদের প্রতি সহনশীল হবে। সততা, মহত্ত্ব, আত্মমর্যাদা, সাহস ও পরিশ্রমই গণতান্ত্রিক মানুষের পরিচয়।

**গণতন্ত্রের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক:** এক্ষেত্রে সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে একত্রে বসবাস করতে হবে। এখানে সমাজ হবে নিরপেক্ষ। বৈচিত্র্যের মাঝেও থাকবে ঐক্য। বজায় রাখতে হবে সংহতিকে। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীকে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। কাজেই বলা যায় যে, গণতন্ত্র হলো জনগণের সমাবেশ। বহুসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি বা সমাবেশ গণতন্ত্রের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে।

### ১.৪ গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

সাধারণভাবে গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও (২) পরোক্ষ গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হলো সেটি, যেখানে জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে। যেমন প্রাচীন গ্রিস ও রোমের গণতন্ত্র।

অন্যদিকে, জনগণ সরাসরি শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করে তাঁদের প্রতিনিধির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার পদ্ধতিটি হলো পরোক্ষ গণতন্ত্র। এটি প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র নামেও পরিচিত এবং বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক রূপ মূলত এটি। গণতন্ত্রের কাছে প্রত্যাশা বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে সব ধরনের গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, একত্রে বাস করা সকল নাগরিকের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এমন একটি প্রক্রিয়া বেছে নেওয়া উচিত, যেখানে সকলের স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে গুটম্যান (Gutman) তাঁর 'Democracy'[১৩] প্রবন্ধে ছয় ধরনের গণতন্ত্রের উল্লেখ করেন। এগুলো হলো:

১. শুম্পিটারিয়ান গণতন্ত্র (Schumpeterian democracy)
২. জনসাধারণবর্তী গণতন্ত্র (Populist democracy)
৩. উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal democracy)
৪. অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (Participatory democracy)
৫. সামাজিক গণতন্ত্র (Social democracy)
৬. আলাপ-আলোচনাভিত্তিক বা পরামর্শমূলক গণতন্ত্র (Deliberative democracy)

### *১.৪.১ শুম্পিটারিয়ান গণতন্ত্র*

চলমান সময়ে রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে যোশেফ শুম্পিটার একজন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। তিনি তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বে যেসব বিষয় গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো গণতন্ত্র। তাঁর নামানুসারে এ গণতন্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে শুম্পিটারিয়ান গণতন্ত্র। এখানে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন পছন্দ বা অপছন্দের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন হলো গণতন্ত্র। এ প্রসঙ্গে আর. এ. ডাল বলেন: "গণতন্ত্রকে তখন ধারণাগত, নৈতিক, নিরপেক্ষভাবে পৃথক করা যায়।"[১৪] তাঁর মতে গণতন্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় দুটি, যথা: (১) রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে জনগণের অংশগ্রহণ ও (২) রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা। গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতা থাকতে হবে, কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপার থাকবে না। কাজেই গণতন্ত্র হলো অংশগ্রহণমূলক। এ ধরনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিনিধিগণ জনগণের প্রদত্ত ভোটাধিকারের প্রাপ্ত ফলের ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতা অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে শুম্পিটার উল্লেখ করেন:

"এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি জনগণের ভোটের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করে।"[১৫]

এ ধরনের গণতন্ত্রে নাগরিক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে এবং সে কাজ কোনো একজন নাগরিক এককভাবে করে না। অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পদের ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার কাজে অংশ নিয়ে থাকে। পরিচালনার কাজে জনগণের উদ্দেশ্য থাকে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ ও উদ্দেশ্যকে জনকল্যাণমুখী করে তোলা।

### ১.৪.২ *জনসাধারণবর্তী গণতন্ত্র*

যোশেফ শুম্পিটারের সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাবিদেরা তাঁর মতের সীমাবদ্ধতা দেখাতে গিয়ে এমন এক ধরনের গণতন্ত্রের কথা বলেন যাকে জনসাধারণবর্তী গণতন্ত্র বলা হয়। এ ধরনের গণতন্ত্রে জনবিচ্ছিন্ন গণতন্ত্রের পরিবর্তে জনযুক্ত শাসনের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এ রকম শাসনব্যবস্থায় মনে করা হয় জনগণ বাহ্যশক্তি বা তাদের মধ্য থেকে স্বঘোষিত কোনো ছোট দল দ্বারা শাসিত না হয়ে স্বাধীন ও সমসত্তারূপে নিজেদের শাসন করবে। এ ধরনের শাসনের ক্ষেত্রে জনগণকে সাথে নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে গুটম্যান বলেন: "জনসাধারণবর্তী গণতন্ত্রের ধারণায় জনগণ একটি বাহ্যিক শক্তি বা তাদের মধ্য থেকে স্ব-নিযুক্ত সংখ্যালঘুর দ্বারা শাসিত না হয়ে বরং নিজেকে স্বাধীন ও সমান মানুষ হিসেবে শাসন করবে।"[১৬] এ ধরনের গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়। জনসাধারণবর্তী গণতন্ত্র নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

১. রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য কথা বলা, সংবাদ মাধ্যম ও সংগঠনের স্বাধীনতা অপরিহার্য।
২. সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতার বিপরীতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
৩. নিয়মতান্ত্রিক ভোটের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, নির্দিষ্ট সময় পর পর ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা।
৪. রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকৃত ও মানসিকভাবে সুস্থ এমন সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা।[১৭]

এ ধরনের শাসনে এমন এক আদর্শ সৃষ্টি হয় যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের রাজনৈতিক সুবিধা, আইনের শাসন, সমান ভোটাধিকার এবং নাগরিকত্বের সুবিধা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এ প্রসঙ্গে গুটম্যান বলেন: "এ জনপ্রিয় ধারণাটির আলোকে যেখানে জনগণ তাদের স্বাধীন ও সমান হিসেবে শাসন

করবে, সেখানে যে কোনো প্রতিবন্ধকতা অগণতান্ত্রিক, এমনকি যদি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করার পরও প্রতিবন্ধকতাগুলো যুক্তিযুক্ত হয়।"[১৮]

### ১.৪.৩ *উদারনৈতিক গণতন্ত্র*

যে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উদারনৈতিক দর্শন ও ভাবধারা প্রতিপন্ন হয় সেটাই উদারনৈতিক গণতন্ত্র। এ ব্যবস্থায় স্বাধীনতাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এখানে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার উপেক্ষা করে সরকার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে না। এ ব্যবস্থায় সংবিধানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রচলিত আইনে জনগণের যে সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতা থাকে তা বাস্তবায়নের ওপর সরকারকে নজর দিতে হয়। অধিকার ও স্বাধীনতা উদারনৈতিকতার মূল ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, উদারনীতির ইচ্ছা পোষণই মুক্তির মূলমন্ত্র।[১৯] উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণা ষোড়শ শতাব্দী থেকে প্রচারিত হলেও মূলত সপ্তদশ শতাব্দীতে এর বিকাশ ঘটে। এর দুটি ধরন স্পষ্ট, যথা: (১) চিরায়ত উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং (২) আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র।

চিরায়ত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দুটি মূলনীতি রয়েছে, যথা: (১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও (২) চিন্তার স্বাধীনতা। চিরায়ত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো এল. টি. হবহাউস, জেরেমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, জন লক, অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ। হবহাউস তাঁর *Liberalism*[২০] গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদারতাবাদের ৯টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেন, যেগুলোর বাস্তবায়নই উদারতাবাদের মূলনীতি হিসেবে কাজ করে। উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

১. নাগরিক স্বাধীনতা (civil liberty)
২. রাজস্ব স্বাধীনতা (fiscal liberty)
৩. ব্যক্তি স্বাধীনতা (personal liberty)
৪. সামাজিক স্বাধীনতা (social liberty)
৫. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (economic liberty)
৬. পারিবারিক স্বাধীনতা (domestic liberty)
৭. স্থানীয়, বংশগত ও জাতীয় স্বাধীনতা (civil local, racial and national liberty)
৮. আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা (international liberty)
৯. রাজনৈতিক ও জনগণতান্ত্রিক স্বাধীনতা (political liberty and popular liberty)

বিংশ শতাব্দীতে চিরায়ত গণতন্ত্রের ক্ষেত্র পরিবর্তন করে আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে যে সকল চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে জন ডিউই[২১] মরিস র‍্যাফেল কোহেন[২২] এবং জন রলস[২৩] উল্লেখযোগ্য। জন ডিউই উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে 'মনোভাব' (attitude) এবং 'কর্মসূচি' (program) হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। 'মনোভাব' বলতে মানব সমাজের কাজকর্ম করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতির প্রয়োগকে বোঝানো হয়েছে। আর উদারনৈতিক গণতন্ত্রে কর্মসূচি হিসেবে ডিউই তিনটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করেন। যথা:

১. জনগণের সঙ্গে গণসংযোগ সাধনের পথ উন্মুক্ত থাকবে এবং জনগণ নিজের মতো করে রাজনৈতিক দল গঠন করবে এবং পছন্দমতো রাজনৈতিক দলকে নির্বাচিত করতে পারবে;
২. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনে কতিপয় শিল্প-বাণিজ্যের জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে; এবং
৩. সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য শিক্ষার বিস্তার ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[২৪]

তবে জন রলস আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনে করেন আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে মূল্যায়ন করতে হবে কতিপয় মৌলিক স্বাধীনতার মাধ্যমে। জন রলস তাঁর *A Theory of Justice* গ্রন্থে কতিপয় মৌলিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন। যথা: (১) চিন্তার স্বাধীনতা; (২) বাক স্বাধীনতা; (৩) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা; (৪) সংগঠনের স্বাধীনতা; (৫) ধর্মের স্বাধীনতা; (৬) ব্যক্তিগত আপত্তির অধিকার ও স্বাধীনতা; (৭) ভোট প্রদানের স্বাধীনতা; (৮) সর্বজনীন অফিস করার অধিকারের স্বাধীনতা; (৯) অযৌক্তিক গ্রেফতার ও জব্দ করণে হস্তক্ষেপ না করা।[২৫] তিনি বলতে চান যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে এ সকল স্বাধীনতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

### *১.৪.৪ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র*

অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমালোচনা থেকে। এ ধরনের গণতন্ত্রে মনে করা হয় যে, শুধুমাত্র কিছু মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি বা নিশ্চয়তা দিলেই তাকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা যায় না। কেননা এখানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে সীমিত। এ প্রসঙ্গে গুটম্যান বলেন, "অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রীরা যুক্তি দেখান যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ আজকাল নাগরিকদের দ্বারা অবমূল্যায়িত হয়, কারণ সমসাময়িক গণতন্ত্র অর্থবহ অংশগ্রহণের জন্য বিশেষত প্রাচীন গ্রিক গণতন্ত্রের তুলনায় সীমিত সুযোগ দান

করে।"[২৬] আক্ষরিক অর্থে অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। কিন্তু আমরা এখানে যে অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত করছি তাকে সাধারণ অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়নি। প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোতে অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। নগররাষ্ট্র এবং এথেন্সের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে, প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিক রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন, উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটানোর সুযোগ সীমিত। তাঁদের মতে সুযোগ যদি যথার্থ থাকত তবে প্রতিনিধির মাধ্যমে মতপ্রকাশ করার পরিবর্তে জনগণ নিজেরাই নিজেদের মতপ্রকাশ করতে পারত। কাজেই এথেন্সে যে গণতন্ত্র ছিল তা যথার্থ ও প্রকৃত গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার অস্তিত্ব সে-আমলে ছিল না। এ ব্যবস্থায় নাগরিকদের রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, নাগরিকদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে এক্ষেত্রে তাদের বোধশক্তি এবং আগ্রহ বাড়বে।[২৭] এমনকি রোমেও জনগণকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার প্রবণতা দেখা যায়নি। গ্রিস ও এথেন্সে প্রকাশ্যে সভা অনুষ্ঠিত হতো। এখানে অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র সুন্দরভাবে বিকশিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। নাগরিকেরা বিচার কাজকে প্রশাসন থেকে ভিন্ন করে দেখার চেষ্টা করেননি। সেকারণে বিচার সংক্রান্ত কাজে নাগরিকেরা নিজেরাই অংশগ্রহণের সুযোগ পেত। তবে প্লেটো ও এরিস্টটল এ ধরনের গণতন্ত্রকে সুনজরে দেখেননি। জন লক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা হলেও তাঁর লেখায় অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তিনি যেভাবে চুক্তির কাঠামো গড়ে তোলেন এবং প্রশাসনের রূপরেখা তৈরি করেন তাতে এটা স্পষ্ট যে জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলার দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র সমর্থন করলেও তিনি গ্রিক নগররাষ্ট্র এবং এথেন্সের মতো প্রকাশ্য জনসভায় মিলিত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনার কথা বলেননি। তবে প্রশাসন চালানোর জন্য যে সকল নিয়ম প্রয়োজন তা জনগণ তৈরি করবে ও সরকারকে সে-মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে। এখানে তিনি স্পষ্টভাবে জনগণের নিকট সরকারের দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করেন। তবে তিনি যে অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রের কথা বলেছেন তা বর্তমান কালের ভাষায় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পর্যায়ে পড়লেও চরম ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তাব তিনি মুলতবি রাখতে চাননি। সেকারণে তাঁর এ মতকে অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র বলা যেতে পারে। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রপন্থীরা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। তারা মনে করেন, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা দূরীভূত হয় অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে। অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রের দুটি ধরন দেখা যায়। যথা : (১) সক্রিয় অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র, এবং (২) নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র।

*সক্রিয় অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্র:* যে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে সরকারের আইন, নীতি, সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনে সপক্ষে বা বিপক্ষে জনমত সংগ্রহ করা হয় তাকে সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র বলা হয়। এ জাতীয় গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে ওঠে এবং সরকারকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। জন স্টুয়ার্ট মিল অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রকে চরম লক্ষ্য ও দিশা বলেছেন।[২৮]

*নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র:* যে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে মানুষ নির্লিপ্ত মনোভাব পোষণ করে তাকে নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র বলা হয়। একে আবার নিরুৎসাহমূলক গণতন্ত্রও বলা যায়। এখানে রাজনীতিতে অংশ নেয়ার ব্যাপারে মানুষের এক ধরনের অনীহা কাজ করে। ফলে এ গণতন্ত্র সফল ও সমৃদ্ধশালী কম হয়। এখানে সরকারের কাজকর্মের কল্যাণমুখী দিককে সংশয়াতীতরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয় না। তবে এ কথা ঠিক যে, অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রে গণভোট, গণউদ্যোগ ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো আইন পাশ করে তাদের অনুমোদনের জন্য অথবা প্রস্তাব গ্রহণের আগে জনমত যাচাই করে নেওয়া হয়। আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে এবং সুইজারল্যান্ডে গণউদ্যোগের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

### *১.৪.৫ সামাজিক গণতন্ত্র*

যে গণতন্ত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পুঁজি এবং উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে তাকে সামাজিক গণতন্ত্র বলে। এটিকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের যৌক্তিক রূপ বলেও মনে করা হয়। গুটম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন: "সামাজিক গণতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের যুক্তিকে প্রসারিত করে...।"[২৯] সামাজিক গণতন্ত্রে বেশিরভাগ সম্পদ উৎপাদিত হয় ব্যক্তিগতভাবে ও গোপনে। এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় করারোপ, সরকারি ব্যয় নির্বাহ ও ব্যক্তিগত খাতের বিধিগুলো বিশুদ্ধ পুঁজিবাদের থেকেও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি পুঁজিবাদের বিলোপের কথাও বলে না। সামাজিক গণতন্ত্র পদ্ধতিভিত্তিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। সামাজিক গণতন্ত্রপন্থীরা কেবল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই পুঁজির মানবিকীকরণের কথা বলে। কাজেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সাথে এর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রপন্থীরা পুঁজিবাদকে দেখেন স্বাধীনতা, সমতা এবং সংহতির সাথে বেমানান ব্যবস্থা হিসেবে।

মার্কসবাদ ও লেনিনবাদী আদর্শের ভিত্তিতে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। এ গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক সাম্যের মাধ্যমেই শ্রেণিহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্র' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব রয়েছে; (১) পুঁজিপতি বা মালিক শ্রেণি এবং

(২) শ্রমিক শ্রেণি বা মেহনতি শ্রেণি। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তির মালিকানা কতিপয় ব্যক্তির (মালিক শ্রেণি) হাতে থাকে, তারাই সব নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে শ্রমিকেরা শোষিত হয় এবং এ শোষণ থেকে তারা মুক্তি চায়। তারা মনে করে এ সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রহসন ছাড়া কিছুই না। ফলে তারা বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়লাভ করে। এ গণতন্ত্রই হলো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এ প্রসঙ্গে বলা যায়: "সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হলো পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের একটি অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়। এই বিপ্লবী কাজে যেহেতু জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকে তাই এটিকে মেহনতি মানুষের গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায় এবং যেটির রূপ হলো বৈপ্লবিক।"[৩০] এখানে রাষ্ট্রের সকল বিষয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসারে পরিচালিত হয় এবং গণ-সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব বাস্তবে রূপায়িত হয়। সমান বণ্টন নীতির কারণে প্রত্যেককেই সক্রিয়ভাবে সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে হয়। স্বার্থান্বেষী প্রভাব বিস্তারের সুযোগ এ ব্যবস্থায় নেই বললেই চলে। কারণ সকলের স্বার্থই এখানে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়।

### ১.৪.৬ *পরামর্শমূলক গণতন্ত্র*

এ প্রকার গণতন্ত্র হলো এক ধরনের আলাপ-আলোচনাভিত্তিক গণতন্ত্র। এটিকে গণতন্ত্রের মিলিত রূপ বলা যায়। জনসাধারণবর্তী গণতন্ত্র ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মিলিত রূপই হলো পরামর্শমূলক গণতন্ত্র। জনসাধারণবর্তী গণতন্ত্রে গুরুত্ব দেয়া হয় জনসাধারণের জন্য শাসনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সাম্যকে এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রে গুরুত্ব দেয়া হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে। এ প্রসঙ্গে গুটম্যান বলেন: "পরামর্শমূলক গণতন্ত্র এমন একটি সংজ্ঞা সরবরাহ করে যা জনপ্রিয় এবং উদারনীতিকে একীভূত করে।"[৩১] বিষয়টিকে এভাবে পরিষ্কার করা যেতে পারে:

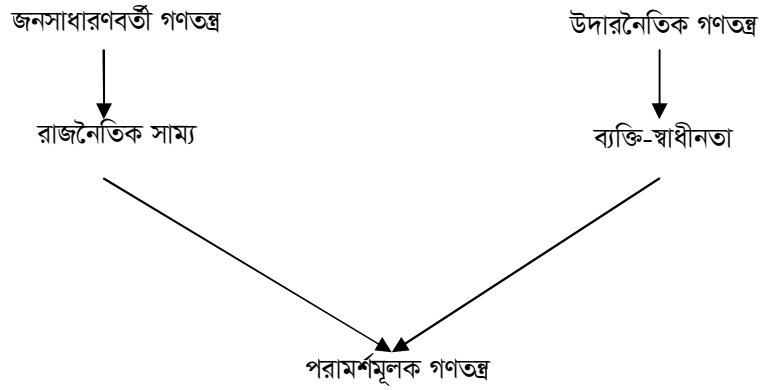

এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো পরামর্শমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সাম্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা উভয়ই যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ, এর ফলে এখানে ব্যক্তির স্বাধীকার যেমন নিশ্চিত হয় তেমনি ব্যক্তি তার নিজ জীবনকে নিজের ইচ্ছা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে গঠন করারও সুযোগ পায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়: ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সমতা মূল্যবান স্বায়ত্বশাসন যা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনার মাধ্যমে ব্যক্তির জীবন গঠনের ইচ্ছা এবং সক্ষমতাকে প্রকাশ করতে পারে।[৩২]

এ প্রকার গণতন্ত্রে নাগরিকগণ অধিকার, কর্তব্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক মত, রাজনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা বা বিতর্ক করতে পারে। সে-কারণেই নাগরিকেরা এ ধরনের গণতন্ত্র গ্রহণে আগ্রহী হয়। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারলে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা অবাস্তব বলে বিবেচিত হবে। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারলে অন্যান্য গণতন্ত্র থেকে পরামর্শমূলক গণতন্ত্রের সম্ভাবনা বেশি সন্তোষজনক হতে পারে। গুটম্যানের ভাষায়: "পরামর্শমূলক গণতন্ত্রীরা বিশ্বাস করেন যে, জনসাধারণের জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন জনসম্পর্কিত বিষয়সমূহের আলোচনাকে উৎসাহিত করে।"[৩৩] গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক সময় ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সেক্ষেত্রে পরামর্শমূলক গণতন্ত্র আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সুন্দর সমাধান দিতে পারে।

## ১.৫ গণতান্ত্রিক আদর্শের উদ্ভব ও বিকাশ

মানবিক আদর্শসমূহের মধ্যে গণতন্ত্র বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রভাবশালী। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ দার্শনিক মনে করেন, গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রিক দার্শনিকদের মনেই প্রথম পরিগ্রহ করে। অনেক সভ্যতা থেকে গ্রিক সভ্যতা বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও সভ্যতার যথার্থ বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছিল গ্রিসে। এ প্রসঙ্গে গর্ডন্ চাইল্ড বলেন: "উপকরণগত সমৃদ্ধির দিকে থেকে পাঁচ হাজার বছর আবিদস, উরকিম্বা মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতি তাদের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরেকার এথেনীয় সংস্কৃতির চাইতে মোটেই খাটো ছিল না।"[৩৪] গ্রিক রাষ্ট্রনেতাদের দ্বারা পরিকল্পিত আদর্শ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গ্রিক সভ্যতা পূর্ববর্তী ও সমকালীন সভ্যতা থেকে অনেক বেশী উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। আর্নেস্ট বার্কার মনে করেন যে, গ্রিকরাই সর্বপ্রথম চিন্তায় ও ব্যবহারে যুক্তিকে ধর্মের পরে স্থান দেয়। ব্যক্তির স্বতঃমূল্যকে তারাই প্রথম স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। গ্রিক মনীষীরা সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করে মানুষের বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করার চেষ্টা করে। আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে তারা নাগরিক অধিকার

প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে বিধিব্যবস্থার প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেয়। এখানে শক্তির পরিবর্তে যুক্তি, শাস্তির পরিবর্তে শিক্ষা এবং যুদ্ধের পরিবর্তে আলোচনা প্রাধান্য পায়। গণতন্ত্রের এ মূলনীতিগুলো গ্রিক সোফিস্টদের চিন্তায়ও লক্ষ করা যায়।

গণতান্ত্রিক আদর্শের চর্চা দেখা যায় গ্রিক নগর-রাষ্ট্রে। কেননা এথেন্সে খ্রিষ্টজন্মের দশ বছর পূর্বে সোলোন এথেনীয় গণতন্ত্রের আমূল সংস্কার করে দরিদ্র কৃষক এবং কারিগর সম্প্রদায়কে আইনসভার অধিবেশনে অংশগ্রহণের এবং শাসক নির্বাচনের অধিকার দেন। ফলে এথেন্সের নাগরিকেরা আইনসভায় সমবেত হয়ে শাসক নির্বাচন করতেন এবং রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা ঠিক করতেন। অন্যদিকে বিচারসভার সদস্যরা শাসকদের ক্রিয়াকলাপের বিচার এবং প্রয়োজনমত শাস্তিবিধান করতেন। এভাবে সোলোন প্রবর্তিত এথেনীয় গণতন্ত্র প্রথমে ক্লেইস্থেনেস এবং পরে পেরিক্লিসের নেতৃত্বে প্রাচীন যুগের মানদণ্ডে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র রূপে বিকশিত হয়। পেরিক্লিসের[৩৫] সময়ে গণতান্ত্রিক আদর্শের সর্বতোমুখী বিকাশ লক্ষ করা যায়। তখন গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির বিরোধ লোপ পায়। এ সময় এথেন্সে রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং সামাজিক জীবনযাত্রায় জনসাধারণের অধিকার ও দায়িত্ব বাড়ানোর চেষ্টা লক্ষণীয়। সভ্যজগতের সামনে এথেন্স যে আদর্শ স্থাপন করেছিল তার উল্লেখ রয়েছে পেরিক্লিসের সমাধি-ভাষণে। ইতিহাসবিদ থুকিডাইডিস রচিত 'History of the Peloponesion War' এ উল্লেখ পাওয়া যায়, এথেন্সের নাগরিকেরা যেমন নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন, তেমনি অপরের স্বাধীনতাকেও তারা আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন। অসহিষ্ণুতা এবং সন্দিগ্ধতাকে তারা সযত্নে বর্জন করেছিলেন। তাদের রাষ্ট্রে কোনো ভিনদেশীর স্বাধীনভাবে আসা-যাওয়ার পথে কোনো বাধা ছিল না; রাষ্ট্রের কোনো গোপন তথ্য বিদেশির কাছে উদ্‌ঘাটিত হওয়ার আশঙ্কায় তারা কোনো লৌহযবনিকা খাড়া করেননি। কবে বিপদ ঘটতে পারে তার ভাবনায় আগেভাগেই তাদের জীবনকে নিষেধ নিয়ন্ত্রিত করতে চাননি; তারা বীর্যের সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের সমন্বয় ঘটাবার সাধনা করেছিলেন। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অবহেলা করতেন না। তাদের বিশ্বাস ছিল, আলোচনা কার্যকরী শক্তিকে ব্যাহত না করে তাকে শক্তিশালী করে। অজ্ঞতাজাত দুঃসাহস নয়, জ্ঞান-পরিচালিত প্রত্যয়কেই তারা বেশী মূল্য দিতেন।[৩৬]

পেরিক্লিস বর্ণিত উপরিউক্ত আদর্শ গ্রহণ করার ফলে এথেন্সে নগর-রাষ্ট্রের সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটে। উক্ত রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি পরস্পরের পোষক এবং সংবর্ধক। এথেন্সের প্রতিবেশী গ্রিক রাষ্ট্র স্পার্টা গণতান্ত্রিক আদর্শকে পরিহার করেছিল, ফলে মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্পার্টার কোনো অবদানের কথা জানা যায় না। কিন্তু গণতন্ত্রের এ সর্বতোমুখী বিকাশের ধারাটি দ্বারা গ্রিক সভ্যতা উদ্বুদ্ধ হওয়ার আগেই

পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের ফলে এথেন্সের পতন ঘটে। এরপর মাসেদোনীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের ফলে একদিকে যেমন উত্তর আফ্রিকায় গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমন গণতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্রের আদর্শ লোপ পায়। এর পরবর্তী দু'হাজার বছর আর গণতান্ত্রিক আদর্শের উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ করা যায় না।

পরবর্তী পর্যায়ে রেনেসাঁসের ভেতর দিয়ে গণতান্ত্রিক আদর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রয়াস চোখে পড়ে। ফলে স্থবির সমাজে গতি সঞ্চার হয়। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের পরিবর্তে মানবীয় অধিকার, যুক্তিশীলতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার অভীপ্সা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা অর্থাৎ সমগ্রভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃজনী প্রতিভার স্ফুরণই ঘটল না, আর্থিক ব্যবস্থার আমূল রূপান্তরও সূচিত হলো। সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সতেরো, আঠারো এবং উনিশ শতকে পশ্চিমের বিভিন্ন সমাজে পরস্পরের অনুপূরক দুটি সম্ভাবনার ক্রমবিকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। একদিকে রাজা, জমিদার, চার্চ ও বিত্তবান ব্যক্তিদের অভ্যস্ত সুবিধাদি হ্রাস পেতে থাকে, অন্যদিকে নাগরিক সাধারণের অধিকার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংল্যান্ডের রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের শেষে ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে 'বিল অব রাইটস'-এর ভিত্তিতে আধুনিক ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে। মধ্যযুগের অবসানে এবং রেনেসাঁসের সূচনায় পাদুয়ার চিকিৎসক দার্শনিক মার্সিলিও যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, সেটিই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র যেখানে নাগরিক সাধারণ অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ জনগণের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাঁর মতে, "রাজা, পোপ কিংবা মুষ্টিমেয় অভিজাত পরিবার নয়, সমগ্র সমাজই হলো আইন প্রণয়নের যথার্থ অধিকারী।"[৩৭] কিন্তু মার্সিলিওর এ যুগান্তকারী প্রস্তাব তত্ত্ব হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করল প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে সতেরো শতকের ইংল্যান্ডে। রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে সেদেশে রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা লোপ পেল।

বিপ্লবের দু'বছর পর দার্শনিক লক রাজ্যশাসন বিষয়ে স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন যে, রাষ্ট্রচিন্তার আদি এবং একমাত্র উৎস হলো জনসাধারণ, রাষ্ট্র জনসাধারণের হাতের যন্ত্র মাত্র, যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয় ততক্ষণই তা জনসাধারণের সমর্থন পেতে পারে এবং কোনো রাষ্ট্র জনস্বার্থের পরিপন্থী বলে প্রতিপন্ন হলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্য প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করার অধিকার একমাত্র জনসাধারণেরই আছে।[৩৮]

ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা ও লকের রাজনৈতিক দর্শন আঠারো এবং উনিশ শতক ধরে প্রথমে পশ্চিম ও পরে পূর্বের বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করে। আমেরিকা মহাদেশের উপনিবেশগুলো যখন স্বাধীনতা

ঘোষণা করে তখন লকের প্রতিধ্বনি করেই তারা বলেছিল যে, জন্মসূত্রে সব মানুষই সমান; তাদের কতকগুলো মৌলিক অধিকার আছে যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না; এই সব অধিকার সংরক্ষণের জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব; এবং কোনো রাষ্ট্র জনস্বার্থের বিরোধী হয়ে উঠলে তার উচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রকৃষ্টতর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার জনসাধারণের আছে।[৩৯] এরকম প্রত্যয়ের ওপর ভিত্তি করেই মার্কিন গঠনতন্ত্রের বিল অব রাইটস রচিত হয়। ফলে উনিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটে এবং ক্রমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক ভোটের অধিকার অর্জন করে। গৃহযুদ্ধের পর ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে গৃহীত পঞ্চদশ সংশোধন প্রস্তাব অনুসারে নির্দিষ্ট হয় যে যুক্তরাষ্ট্র বা কোনো অঙ্গরাষ্ট্র কোনো কারণেই নাগরিকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার খর্ব করতে পারবে না অথবা কেড়ে নিতে পারবে না। এভাবে ইংল্যান্ডের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটে। ফ্রান্সেও লকের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আঠারো শতকে র‍্যাডিকালরা বলেন যে, একমাত্র জনসাধারণ সমষ্টিগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; ন্যায়সঙ্গত বিধিব্যবস্থা তাকেই বলা যায়, যার উদ্দেশ্য হলো সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ।

শহর ও কলকারখানা যতই বাড়তে থাকে, ততই একদিকে যেমন সমাজ সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের অধিকারবোধ প্রবলতর হয়। পশ্চিমের দেশগুলোতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে, সাম্যের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও রাশিয়াতে দাসব্যবস্থা নিষিদ্ধ হয়। বিভিন্ন দেশে সর্বজনীন নির্বাচনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকারের নীতি স্বীকৃত হতে থাকে। ফলে মুষ্টিমেয় জনগণ দ্বারা শাসিত সমাজের পরিবর্তে সর্বসাধারণের সমান অধিকারের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের আদর্শ জগৎ জুড়ে প্রভাব ফেলতে থাকে। এভাবে সময়ের পরিবর্তনের ধারায় এ গণতন্ত্র জটিল রূপ ধারণ করেছে। ফলে বিভিন্ন অর্থে ও দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা এসেছে। এ প্রসঙ্গে মবোট বলেন, "...যা সকল রাজনৈতিক বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রতারণাপূর্ণ এবং অস্পষ্ট।"[৩৯]

সমাজবিকাশের ধারায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, হিতবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তার প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এসে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। মার্কসবাদীরা একে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ উদারনৈতিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বিরোধীতা থেকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উদ্ভব। মার্কসবাদীরা মনে করেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাতেই যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর গণতন্ত্রের এ নতুন রূপটির উন্মেষ ঘটে।

গণতন্ত্র বিকাশের প্রক্রিয়ায় আমরা পাই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ যেমন, মহাভারত ও রামায়ন। এ গ্রন্থে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ করার অধিকার স্বীকৃত ছিল। বেদের যুগে গণতান্ত্রিক সংস্থা, সভা, সমিতি প্রভৃতি রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করত। 'গণ' নামক সংস্থার মাধ্যমে নাগরিকগণও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করত। প্রাচীন গ্রামীণ সমাজে গ্রাম-সভা-পঞ্চায়েত প্রভৃতির হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণের প্রবণতা ছিল। যা গণতন্ত্রের প্রতিফলন। প্রাচীন ভারতের মতোই গ্রিসে গণতন্ত্রের বিকাশ আমরা লক্ষ করেছি। এথেনীয় গণতান্ত্রিক আদর্শ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করেছে।

মধ্যযুগেও গণতন্ত্রের আদর্শ প্রসারলাভ করেছে। 'ন্যায়', 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি ধারণাগুলির প্রতি মধ্যযুগেও মানুষের আকর্ষণ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা জনগণের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এরকম ঘটনা বিরল নয়। এ সময় ইউরোপে গণতন্ত্রের প্রসারে বিভিন্ন বিষয় কাজ করেছে। যেমন: মহাসনদ অর্থাৎ ন্যায়বিচার লাভ করার জন্য তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা জনের (King John) বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ এবং রাজার প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর দান, ১২৬৫ সালে বিদ্রোহী সাইমন ডি মন্টফোর্ট কর্তৃক ইংল্যান্ডে প্রথম পার্লামেন্ট আহ্বান, জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে এ পার্লামেন্ট গঠন, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রত্যক্ষ বিক্ষোভ ও গৌরবের বিপ্লব, ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের পতন ও মৃত্যু, হেরিয়াস কর্পাস আইন, অধিকার সংক্রান্ত বিল প্রভৃতি।[৪০] আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে স্থাপনে সহায়তা করে। আধুনিক যুগে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে রুশোর অবদান উল্লেখযোগ্য। রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে গণতন্ত্রের গুণাবলি ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে তিনি সাধারণ ইচ্ছা [৪১] ধারণাটির মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন এবং গণতান্ত্রিক ইচ্ছাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পেছনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, হিতবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়। জেমস মিল, বেন্থাম প্রমুখ হিতবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন, গণতন্ত্র সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মঙ্গল সাধন করবে। শাসক-শাসিতের স্বার্থকে অভিন্ন করে তোলার মধ্যেই এর সার্থকতা নিহিত। জন স্টুয়ার্ট মিল, স্পেন্সার প্রমুখ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ মনে করেন ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণই গণতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে বলা যায়: ব্যক্তির স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল লক্ষ্য এবং ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপমুক্ত ব্যক্তি-সত্তাই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতীক।[৪২] ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ্যের বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্তাদি ভোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এখানে ব্যক্তির যুক্তিবাদিতার ওপর গভীর আস্থা স্থাপন করা হয়। ব্যক্তির নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা

প্রভৃতি গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখে। ফরাসী দার্শনিক টক্‌ভিল, আমেরিকান রাষ্ট্রনেতা টমাস জেফারসন, আব্রাহাম লিংকন, ম্যাডিসন, রুজভেল্ট প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকের চিন্তায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। বার্কার, গ্রিন, লাস্কি প্রমুখ চিন্তাবিদেরা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্বগত ভিত্তির প্রতি সমর্থন জানান। তবে পরবর্তীকালে লাস্কি মার্কসীয় তত্ত্বকে সমর্থন করেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার শাসনতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অগ্রগতি ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন, আইনের অনুশাসন-তত্ত্বের স্বীকৃতি গণতন্ত্রের প্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। বিশ শতকে রাশিয়ায় আক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসার ঘটতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা। কাজেই উৎপাদন ও ভোগ উভয়ই সামাজিক। এখানে জনসাধারণ বাস্তবে রূপায়িত সমানাধিকার ভোগ করে এবং জনসাধারণকে এর সাথে যুক্ত করা হয়। এ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা নয়, বরং সমাজের সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা এ গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে সমাজের সকল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থাকে।

সুতরাং বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সহ নানাবিধ সমস্যা থাকলেও গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের গভীর আকর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। কারণ একটা গণতান্ত্রিক সরকার সহনশীল, সহমর্মী ও মমত্ববোধের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সহজেই রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে পারে। গণতন্ত্রকে সফল করতে যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে, তা হলো জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারণার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো। সেক্ষেত্রে জনগণকে যেমন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধারণ করতে হবে, ঠিক তেমনি তা চর্চাও করতে হবে। অর্থাৎ জনগণ কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যেমন করবে, তেমনি প্রয়োজনের সময় প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করবে। এটাই গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখতে প্রধান ভূমিকা রাখে।

## তথ্যনির্দেশ


১. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, (প্রথম পত্র), শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬২৪।

২. R. C. Agarwall, *Political Theory*, S Chand and Company Ltd., New Delhi, 2016 , p. 255.

৩. হেরোডটাসের কোনো জীবনবৃত্তান্ত লেখা হয়নি। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাইজেনটাইন নগরে সংকলিত 'সুদা' (Suda) নামক অভিধানে (Lexicon) তাঁর ওপর একটি ছোট প্রবন্ধ আছে। অবশ্য তাঁর রচিত ইতিহাসই তাঁর জীবনালখ্যের প্রধান ও প্রয়োজনীয় উৎস। তিনি খ্রি. পূ. ৪৮৪ সালে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত ডোরিয়ান উপনিবেশ হেলিকার্নেসাস (Halicarnassus) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাসনক্ষমতা ও রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন বলে একবার স্বেচ্ছাচারী শাসক লিজডামিস (Lygdamis) কর্তৃক তিনি নির্বাসিত হন। কিন্তু পরে অত্যাচারী শাসককে উৎখাত করে নিয়মতান্ত্রিক সরকার বহাল করার জন্য দেশে ফিরে আসেন। এ কাজে তিনি সফল হন। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় এমন কোনো ঘটনা তিনি ইতিহাস বলে গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইতিবৃত্ত' (*Histories*) যা সাধারণভাবে গ্রিক-পারসিক যুদ্ধের ইতিহাস। খ্রি. পূ. ৪৩০ সালের পর তাঁর মৃত্যু হয়। [বিস্তারিত দেখুন, ড. এস. দেলওয়ার হোসেন, *ইতিহাসতত্ত্ব*, প্রতীক, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৬-৭৩]

৪. Aristotle, *The politics*, Book iv, Part vi.

৫. J. Bryce, *Modern Democracies*, Vol.1, The Macmillan Company, America , 1921, P. 20.

৬. R. C. Agarwall, *Political Theory*, S Chand and Company Ltd. New Delhi, 2010, p. 264.

৭. জন রবার্ট সিলী (১৮৩৪-১৮৯৫) একজন ইংরেজ প্রবন্ধকার ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা তাঁর বই *The Expansion of England* (১৮৮৩) এর জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। আজকের দিনেও সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক আলোচনা সমাজকে প্রভাবিত করে। এ ছাড়াও তাঁর আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বই হলো *The Growth of British Policy*, *Introduction to Political Science:Two Series Lecture*।

৮. R. C. Agarwall, *Political Theory*, S Chand and Company Ltd., New Delhi, 2010, p. 264.

৯. আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্টের ১৬তম প্রেসিডেন্ট। তিনি একজন রাষ্ট্রচিন্তাবিদও ছিলেন। ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম। ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হলো *An Autobiography of Abraham Lincoln*, *Speeches and Writings, The Gettysburg Address*। তিনি আমেরিকার দাসপ্রথার বিলোপ করেন। ১৮৬৫ সালের ১৫ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১০. R. C. Agarwall, *Political Theory*, S Chand and Company Ltd. New Delhi, 2010, p. 264.

১১. D. D. Raphael, *Problems of Political Philosophy*, The Macmillan Press Ltd, Revised Edition, London , 1976, p. 147.

১২. প্রাণগোবিন্দ দাশ, *আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, কোলকাতা, ২০১১ পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৩৫০।

১৩. Robert E. Goodin and Philip Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Blackwell Publishers Ltd., UK, 1993, P. 412.

১৪. R. A. Dhal, *Democracy and Its Critics*, Yale University Press, New Haven, 1989, P. 121-2.

১৫. Robert E. Goodin and Philip Pettit (ed), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, p. 412.

১৬. *Ibid*., P. 413.

১৭. *Loc. cit.*

১৮. *Loc. cit.*

১৯. J. C. Johari, *Contemporary Political Theory,* Sterling Publisher Private Limited, New Delhi, 1995, Reprint, P. 542.

২০. http://libgen.org/ book/index.php?md5= D5179F696D9485B2 c50BA2 CF966E3AA9 pp.8-13, accessed January 01, 2014.

২১. জন ডিউই (১৮৫৯–১৮২০) একজন প্রভাবশালী আমেরিকান দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষা সংস্কারক। তাঁর বইয়ের মধ্যে *Democracy and Education, Experience and Education, How to Think* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করেন একমাত্র গণতন্ত্রই হলো পূর্ণ ও সার্থক শিক্ষার উপযোগী আদর্শ সামাজিক সংগঠন।

২২. মরিস র‍্যাফেল কোহেন (১৮৮০–১৯৪৭) একজন আমেরিকান দার্শনিক ও আইনজীবী। তিনি যুক্তিবাদী ও ভাষাগত বিশ্লেষণের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে *Law and the Social Order : Essays in Legal Philosophy, American Thought: A Critical Sketch, Reason and Law:Studies in Justice Philosophy* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২৩. জন রলস (১৯২১–২০০২) আমেরিকার নৈতিক ও রাজনৈতিক দার্শনিক ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা আমেরিকার নতুন প্রজন্মের গণতান্ত্রিক বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে *Justice and Fairness, Theory of Justice, Political Liberalism, The Law of People* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২৪. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, (প্রথম পত্র), শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬৩৬।

২৫. Robert E. Goodin and Philip Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, p. 413.

২৬. *Ibid*, P 415.

২৭. *Loc. cit.*

২৮. প্রাণগোবিন্দ দাশ, *আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব*, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রা. লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৬৪

২৯. Robert E. Goodin and Philip Pettiti (ed.) *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, p. 416.

৩০. অনাদিকুমার মহাপাত্র, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা , ১৯৯৮, পৃ. ১৩৯

৩১. Robert E. Goodin and Philip Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, p. 417.

৩২. *Loc. cit.*

৩৩. Robert E. Goodin and Philip Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, p. 418.

৩৪. শিবনারায়ণ রায়, *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ.২৮

৩৫. পেরিক্লিস ছিলেন গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগের এথেন্স নগরের একজন প্রভাবশালী নেতা, বক্তা ও সেনাপতি। পারস্য ও পেলোপনেস যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে *Pericles Funeral Oration: Thucydides History of the peloponnesian War, Book 11 xxxv-xivi* উল্লেখযোগ্য।

৩৬. শিবনারায়ণ রায়, *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা , ১৯৮১, পৃ. ১৮৭।

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২।

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩।

৩৯. অনাদিকুমার মহাপাত্র, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০০, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৫২০।

৪০. অরুণ কুমার সেন, সুশীলকুমার সেন এবং শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, *রাষ্টবিজ্ঞান*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮৮।

৪১. রুশোর মতে, শর্তহীনভাবে আমরা সাধারণ ইচ্ছায় বিশ্বাস করি। আমরা প্রত্যেকে এবং সকলে আমাদের প্রত্যেকের এবং সকলের শক্তিকে আমাদের সকলের সাধারণ ইচ্ছার পরিচালনার অধীনে ন্যস্ত করি এবং সমগ্র সমাজসংস্থার মধ্যে তার একটি অবিভাজ্য অংশ হিসেবে আবার আমরা নিজেকে লাভ করি। [বিস্তারিত দেখুন, *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, সরদার ফজলল করিম (অনু.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৮, ৩য় মুদ্রণ, পৃ. ৩৫-৩৮।]

৪২. নির্মলকান্তি ঘোষ, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৭৫৬।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# আদর্শিক ধারণায় গণতন্ত্র

### ২.১ ভূমিকা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের যেমন দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতি, তেমনি রাষ্টকেও নাগরিকদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। নাগরিকেরা আশা করে রাষ্ট্র এমন এক সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করবে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে পারবে। এ কাজে রাষ্ট্রের সফলতা নির্ভর করে কোন আদর্শকে সামনে রেখে রাষ্ট্র অগ্রসর হচ্ছে তার ওপর। ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কোনো না কোনো আদর্শকে অনুসরণ করে, তেমনি রাষ্ট্রেরও একটি আদর্শ থাকে। এ আদর্শের বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার দ্বারা। পরিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন যুগে ও সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাসনব্যবস্থা ছিল। আলোচনাকে সহজভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমরা প্রাচীনকাল থেকে রাষ্ট্রে কীভাবে শাসনব্যবস্থা নীতি হিসেবে কাজ করে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

### ২.২ আদর্শিক গণতন্ত্রের ধারণা

যথার্থ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি যেমন তার মতামত প্রদান করতে পারে, তেমনি তার কর্মকাণ্ডের নৈতিক দায়ও তাকে বহন করতে হয়। আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র হলো এমন এক সমাজব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান অধিকার ও সুযোগ পাবে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান মর্যাদাসম্পন্ন। এ প্রসঙ্গে লেসলি লিপসন বলেন, "গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মর্মকথাই হচ্ছে নাগরিকদের মানবিক মর্যাদার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ। গণতন্ত্র এ কথার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যে, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি ও ব্যক্তিরা জনগণের সেবায় নিয়োজিত হবে।"[১]

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠিত হয় বলে গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। সরকারের সকল কাজের নৈতিক দায় নিতে হয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যক্তির নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, কর্তৃত্ববাদ, জাতীয়তাবাদ—এসব বিষয়ের সমন্বয় করা যায় গণতান্ত্রিক আদর্শে। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে যেসব আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে অন্যতম হলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র চিন্তা করা যায় না। তবে গণতন্ত্রের

সফল প্রয়োগে স্বাধীনতা, সাম্য, মানবাধিকার, জনমত, সুশাসন ও নৈতিকতা অপরিহার্য। কাজেই গণতান্ত্রিক আদর্শ হিসেবে এ ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

## ২.৩ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা

ল্যাটিন শব্দ 'Liber' থেকে ইংরেজি 'Liberty' শব্দের উৎপত্তি। 'Liber' শব্দের অর্থ স্বাধীন বা মুক্ত। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় নিজের অধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো নিজের ইচ্ছামাফিক পরিচালিত হওয়ার পথে কোনো নিয়ন্ত্রণ বা বাধানিষেধের অনুপস্থিতি। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাহীন পরিবেশই প্রধান। বার্লিনের মতে, স্বাধীনতার আলাদা দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত, নেতিবাচক ধারণা, অন্যদের দ্বারা কোনোরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে নিজ ক্রিয়াকলাপ চালানো, তখন তাকে স্বাধীনতা বলে। দ্বিতীয়ত, ইতিবাচক ধারণা, যেখানে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভর ও আত্মনিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীনতা ভোগ করে, বাহ্যিক শক্তির দ্বারা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় না।[২] তবে নঞর্থক স্বাধীনতার ধারণা ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার কথাও বলে। একজন মানুষ তার বাক-স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অথবা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ভোগ করবে, কিন্তু তা অন্যের ঐ সকল স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে নয়। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতার সাথে আইন, হস্তক্ষেপ ও পরিস্থিতি জড়িত। ইতিবাচক স্বাধীনতা সমাজের শাসন, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ এবং সভ্যতার বিকাশ ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চায়। এ প্রসঙ্গেও বার্লিনের মত, যে ব্যক্তি স্বশাসিত অথবা স্ব-নির্ধারণকারী, যে চিন্তাশীল, ইচ্ছুক সক্রিয় সত্তা, নিজস্ব অভিমতকে নিজের চিন্তা ও অভিরুচির দ্বারা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম তিনিই ইতিবাচকভাবে স্বাধীন।"[৩]

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে তাকে অন্যের সঙ্গে বসবাস করতে হয়। সে কারণে মানুষকে এমন কাজ করতে হয় যা কেবল সমৃদ্ধি আনবে না, তা সমাজ বিকাশের পক্ষেও অনুকূল হয়ে উঠবে। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের যুগপৎ বিকাশের জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন তাকেই স্বাধীনতা নামে অভিহিত করা যায়। লাস্কি বলেন: "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তার সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পায়।"[৪] কাজেই স্বাধীনতা এমন একটি সামাজিক অবস্থা বা পরিবেশকে নির্দেশ করে, যে পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব এবং যে সামাজিক পরিবেশের ওপর থেকে সকল প্রকার বাধা-নিষেধের অপসারণের ফলে আধুনিক সভ্য জীবনের প্রয়োজনীয় শর্ত বা অবস্থাকে সংরক্ষিত করা সম্ভব হয়।

মানুষের মেধা ও মননকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে স্বৈরাচারী রাষ্ট্র প্রচলিত ছিল তার ওপর প্রধানত ফরাসি ও শিল্প বিপ্লবের প্রভাবের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলোতে যে রাষ্ট্রের জন্ম হয় 'আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' তারই একটি নমুনা।[৫] গ্রিকরা রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে মনে করলেও প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র এবং সমাজ এক ও অভিন্ন নয়। উভয়ের পার্থক্য উল্লেখ করতে গিয়ে ম্যাকাইভার বলেন: "রাষ্ট্র হলো এমন একটি কাঠামো যা সমাজের সাথে সহাবস্থানীয় নয় তবে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি নির্ধারিত আদেশে প্রতিষ্ঠিত।"[৬] সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি সংরক্ষণের পক্ষে রাষ্ট্রই উপযুক্ত সংগঠন। ন্যায়পরতা রাষ্ট্রের ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন। কাজেই রাষ্ট্র এমন কিছু করবে না, যেখানে রাষ্ট্রের শান্তি ও ঐক্য ব্যাহত হয়। এ প্রসঙ্গে লাস্কি বলেন: "আমরা রাষ্ট্রের আনুগত্য করি কারণ এটি বাস্তবিকভাবেই আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে, যখন আমরা একে মান্য করি তখন নিজেদের মান্য করে সত্যে উপনীত থাকি, ফলে আমরা সেই সর্বোত্তম সত্তাকে মেনে চলি যা আমাদের ও আমাদের অনুসারীদের গড়ে তোলে।"[৭]

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার নিশ্চয়তা পায়। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস বিধায় সরকার জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। সরকার ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বই স্বাধীনতা সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব বহন করে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ একদিকে যেমন আত্মবিকাশের পথ পরিষ্কার করে তেমনি নাগরিকদের জন্য স্বাধীনতা অর্থবহ করে তোলে। স্বাধীনতার অভাব হলে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়। প্রত্যেকটি পরিবার তার সদস্যদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই আইন তৈরি ও প্রয়োগ করা হয়। তাতে ব্যক্তি বা নাগরিকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় না। এক্ষেত্রে মানুষের সদিচ্ছা কাজ করে। কান্ট বলেন যে, ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়াই সদিচ্ছা মানুষকে কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত করে। কারণ সদিচ্ছা নিজ গুণেই সৎ। তিনি মনে করেন, এমনভাবে মানুষ কাজ করবে যেন কাজের মূল সূত্রটি সর্বজনীন নিয়ম হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "এমন নিয়মানুসারে কাজ করো যে তোমার নিয়মের মাধ্যমে তোমার কর্ম সিদ্ধান্তটি বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক আইনে পর্যবসিত হতে পারে।"[৮] এখানে কান্ট মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বুদ্ধির জগতের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার স্বাধীন বুদ্ধির কল্যাণে সেই আইন প্রণয়নে অংশ নেয় যা সার্বিকতার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কান্ট বলেন: "এমনভাবে কাজ করো তা তোমার নিজের ক্ষেত্রেই হোক বা অন্য কারো ক্ষেত্রেই হোক—যেন মনুষ্যত্বকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, শুধু উপায় হিসেবে কখনোই নয়।" [৯] কান্ট মনে করেন,

নৈতিক আদেশ হলো নৈতিক আইন। নৈতিক আইন বাহ্যিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। ব্যক্তি নিজেই এ আইনের অধীন; এ আইন স্ব-আরোপিত।

রাষ্ট্রের নাগরিকদের কল্যাণের জন্য আইনের প্রয়োজন। একজন নাগরিক রাষ্ট্রের নিয়ম মেনে চলবে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ধর্মীয় অথবা সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করে যদি কোনো সুযোগ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে। ফলে যাদের ওপর আইন প্রয়োগ করা হবে, আইন তৈরির পূর্বে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন দেশের শাসনকার্যে জনগণ অংশগ্রহণ করবে এ কথাই গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। কিন্তু নাগরিকেরা যদি সরকারের কার্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে না পারে তবে গণতন্ত্রে সে-স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই। স্বাধীনতা মানে শুধু নিয়ম-কানুন মানা নয়। প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করবে। ব্যক্তিভেদে প্রত্যেকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ ও অপছন্দে পার্থক্য থাকবে। মানুষের বিবেক মানুষকে ভালো কাজে চালিত করে। এ কারণে মানুষ ভালো কাজ করতে আগ্রহী হলে তাকে বাধা না দিয়ে অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত। তা না হলে মানুষের ভালো কাজের প্রেরণা বিনষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। তবে রাজস্ব দেওয়া, রাস্তায় চলার সময় নিয়ম মানা এগুলোকে স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক মনে করা ঠিক নয়। মিল মনে করেন, জনসাধারণের কাজে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু এ মতকে সর্বজনীনভাবে গ্রহণ করা কষ্টকর। তাতে একজনের কাজের ফল অন্য জনকে ভোগ করতে হতে পারে। ফলে অন্য ব্যক্তির স্বার্থ তাতে ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু স্বাধীনতা অন্যের অধিকার হরণের কথা বলে না। তবে মিল বলার চেষ্টা করেন, অপরের ক্ষতি না করে, অপরকে আঘাত না দিয়ে যে নিজের স্বাধীন বৃত্তি বা পছন্দকে বেছে নেয় এবং নিজেকে বিকশিত করতে চায় সে-অধিকার তার থাকা উচিত। সমাজের প্রগতি যদি লক্ষ্য হয় তবে ব্যক্তিকে অবশ্যই তার জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দিতে হবে।[১০] স্বাধীনতা মানে আমি আমার নিজস্ব সত্তার অধিকারী। রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া কোনো খারাপ নীতি আমি মেনে চলতে বাধ্য নই। অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে আমার স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। কাজেই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এ স্বাধীনতা অপরিহার্য। ন্যায়সঙ্গত অধিকার যাতে আমি গ্রহণ করতে পারি সেজন্য আমরা রাষ্ট্রে বাস করি। এ প্রসঙ্গে লাস্কি বলেন:

> প্রত্যেক রাষ্ট্রে নাগরিকগণকে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়াকেই আমি স্বাধীনতা বলে উল্লেখ করেছি। সে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু সে-সুযোগ গ্রহণ করা বা না-করা মানুষের ইচ্ছা। আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, সরকার মানুষকে খুব বেশি সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন না। তার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। আমি হয়ত কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছি, তাকে ছাড়া আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই – আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের কর্তব্য কী? আগে জাতি, ধর্ম বা বর্ণগত কারণে অনেক সময় প্রেমের পথে বাধা সৃষ্টি হতো। সরকার সে-বাধা দূর করতে পারেন।

কিন্তু আমার প্রেম সফল হবে, সরকার এ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সরকার আমাকে সুযোগ দিতে পারেন, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা আমার নিজের ইচ্ছা বা ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে। সরকার শুধু আমার পথের বাধা দূর করে দেবেন।[১১]

সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা থাকে সরকারের হাতে। সরকারকে আইন-কানুন ও নীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করতে হয়। ইচ্ছা করলেই যে-কোনো আইন সরকার প্রয়োগ করতে পারে না। সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট যে, সরকারকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শাসনকার্য চালাতে হয়। কারণ নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, যাতে ধনী-দরিদ্র উভয়েই ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এ জন্য দেশের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়ে প্রকৃত সংবাদ সরবরাহ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কেননা সঠিক সংবাদ সম্পর্ক অবহিত না হলে জনগণ বিভ্রান্ত হতে পারে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে শ্রমিকেরা যাতে শিল্পপতিদের ক্রীড়নক না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে সরকারকে নিরপেক্ষভাবে দেশ শাসন করতে হবে। কোনো শ্রেণির বা গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। তবে এ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া কঠিন। সমাজে নানারকম মানুষ বাস করে। তাদের স্বার্থও একরকম নয়। সব মানুষের জ্ঞান ও সামর্থ্য যেহেতু সমান নয় সেহেতু সবাই সমান কাজ করতে পারবে না। কাজেই সরকারের পক্ষে সমানভাবে সবার স্বার্থ রক্ষা করা কঠিন। সে-কারণে কোনো মানুষ যদি অধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন সে-বিষয়ে তাকে সোচ্চার হতে হবে।

১৯১৭ সালে আমেরিকায় গোয়েন্দাগিরি আইন পাস করা হয়। সে-আইনকে পরে ক্ষমতাসীন লোকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োগ করা হয়েছিল। ১৯২০ সালে আয়ারল্যান্ডে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্রিটেনে একই আইন পাস করা হয়। কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষার নামে অনেক নিরপরাধ নাগরিককে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।[১২] তাই নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষায় নাগরিককেই সাহসী ও সচেতন হতে হয়, যাতে সরকার তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা খর্ব করতে না পারে। সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগ এবং রক্ষা করতে হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অপরিহার্য। স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হলো প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ। গণভোট, গণ-উদ্যোগ, গণআন্দোলন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে শাসনচক্রের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা যায়। এতে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং শাসকেরা নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাধ্য হয়।

## ২.৪ গণতন্ত্র ও সাম্য

গণতন্ত্র সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী। যে সমাজে সাম্যকে আদর্শ হিসেবে দেখা হয় সেখানে কোনো বৈষম্য ও অনৈক্য, তা সে জন্মগত হোক বা অর্থনৈতিক হোক, থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকই সমান সুযোগ, অধিকার ও মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতায় সকলেই অংশগ্রহণ করে। এ ব্যবস্থায় ঐক্য ও সাম্যকে গুরুত্ব দিয়ে সকলের সমান সুযোগ সৃষ্টি করে নাগরিকদের নৈতিক বা মানসিক বিভেদ দূর করার চেষ্টা করা হয়। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, গণতন্ত্র হচ্ছে স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ যথাসম্ভব হ্রাস করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি মনে করেন, "কোনো জাতি এমন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যে, তারা ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ না পায়, তাহলে তত্ত্বগতভাবে এই নিশ্চয়তা দান করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগই সে সুযোগ লাভ করবে।"[১৩] একইভাবে গণতান্ত্রিক সমাজে সকল ব্যক্তির সম্মান প্রদানের বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়।

সাধারণ অর্থে সাম্য বলতে বোঝায় মানুষে মানুষে সমতা। রাষ্ট্রদর্শনে সাম্যকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে সাম্যের সীমাহীন ও অবারিত ধারণার স্থান নেই। কেননা সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি, মেধা, কর্মক্ষমতা ও নৈতিকতার ধারণা এক নয়। মানুষে মানুষে শক্তি-সামর্থ্য ও বুদ্ধিবৃত্তির পার্থক্য আছে বলে প্রত্যেকে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমান সুযোগ-সুবিধা বা ব্যবহার দাবি করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে লাস্কি বলেন: "একজন গণিতবিদের প্রকৃতি যদি কোনো রাজমিস্ত্রীর প্রকৃতির সাথে অভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায় তবে সমাজের উদ্দেশ্য প্রথমেই ব্যাহত হবে।"[১৪] প্রকৃত অর্থে সাম্য অর্থ হলো সকলের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য সমান সুযোগ প্রদান, অর্থাৎ প্রত্যেককে আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করা। সাম্যে বিশেষ সুবিধা নয় বরং প্রত্যেকে পর্যাপ্ত সুবিধা পাবে। লাস্কি উল্লেখ করেন: "কাজেই সমতা হলো প্রথমত বিশেষ সুযোগ সুবিধার অভাব।"[১৫] সকলের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা থাকলে তাকেই সাম্যাবস্থা বলা যায়। লাস্কি আরও বলেন: "সমতার অর্থ পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত।"[১৬] সমান সুযোগ পেলেই প্রত্যেকে সমানভাবে বিকশিত হবে এটা বলা যায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যখন প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সমান সুযোগ সৃষ্টি করবে তখন মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী সামর্থ্যের বিকাশের সুযোগ পাবে। মার্কসবাদ মনে করে, ধনবৈষম্যমূলক ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রকৃত সাম্যের অস্তিত্ব অসম্ভব। কেননা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও সাম্য একসাথে থাকতে পারে না। সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও শ্রেণি শোষণের বিলোপের দ্বারা সাম্যের পরিবেশ তৈরি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কমিউনিজমে উত্তরণের পথ পাওয়া যেতে পারে, যে পথে শ্রেণিবিরোধ ও শ্রেণির আধিপত্য লুপ্ত হবে।

প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণিহীন সমাজ। শ্রেণিহীন সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে বিকাশের সমান সুযোগ পাবে। এঙ্গেলস বলেন,

> কমিউনিজমের উপর সংগঠিত সমাজ সর্বতোমুখী ক্ষমতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগের ব্যবস্থা করবে। .... ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ হলে আমরা প্রধানত পাব সমাজের উৎপাদিকা শক্তির উদ্দেশ্যানুযায়ী পূর্ণ ব্যবহার, প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী জিনিসপত্রের সরবরাহের জন্য উৎপাদনের বৃদ্ধি, বহুর প্রয়োজন বলি দিয়ে একের প্রয়োজনে উৎপাদন চালাবার ব্যবস্থার ধ্বংস, সমস্ত শ্রেণি এবং তার আনুষঙ্গিক বিরোধের বিলোপ, চলতি সমাজের শ্রমবিভাগের নীতির অবলুপ্তি এবং শিল্প শিক্ষার সাহায্যে কর্মধারার পরিবর্তন সাধন করে সমষ্টিগত পরিশ্রমে তৈরি জিনিসের উপর প্রত্যেকের সুখ ভোগ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গ্রাম ও শহরের পরস্পরের মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে সমাজের প্রত্যেকটি সভ্যের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ সাধন করা হবে।[১৭]

সাম্যের উপস্থিতি গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করে। সাম্য ও স্বাধীনতা ব্যতীত গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করা যায় না। সাম্যভিত্তিক রাষ্ট্রে ভেদাভেদ থাকার কথা নয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভেদাভেদ লক্ষ করা যায়। যারা দেশ শাসন করেন, তারা অনেক সময় নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখেন। এ কারণে সাম্যের ক্ষেত্রে প্রথমেই বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিলোপ হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যতটুকু সম্ভব সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে একজন পিয়ন ও একজন রাষ্ট্রপ্রধান একই বেতন-ভাতা দাবি করতে পারবে না। কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বলা যায় সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যতীত মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না।

মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে যদি কাউকে সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে তা দেওয়া যেতে পারে। যেমন, একজন বিজ্ঞানীকে তার গবেষণার সুযোগ দেওয়া। কেননা এ গবেষণার মাধ্যমে মানুষ ও দেশের কল্যাণ হবে। এখানে সমাজকল্যাণের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। তবে নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে স্বীকার করতে হবে। একজন লোক রিকশাচালক হোক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক, তাদের প্রাথমিক দাবি মেটানো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে লাস্কি বলেন:

> সাম্যবাদের যে জিনিসটি আমার ভালো লাগে তা হচ্ছে—এখানে মানুষের প্রয়োজনকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাম্যবাদের অন্যান্য নীতিগুলো সমাজের পক্ষে খুব উপকারী বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ হলো, মানুষকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। সবার কাজকে সমান মূল্য দিলে সমাজের প্রতি অবিচার করা হবে। সেজন্য আমি বলেছিলাম, প্রথমে মানুষের মৌলিক অধিকার মিটাতে হবে। তারপর সমাজকল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে প্রয়োজন হলে কাউকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।[১৮]

দেশের সম্পদের কথা চিন্তা করে এ আদর্শের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নাগরিকদের মৌলিক দাবিগুলো মেটানোর ওপর প্রথমে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা মৌলিক দাবিগুলো সকলের সমান। সমাজে

বা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেশি হলে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। সেখানে ধনীকশ্রেণির ইচ্ছানুযায়ী আইন-কানুন চলে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগও তাদের প্রভাবমুক্ত থাকে না। যে সমাজে শিল্পপতি স্বার্থবুদ্ধি ও স্বেচ্ছাচারিতাকে বর্জন করে না, সেখানে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে শ্রমিক শ্রেণির কোনো মর্যাদা নেই। তারা কোনো মর্যাদার আসন পায় না। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক থাকে না। এখানেই রাষ্ট্রকে সাম্য-নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায় যে, মানুষের সমস্যা দেশে ও রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নয়। ফলে আন্তর্জাতিক বিষয়টিও আমাদের বিবেচনা করতে হয়। পৃথিবীতে দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, শ্রেণিতে-শ্রেণিতে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে, তাতে সকলের ক্ষমতা ও অধিকার সমান নয়। এ অসুবিধা দূর করতে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে সব দেশের প্রতিনিধিদের সমান মূল্য ও গুরুত্ব দিতে হবে। এরপর সকল প্রতিনিধিগণ মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে অনেক দেশ এখনও স্বাধীন নয়। অনেক পরাধীন দেশ ও জাতি রয়েছে। সেখানাকর পিছিয়ে থাকা মানুষগুলো যাতে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। বৃহৎ শক্তির তত্ত্বাবধানে ছোট ছোট দেশ আছে। এক্ষেত্রে বৃহৎশক্তির আন্তর্জাতিক সংস্থার ক্ষেত্রে জবাবদিহির বিষয় থাকতে হবে। তারা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে ভালো কাজের আদেশ দেবে আর মন্দ কাজে থেকে বিরত থাকতে বলবে। এক কথায় অনুন্নত জাতির জন্য সভ্য সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের উন্নত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধু আইন দিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা সম্ভব নয়। মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি আন্তরিক হতে হবে। এক্ষেত্রে সবকিছু রাষ্ট্রের ওপর ছেড়ে দিলেই হবে না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে এ কথা সত্য। তবে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকেরও কর্তব্য রয়েছে। শুধু সরকারের একক প্রচেষ্টায় কোনো নাগরিকের অধিকার সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলে কিছু বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। যেমন, সরকারকে নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। আর নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হবে। এখানে একটি হবে অন্যটির পরিপূরক।

সাম্যের মাধ্যমেই সভ্য সমাজ সূচিত হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ সাম্যের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রের আর এক অর্থ সামাজিক গণতন্ত্র। এটা হলো এমন ব্যবস্থা যেখানে মানুষে-মানুষে, ধনী-দরিদ্রে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে, জাত-বর্ণে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। সাম্য ও স্বাধীনতাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আশীর্বাদও বলা যায়। সাম্য স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। বস্তুত স্বাধীনতা ও সাম্যকে পৃথক করা হলে উভয়ের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। স্বাধীনতা যেমন নাগরিকের মতামত প্রকাশে সাহায্য করে তেমনি সাম্য ধনী-গরিবের ভেদাভেদ দূর করে। সুতরাং উভয়েই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

## ২.৫ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

সামাজিক মানুষ হিসেবে মানুষের যে অধিকার তা হলো মানবাধিকার। এ অধিকার মানুষের জন্মগত। মানবাধিকার হলো মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, মানব মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকার অধিকার, ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীলতাকে বিকশিত করার মাধ্যমে মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ৩০টি ধারা সম্বলিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়। 'মানবাধিকার' শব্দটি বিভিন্ন দেশের সরকারের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। সরকার মানবাধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সে-অনুযায়ী কাজ করার কথা বলে। মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এ ধারণা বিকশিত হয়েছে। এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে মানুষ প্রতিবাদ করে। বিশ্বায়নের যুগে মানবাধিকারের ধারণাটি একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। *Encyclopedia of Britannica* তে বলা হয়েছে: "প্রাকৃতিকভাবেই মানুষ তার অধিকার নিয়ে চিন্তা করে।"[১৯] ১৯৯০-এর দশক থেকে, বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে মানবাধিকার বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। জি. এলান মানবাধিকারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

> মানবাধিকার নৈতিক অধিকারের এমন একটি প্রকার যেখানে মানুষ হিসাবে সবাই সমান। এরূপ অধিকারগুলো যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে সর্বজনীন ও ন্যায়সঙ্গত নীতির দ্বারা গৃহীত হতে পারে।[২০]

*The Social Work Dictionary*-তে মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, মানবাধিকার হলো জাতি, লিঙ্গ, ভাষা বা ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো রকম পার্থক্য ছাড়াই সামাজিক পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে সকলের জন্য একই ধরনের সুবিধা ও নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা পালনের সুযোগ।[২১] কাজেই মানবাধিকার হলো সেসব অধিকার, যেগুলো সকল মানুষ ধারণ করে। এসব অধিকার আইন দ্বারা সংরক্ষিত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এ ধারণাটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিকশিত হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। আধুনিক ও সাম্প্রতিক সময়ে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে সুশৃঙ্খলরূপে আছে। সক্রেটিসের চিন্তাচেতনা ও প্লেটোর আদর্শে মানুষের সুযোগ-সুবিধার বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] এরিস্টটল ন্যায়বিচার ও সততা প্রতিষ্ঠায় আহ্বান জানান।[২৩] রোমান সভ্যতায়ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রাচীন যুগে মানবাধিকারের ধারণাটি পরিপূর্ণভাবে আসেনি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হয় 'নৈতিক ব্যক্তিত্ব সমান' এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। যেখানে ধনী-গরিব, পুরুষ-নারী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সবাই সমান। নৈতিক ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। যার ভেতর দিয়ে ব্যক্তি নৈতিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো স্বাধীনতা।

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, স্বাধীনতা ও সাম্য গণতন্ত্রের মূল কথা। এ মূলনীতি কার্যকর করতে হলে মানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম শর্তগুলোকে স্বীকার করতে হয়। এ স্বীকৃতি আসে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে। মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনে যখন কোনো শর্তকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় তখন সে-স্বীকৃতি থেকে আসে রাষ্ট্রিক অধিকারের ধারণা। এ অধিকার সর্বজনগ্রাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা সমর্থিত ও মানুষের প্রকৃতিজাত বলেই এর নাম 'প্রাকৃতিক অধিকার'। প্রাকৃতিক অধিকারকে প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে যুক্ত করে মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্ব উপস্থিত করেন রাষ্ট্রদার্শনিক জন লক্[২৪]। লক বলেন: "মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সম্পত্তি, অর্থাৎ নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও জিনিসপত্র রক্ষার অধিকারী।"[২৫] উদারনীতিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজকর্ম ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকাকে সম্প্রসারিত করার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে। এ উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্টি হয়েছে মানবাধিকারের ধারণা।

পরবর্তী পর্যায়ে ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে প্রাকৃতিক অধিকারের সূত্র ধরে মানবিক অধিকারের বিষয়টি অধিক গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। ফ্রান্সে যাঁরা গণতন্ত্রের সূচনা করেন তাঁরা অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে মানবাধিকারের ঘোষণা করেন। প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যযুগীয় ধারণার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস[২৬]। তিনি বিশ্বজনীন নৈতিকতার রূপরেখার মধ্যে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমাজকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, এবং সেজন্য ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের অর্থাৎ শাসকের জন্যও নৈতিক কর্তব্য নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম বা ধর্মীয় অনুশাসন থেকে পৃথক করার আদর্শ (ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারাইজেশন) গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক কর্তব্যবোধের পরিবর্তে মানুষের অধিকার সম্পর্কিত বৈপ্লবিক ধারণাটির উদ্ভব ঘটে।[২৭] দ্বিতীয় বিশযুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা মানুষের প্রাথমিক অধিকার সম্পর্কিত ধারণাটিকে রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসে। ফলে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা করা হয় এবং একইসাথে এ অধিকারকে বিশ্বব্যাপী সুরক্ষার কথাও ঘোষণা করা হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রে অধিকার বলতে শুধু ক্ষমতাকে নির্দেশ করা হয় না, বরং অধিকার হলো সেই বৈধ ক্ষমতা যার মাধ্যমে মানবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানানো হয়। সুতরাং আজ মানবাধিকার ধারণাটির মধ্যে মানুষের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম আয়, চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ, সবেতনে ছুটি ভোগ ইত্যাদি ধারণাগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এম. ক্রাউনস্টন দুই ধরনের অধিকারের কথা উল্লেখ করেন। যথা: (ক) আইনগত অধিকার ও (খ) নৈতিক অধিকার।[২৮] দৃষ্টবাদীরা[২৯] একমাত্র আইনগত অধিকারের কথা বলেন। আদালতের সাহায্যে এ অধিকার ভোগ করা যায়। নৈতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কোনো আইনী ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয় না। এ অধিকার কোনো বিশেষ গণ্ডি, সমাজ, জাতি

ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জার্মান দার্শনিক কান্ট স্বাধীনতার নৈতিক ভিত্তির ওপর জোর দেন। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতার ধারণার ওপরই নৈতিকতার আদর্শগত ও বস্তুগত উভয় দিকের ভিত্তিমূল স্থাপিত। আবার স্বাধীনতার ধারণার পশ্চাতে রয়েছে যুক্তির দৃঢ় সমর্থন।[৩০]

যখন বিশেষ বিশেষ মানবাধিকার সাংবিধানিক অধিকারের মর্যাদা পায়, তখন রাষ্ট্রিক আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে অধিকারগুলোকে ক্ষুণ্ন করা যায় না। মানুষ হিসেবে মানুষের যে অধিকার রয়েছে সেটাই মানবাধিকার। মানবাধিকার কখনই চরম ও সীমাহীন হতে পারে না, এ অধিকার ছেড়ে দেয়া বা কেড়ে নেওয়া যায় না। যেমন, ক্রীতদাস প্রথা সব সময়ই অবৈধ; তাতে ক্রীতদাসের উপকার হোক বা না হোক, প্রভু যদি ক্রীতদাসের ওপর অত্যাচার না করে তবুও এ প্রথা বর্জনীয়। কেননা এখানে মৌল স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে বিপন্ন এবং ক্রীতদাসদের নৈতিক ব্যক্তিত্ব অস্বীকৃত। মর্যাদা ও স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মানবিক মর্যাদার ধারণার মধ্যেই রয়েছে স্বাধীনতার ধারণা। মানবাধিকারের বিষয়টি কেবল আইনগত ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ নয়। মানবাধিকার হলো মানুষের গভীরতম সত্তার প্রতিফলন। মানবাধিকার তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিবর্তন সর্বতোভাবে নৈতিক চেতনার ওপর নির্ভরশীল। মানবাধিকার হলো মানুষের ন্যূনতম কল্যাণময় জীবনের নৈতিক নিশ্চয়তা প্রদানকারী বিষয়। এক্ষেত্রে আইনগত অধিকারেরও ভূমিকা রয়েছে। এটি মূলত নৈতিক ও আইনগত অধিকারের একটি সম্মিলিত রূপ।

মানবাধিকার মানুষের জীবন ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বাধীনতা ও সাম্য এ তত্ত্বের ভিত্তি। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংবিধান মানবাধিকারের অন্যতম রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক পরিবেশে মানুষ তার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ এবং শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

### ২.৬ গণতন্ত্র ও জনমত

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সফলতার ক্ষেত্রে জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, জনমত সর্বশক্তিমান।[৩১] সাধারণভাবে বলা যায়, জনমত হলো জনগণের অভিমত। গ্রিক ও রোমান আইনে জনমত সম্পর্কিত ধারণার আলোচনা পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম ফরাসি দার্শনিক রুশো 'জনমত' শব্দটি ব্যবহার করেন। রুশো মনে করেন জনগণের অভিমতই ঈশ্বরের অভিমত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "রাষ্ট্রের আইনগত শক্তির মালিক হচ্ছে জনতা। অপর কেউই এই শক্তির অধিকারি হতে পারে না।"[৩২] জনমত

হলো সে সমস্ত ব্যক্তিগত মতামতের সমষ্টি যার প্রতি সরকারি কর্মচারিগণ কিছু পরিমাণে সজাগ থাকেন। সরকারি কার্যাবলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ মতের গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়। এখানে সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করা হয় বিধায় অধিকাংশ ব্যক্তি একে স্বীকার করে নেয়। এ প্রসঙ্গে জেমস ব্রাইস বলেন: "মানুষের সেই বিষয়গুলোর ধারণাকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা সম্প্রদায়কে প্রভাবিত বা আগ্রহান্বিত করে। সুতরাং এটি সকল রকম বিতর্কিত ধারণা, বিশ্বাস, কল্পনা, কুসংস্কার এবং আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি হিসাবে প্রতীত হয়েছে।"[৩৩]

জনমত গঠনের জন্য প্রয়োজন বিচারবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি এবং শিক্ষা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনমত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ভাবাবেগ দ্বারা চালিত। তবে জনমত হলো আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। ম্যাকাইভার মনে করেন যে, জনমত সংক্রান্ত কার্যপ্রবাহ গণতন্ত্রকে সফল রাখে। ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও নৈতিক বিচারের সমন্বয়ে জনমত গঠিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠরা এ মতের বিরুদ্ধে যদি সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা না করে তখনই তা হয় জনমত। কাজেই দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন মনের প্রতিক্রিয়ার ফল হচ্ছে জনমত। রুশো যাকে সাধারণ ইচ্ছা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন:

> যতক্ষণ একটা সম্মিলিত জনসমষ্টি একটি সংস্থা হিসেবে অস্তিত্বমান থাকে, ততক্ষণ সে একটি মাত্র ইচ্ছাকে বহন করে। এ ইচ্ছার লক্ষ্য হচ্ছে সম্মিলনের সকলের অস্তিত্বকে রক্ষা করা। লক্ষ্য হচ্ছে সকলের মঙ্গলসাধন করা। এমন অবস্থাতে রাষ্ট্রের অস্তিত্বরক্ষাকারী সূত্রগুলোর বন্ধন থাকে দৃঢ়, সরল বন্ধনে তারা আবদ্ধ।[৩৪]

এ আলোচনা থেকে জনমতের কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যথা: ১. জনমত জনগণের সামগ্রিক কল্যাণে সহায়ক; ২. এখানে আস্থার দৃঢ়তা থাকে এবং ৩. এটি একটি সুদৃঢ় ও সুসংহত অভিমত। জনমতের ধারণা গণতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে গুরুত্ব লাভ করেছে। যখন সরকারি-নীতি ধীরে ধীরে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে জনমতের ব্যাপারে পরিণত হলো তখন জনমতের ভূমিকা স্বীকৃতি লাভ করল। জনমত শাসিত সরকার হিসেবে গণতন্ত্র যেসব অনুমানের ওপর নির্ভরশীল সেগুলো হলো: ১. জনসাধারণ শাসনের ব্যাপারে আগ্রহী; ২. জনসাধারণ জানে তারা কী চায়; ৩. জনসাধারণ কী চায় তা প্রকাশ করতে পারে এবং ৪. জনসাধারণের ইচ্ছা আইনে পরিণত হয়।[৩৫]

জনমত আইনের ভাষাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। কোনো সমস্যা সম্পর্কে যখন কোনো জনগোষ্ঠীর সকলের মতামত প্রকাশিত হয় তখন সেটাই হলো জনমত। জনমতের স্বরূপ থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

১. জনমত কোনো ব্যক্তিগত মতকে নয় বরং এটা দ্বারা সমষ্টিগত মতকে বোঝায়,

২. এটি সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির প্রতিনিধিস্থানীয় মত,

৩. এতে আস্থার দৃঢ়তা থাকে এবং

৪. এটি পরিবর্তিত হলেও ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট ও সুসংহত অবস্থায় আসে।

জনমতের দুটি মাত্রা লক্ষ করা যায়। যথা: (১) গতি ও (২) তীব্রতা। প্রথমটি দ্বারা জনমত কোন দলের পক্ষে যাচ্ছে তা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়টিতে কোন ব্যক্তি কতখানি জোরের সঙ্গে তার মতকে চালিত করেছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। গণতন্ত্রে জনমতের শাসনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সকল প্রকার শাসন-কর্তৃত্বের উৎস জনমত। শাসকের ক্ষমতার উৎস শাসিতের সম্মতি। এ প্রসঙ্গে মিল বলেন:

> মানুষই সরকার সৃষ্টি করে, কাজেই সরকার আদৌ সৃষ্টি করা বা না করা তাদের ইচ্ছা; আবার কীভাবে করবে আর কোন ধরনের করবে, তাও নির্ধারণ করা তাদের ইচ্ছা বলে তারা মনে করে। এ মত অনুসারে ব্যবহারিক জীবনের যে কোনো প্রশ্ন যেভাবে সমাধান করা হয়ে থাকে, সরকারের ধরনের সমস্যাও সেভাবেই সমাধান করতে হবে।[৩৬]

সরকার যদি জনমতকে অগ্রাহ্য করে কাজ করে তখন জনমত তার বিরোধিতা করে। এ ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ জনমত বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাতে পারে। জনমত-শাসিত সরকারই হলো গণতন্ত্র। জনমত যদি সুচিন্তিত, যুক্তিপূর্ণ এবং কল্যাণের হয় তাহলে গণতন্ত্রের আদর্শ সফল হবে। আর জনমত যদি বিকৃত হয় তাহলে গণতন্ত্রও বিকৃত হবে। এককথায় আদর্শ শাসনব্যবস্থা পেতে হলে সুষ্ঠু, বলিষ্ঠ ও সুচিন্তিত জনমত গঠন করা প্রয়োজন। মিলের মতে, "যেকোনো সরকারের উৎকর্ষের মাপকাঠি হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে তার সদগুণ ও বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টির ক্ষমতা।"[৩৭] আদর্শ গণতন্ত্রে জনমত যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবার সুযোগ পায়। কোনো শাসনব্যবস্থা কতটুকু গণতান্ত্রিক তা পরিমাপ করা যায় ঐ শাসনব্যবস্থার ওপর জনমত কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার দ্বারা। যে দেশের শাসন তার জনমত দ্বারা যত বেশি নিয়ন্ত্রিত সে-দেশের শাসনব্যবস্থা তত বেশি গণতান্ত্রিক মনে করা হয়। কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কার্যত বিরোধী মতামতের সংগঠনের মধ্যে টিকে থাকে। অন্য ধরনের সরকার থেকে গণতন্ত্রের পার্থক্য হলো গণতন্ত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে সমাজ-কাঠামোর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অবাধ মতামতগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা হয়। এখানে এমন এক অবস্থা বিরাজ করে যেখানে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী কখনই সরকারের ওপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে না। আইন যখন জনমতের প্রতিভূ হয় তখন তা রাজনৈতিক আনুগত্যের সমস্যার সহজ সমাধান করতে সক্ষম হয়। নাগরিকেরা আইন মান্য করে বিধায় আইনপ্রণেতা ও আইনগ্রহীতার পার্থক্য কমে আসে। ম্যাকাইভার বলেন:

যে সকল রাষ্ট্রে জনগণের ইচ্ছা কার্যকর থাকে, সেখানে সরকারের ক্ষমতার সাথে দায়িত্ববোধ সংযুক্ত হয়। 'জনগণের ইচ্ছার' বা চূড়ান্ত সার্বভৌমের কোনো শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব থাকে না; কেননা তা শেষ আবেদনের ক্ষমতা হিসেবে সংরক্ষিত থাকে।[৩৮]

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ শাসকশ্রেণির কার্যকলাপের প্রতি খেয়াল রাখে, যাতে শাসক স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত না হয়। বলিষ্ঠ জনমতই স্বৈরাচারী হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে। জনমতকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ থাকলেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মতামত প্রকাশ করে। ব্যক্তিগত মতামত ও ধ্যানধারণা প্রকাশের সুযোগ থাকায় ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। স্বাধীন ও অবাধ জনমত গঠনের ক্ষেত্রে দুটি প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। যথা: (ক) ধনীদের প্রাধান্য এবং (২) দারিদ্র্যের চাপ। যোগাযোগের মাধ্যমগুলো যেমন, সংবাদপত্র ধনীদের হাতে থাকলে তারা নিজেদের স্বার্থে জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি দরিদ্র সে সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকে, দেশের সমস্যা সম্পর্কে তার ভাবার সময় থাকে না। জনমত গঠনের মাধ্যম, যেমন মুদ্রাযন্ত্র, বেতার ও চলচ্চিত্র, সভা-সমিতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, আইনসভা, পরিবার ও গৃহ ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের সচেতনতা কম থাকে। এগুলো জনমতের সাথে থাকলে সমষ্টিগতভাবে তা রাষ্ট্রের ওপর ভূমিকা রাখতে পারে।

গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করা হয়, সমাজের উন্নতির প্রচেষ্টায় প্রত্যেকের কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহণ থাকে। এখানে সকলের অবদানের গুরুত্ব রয়েছে। জনকল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে সরকার জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখেই নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাই গণতন্ত্রে জনমতকে ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। গণতন্ত্রে নাগরিকদের বাক-স্বাধীনতা থাকায় এবং জনসংযোগের মাধ্যমগুলোর ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় স্বাধীনভাবে জনমত গঠিত হতে পারে।

## ২.৭ গণতন্ত্র ও সুশাসন

একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র সৃষ্টির অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা। একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সুশাসনের পথ সুগম করতে পারে। সুশাসন হলো মূলত শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ, শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও সকল কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সকল ক্ষেত্রে সমতা ও সকলের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ। সুশাসন টেকসই মানব উন্নয়নকে সহজ করে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঠিক চর্চা থাকলে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন রোধ করা সম্ভব হয়। আলোই অন্ধকারকে দূর করতে পারে। এ আলো মূলত সুশাসন। সুশাসনে তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক তথ্য-উপাত্ত না থাকলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবাদী হওয়া ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন কায়েমের পথ সুগম হতে পারে। সরকার গঠনে জনগণ যদি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে তাহলে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র বা স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৩৯]

জাতিসংঘের একটি সংস্থা 'এসকাপ' আইনের শাসন ও সরকারের অংশীদারিত্বের চরিত্রের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এসকাপের আলোচনা থেকে এর কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেগুলো হলো: অংশগ্রহণমূলক, ঐক্যমতের ভিত্তিতে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সংবেদনশীলতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সার্বজনীনতা। এখানে আইনের শাসন বলতে আইনের স্বচ্ছ কাঠামো, স্বাধীন আদালতের নিরপেক্ষ বিচার এবং দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্লেটো বলেন:

> কখনও কখনও আইন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মানুষকে সম্মত করাবে আবার কখনও কখনও যখন তারা শৃঙ্খলাভঙ্গকারীর মনোভাব পোষণ করবে, তখন সহিংসতা ও ন্যায়-বিচারের শাস্তিদানের মাধ্যমে তাদের পথে আনবে। ফলে দেবতা যদি মুখ তুলে চায় তাহলে আমাদের নগরীকে আর্শীবাদপুষ্ট ও সুখী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সফল হবে আইন।[৪০]

সুশাসনের লক্ষ্য হলো সবার জন্য ন্যায়ভিত্তিক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সুশাসন এমন একটি পদ্ধতি যা জনসাধারণের সম্পদ ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেয়। ফলে সম্পদের অপব্যবহার ও দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হয়। এটি আইনের শাসনের সমতুল্য। সুশাসনে সরকার নাগরিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, পর্যাপ্ত বাসস্থান, খাদ্য, মানসম্মত শিক্ষা, ন্যায়বিচার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে কাজ করে। উন্নয়নের ধরনে যদি দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিহীনতা ইত্যাদি থাকে এবং একইসাথে যদি উন্নয়ন প্রকল্প অতি উচ্চমাত্রায় সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতি বা বিপর্যয়ের কারণ হয়, তাহলে তা কুশাসন অবধারিত করে তোলে।[৪১] রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সুশাসন মানবাধিকার রক্ষায় সহায়তা করে। সরকার জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করার জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণের পথ মুক্ত রাখে, ফলে শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষ তার অধিকার ও কর্তব্য পালন করতে পারে। সুশাসন প্রয়োজনে আইন সংস্কার করতে পারে, যাতে জনসাধারণের কল্যাণে আইন ব্যবহৃত হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানবাধিকারের মানদণ্ডে নেতৃত্ব দিলে প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন বজায়

থাকে। ফলে জনসাধাণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন বা অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে একাধিক সামাজিক গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়।

এরিস্টটল তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের আলোচনায় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে আইনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যেহেতু বাস্তব আদর্শ রাষ্ট্রের চিন্তা করেছিলেন সে-কারণে আইনের সার্বভৌমত্বকে আদর্শ রাষ্ট্রের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি মনে করেন, একজন শাসক ব্যক্তি হিসেবে যতই জ্ঞানী বা গুণী হোক আইনকে বাদ দিয়ে তার পক্ষে শাসন করা অসম্ভব। আইন হলো একমাত্র জিনিস যা নৈর্ব্যক্তিকতার অধিকারী হতে পারে না। আইনের নিরাসক্ত কর্তৃত্ব আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে এমন এক নৈতিক গুণে গুণান্বিত করে তোলে যা অন্য কোনোভাবে লাভ করা অসম্ভব। এরিস্টটল মনে করেন, আইনের শাসন ব্যক্তিকে তার সংকীর্ণ স্বার্থবোধের ওপরে উঠে আইন প্রণয়নে সক্ষম করে তোলে। তিনি বলেন: "আইন যেখানে শাসন করে না সেখানে কোনো শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে না। সকলের ওপরই আইনের শাসন থাকা আবশ্যক।"[৪২] অর্থাৎ মানুষকে শুধু সদুপদেশ দান যথেষ্ট নয়, বরং আইনের বাধ্যতামূলক ক্ষমতারও প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব লুকিয়ে আছে তা শুধুমাত্র নীতিশাস্ত্রের মাধ্যমে দূর করা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ খুব জরুরি। ভালো আইন উন্নতমানের সৎ জীবনের জন্য অপরিহার্য। একমাত্র ভালো আইনের মাধ্যমে মানুষকে সদগুণের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায়। এখানে মানুষের জ্ঞানের সক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ থাকে। আইন কেবল শক্তিমানের স্বার্থ রক্ষা করে না। এর দ্বারা সামাজিকভাবে মানুষের সম্পর্কও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে শ্রমিক ও জমিদার প্রত্যেকে তার নিজ অধিকার ভোগ করবে। প্রত্যেক আইনের দোষ-গুণ থাকা সত্ত্বেও আইন এমন কিছু কাজ করে যা জনসাধারণের জন্য উপকারে আসে। কাজেই সুশাসনের ক্ষেত্রে আইনের শাসন অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

## ২.৮ আদর্শ রাষ্ট্র ও নৈতিকতা

রাষ্ট্রের সাথে আদর্শ কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তার *'রিপাবলিক'* গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। তিনি রাষ্ট্রে নাগরিক শ্রেণিকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি মনে করেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থেই ব্যক্তি মানুষের জৈবিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় ঘটাতে হবে। তাঁর মতে,

> আদর্শ রাষ্ট্রে অনুশীলনের একটি অপরিহার্য গুরুত্ব রয়েছে, এর চিন্তাধারাই সঠিক লক্ষ্যকে কার্যে পরিণত করে। সুতরাং আদর্শ রাষ্ট্র বা মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণের পরিবর্তে সীমিত সম্ভাবনার মধ্যে নূন্যতম পরিবর্তনটুকু আবিষ্কার করাই যথেষ্ট যা যথার্থ রাষ্ট্রকে আদর্শের দিকে নিয়ে যায়।[৪৩]

আদর্শ রাষ্ট্রকে প্লেটো একটি নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। এটি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র যেখানে মানুষ সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে। এ কারণে প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থটি শুরুই করেছেন ন্যায়পরতার ধারণা দিয়ে। তাঁর মতে, "ন্যায় হচ্ছে নিজের কাজ করা এবং অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।"[৪৪] ন্যায় ছাড়াও তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা, সাম্যবাদ ও জ্ঞানবিষয়ক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি মনে করেন, আদর্শ রাষ্ট্রের শাসক হবেন প্রজ্ঞাশীল দার্শনিকবৃন্দ। পরবর্তী সময়ে আদর্শ রাষ্ট্র ও সাম্যবাদের ধারণা দেন টমাস মুর (১৪৮৮-১৫৩৫), টমাসো কাম্পানেলা (১৫৬৮-১৬৩৯), সাঁ-সিমোঁ (১৭৬০-১৮২৫), চার্লস ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭) ও রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮)। প্লেটো তাঁর ধারণাতত্ত্বের আলোকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যা বিমূর্ত, স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল এক ধরনের শাশ্বত ধারণা। যেমন প্লেটো বলেন:

> প্রত্যেকটি ধারণা শ্রেণীগতভাবে পরিপূর্ণভাবে নিখুঁত। এর পরিপূর্ণতা এর বাস্তবতার সমান। নিখুঁত মানুষ একজন সর্বজনীন নমুনা মানুষ অর্থাৎ, মানুষের ধারণা। সকল ব্যক্তি মানুষ এই নিখুঁত নমুনা থেকে কমবেশি ব্যতিক্রমী। যতদূর একজন ব্যক্তি নিখুঁত নমুনা থেকে ছিটকে পড়বে, সে ততটা অসম্পূর্ণ অবাস্তব প্রতীয়মান হবে।[৪৫]

একটি বিড়ালের অনেক বৈশিষ্ট্য থাকলেও সবকিছুর ঊর্ধ্বে একটি শুদ্ধ ধারণা রয়েছে তা হলো বিড়ালের 'বিড়ালত্ব'। তবে বিড়ালের বাস্তব অস্তিত্ব থাকলেও আদর্শ রাষ্ট্রের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তবে যে সব ধারণার মাধ্যমে একে মূর্ত করা সম্ভব সেগুলো হলো আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা, ন্যায়, সাম্য, অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণা—এগুলোর সাথে উচিত ও অনুচিতের প্রসঙ্গ যোগ করে আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণায় উপনীত হওয়া যেতে পারে। প্লেটোর *রিপাবলিকে* ধারণাগুলো পাওয়া যায়। অর্থাৎ অস্তিত্বশীল বিষয়গুলোর মাধ্যমে অস্তিত্বহীন বিষয়গুলোকে তুলে ধরা। আদর্শ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান ও কিছু মাত্রা থাকে। টমাস মুর তাঁর *ইউটোপিয়া* গ্রন্থে ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আদর্শ ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অনেকবার 'স্বর্গ' কথাটি ব্যবহার করেন।[৪৬] আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে একটি আদর্শপূর্ণ সুন্দর জীবন অর্জন করা। যেখানে থাকবে সর্বোচ্চ আদর্শ। তবে এর নিশ্চয়তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও মানুষ ও সমাজের জন্য এটি যৌক্তিক। মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, নন্দনতাত্ত্বিক ও নৈতিক দিক থেকে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা আমরা জর্জ কাতেবের আদর্শ রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনার মধ্যে পাই। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের চেতনাকে বোঝাতে গিয়ে যে মত দেন তা হলো, "আদর্শ রাষ্ট্র বিষয়ক রচনা হলো সামাজিক বাস্তবতার এক নতুন ধরনের কল্পনার মধ্য দিয়ে পাওয়া এক বিনোদনমূলক আনন্দ...। আদর্শ রাষ্ট্রকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার মানদণ্ড হলো মূলত নন্দনতাত্ত্বিক...। যেখানে থাকে মানবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিক জড়িত। আদর্শ রাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টান্ত, যেমন, *প্লেটোর রিপাবলিক* এবং *লজ*,

কেম্পানেলার *দি সিটি অব সান*, মোরেলির *কোড দ্য লা নেচার*, সেন্ট-সাইমন এবং ফুরিয়ার-এর রচনাবলি, এইচ. জি. ওয়েল্‌সের *এ মর্ডাণ ইউটোপিয়া*—এগুলো সমাজতাত্ত্বিক প্রজ্ঞায় বড় অবদান রাখে। তাই প্রচলিত সমাজবিজ্ঞানে আদর্শ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক রচনা তুলে ধরতে হবে। আদর্শ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক আলোচনা তুলে ধরা, নৈতিকতার বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া এবং আদর্শ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক রচনাবলি হলো প্রকৃতির প্রতিফলনের সংরক্ষণাগার।"[৪৭] তবে জর্জ কাতেব নন্দনতাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তাকে আদর্শ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দিকটি বাদ দিয়ে যে তিনটি দিকের আলোচনা পাওয়া যায় তার মধ্যে মনোবিদ্যক ও নৈতিক দিকের ব্যাখ্যা বৌদ্ধ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক আলোচনায়ও দেখা যায়। এখানে সমাজতাত্ত্বিক বিষয়কে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নির্বাণ লাভের মধ্য দিয়ে শাশ্বত আনন্দে অবস্থান করা হলো বৌদ্ধ মতবাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিক। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আদর্শ রাষ্ট্র-কাঠামোর পার্থক্য থাকায় বাস্তবায়নেও পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচ্যে মনোবিদ্যক ও নৈতিক দিককে গুরুত্ব দিয়ে আংশিক আদর্শ রাষ্ট্র-কাঠামোকে বাস্তবায়ন করা গেলেও পাশ্চাত্যে তাত্ত্বিক দিক থেকে উপরোক্ত চারটি দিককে গুরুত্ব দিলেও বাস্তবে আদর্শ রাষ্ট্র পাওয়া যায়নি।

গৌতম বুদ্ধ খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শতকে যে চারটি আর্যসত্যের ব্যাখ্যা করেন, তার মধ্যে চতুর্থ আর্যসত্যে আটটি পথের উল্লেখ রয়েছে যা সুন্দর ও শান্তিময় জীবনের জন্য অপরিহার্য, যার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করে পরমশান্তি লাভ করা যায়। আদর্শ জীবনের অধিকারী হয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করা যায়। এখানে দেখা যায় যে, বুদ্ধের আদর্শ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক মত অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ন রেখে নৈতিক বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে আংশিকভাবে হলেও অর্জন করা সম্ভব। পৃথিবীতে ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব আছে ও থাকবে। ব্যক্তি ও সমষ্টিকে যদি আমরা সমন্বয় করতে পারি তাহলে আদর্শ রাষ্ট্র পাওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তির ওপর সামষ্টিক ক্ষমতা ও অনধিকার চর্চা বন্ধ করতে হবে। ফলে মানুষ অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্তি পাবে। মানুষ হবে স্বাধীন যা রাষ্ট্রকে আরও উন্নতির দিক নিয়ে যাবে। মার্কসবাদের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে কেবল কথা বলা আর কাজকর্মের স্বাধীনতা নয়, গণতন্ত্র মানে কেবল পার্লামেন্টের নির্বাচন নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল নিহিত সম্পত্তি মালিকানার প্রকৃতিতে। মালিকানার ধরন পাল্টানো ছাড়া প্রকৃত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "...পুঁজিবাদের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কেবল কথা বলার স্বাধীনতা ও নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিপরীত দিকে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিটি ব্যক্তির সৃজনশীল বিকাশ ও আত্মোপলব্ধির সব দুয়ার খুলে দেয়, যার মাধ্যমে প্রকৃত আত্মমুক্তির যাবতীয় সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।"[৪৮]

আদর্শ রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের বৈষম্য থাকবে না। উভয়েই সমান অধিকার ভোগ করবে। রাষ্ট্রের যেখানে সম-অধিকার থাকে না সেখানে মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয়। আর এটা হলে তাকে আদর্শ রাষ্ট্র বলা যাবে

না। প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলেন সেখানে সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। এরিস্টটল মনে করেন, আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো সমাজের পরম মঙ্গল, মানুষকে উৎকৃষ্ট ও সুখী জীবনযাপনে সহায়তা করা। এরিস্টটল মনে করেন, সেই রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ যা নৈতিক গুণে শ্রেষ্ঠ।[৪৯] আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি হলো পরিমিত জনসংখ্যা, মাঝারি ভূখণ্ড, তেজস্বী ও বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সংহতি ও সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। চার্লস ফুরিয়ের তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের আলোচনায় নারী অধিকারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজনৈতিক পর্যালোচনায় নারীবাদকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো বা দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন, উদারনৈতিক নারীবাদে নারী-পুরুষের অপৃথকীকৃত মানব প্রকৃতির ধারণাকে তুলে ধরা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো জনজীবনে পুরুষের সাথে নারীর সমতা অর্জন। এখানে নারীবাদী ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিবর্তে সমাজের সংস্কার ধারণার ওপর জোর দেওয়া হয়।[৫০]

কিন্তু প্রাচ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নারী অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হয় না। কাজেই সমন্বয়বাদকে যদি প্রয়োগ করা যায় তবে কিছুটা হলেও আদর্শ রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন সম্ভব। এ সমন্বয় হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমষ্টিবাদের সমন্বয়, নারী ও পুরুষের সমন্বয়। তবে আদর্শ রাষ্ট্র নিয়ে বির্তক বিদ্যমান। কেননা রাষ্ট্রে শুধু ভালো ও যৌক্তিক মানুষ বাস করে না। রাষ্ট্রকে ভালো-মন্দ, যৌক্তিক-অযৌক্তিক এবং শুভ ও অশুভের মিলনকেন্দ্রও বলা যেতে পারে। তবে সমাজের ও রাষ্ট্রের এ পার্থক্যগুলো ঘুচিয়ে আমরা কিছুটা হলেও আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে স্যামুয়েল হান্টিংটন বলেন:

> মনুষ্যসমাজে অনুশাসন সম্বন্ধনীয় আইন ও বিধানাবলির ভেতর একটি বিষয় রয়েছে, যা অন্যান্যগুলোর চেয়ে খুবই স্পষ্ট এবং বাস্তবে কার্যকর। যদি মানুষ সভ্য হিসেবে বাঁচতে চাওয়ার প্রত্যয় আরও অব্যাহত রাখতে চায়, তাহলে সবাই মিলেমিশে সম্মিলিতভাবে (একত্রিত) হওয়ার গুণাগুণ ও কলাকৌশল সৃষ্টি করা ও তা উন্নত করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং তা করতে হবে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য জীবনযাত্রার বস্তুগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।[৫১]

আদর্শ রাষ্ট্র-কাঠামোতে গণতন্ত্রের চর্চাই উত্তম। গণতন্ত্রের সঠিক বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের মধ্যে নৈতিক মূলবোধের চর্চার ক্ষেত্রে নৈতিক দায়বদ্ধতাকে দৃঢ় অবস্থানে রাখা অতীব প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে সুন্দর সমাধান সম্ভব হয় না। নৈতিক মূল্যবোধের সঠিক প্রয়োগ ছাড়া গণতন্ত্রের সফলতা অনেকাংশেই অর্থহীন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার নিজের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং নৈতিক মানদণ্ডগুলোকে নিয়ে গণতন্ত্র চর্চা করে তবে সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র মানুষের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সুশৃঙ্খল ও সুন্দর রাষ্ট্র বাস্তবায়নে দরকার সরকারসহ নাগরিকদের নৈতিকবোধ, আর রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা কিংবা ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন নৈতিক সমাজ। নীতিবিদ্যার দিক থেকে নৈতিক বাধ্য-বাধকতাবোধ, নীতিবোধ ও আনুগত্যের ধারণা দ্বারা নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার

ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে মানবাধিকার এবং অর্থনীতির দর্শনে আর্থিক সমতার যথাযথ ব্যবস্থা করে সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

গৌতম বুদ্ধ, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, কান্ট, রাসেল, মার্কস প্রমুখ দার্শনিকেরা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নৈতিক আলোচনার ওপর জোর দিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধই প্রথম একটি সুন্দর ও নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষ্যে নৈতিক তত্ত্ব প্রদান করেন। সততা, ভ্রাতৃত্ব, মানবপ্রেম এবং অহিংসা ছিল তাঁর নৈতিকতার প্রাণকেন্দ্র। তিনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় : "সকল প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদহীন হোক, নিরোগ হোক, সুখে বাস করুক, দুঃখ থেকে মুক্ত হোক, যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক এবং কর্ম মানুষের বন্ধু বা স্বকীয়।"[৫২] তাঁর মানবতাবাদী চিন্তা সর্বব্যাপী বিস্তৃত। স্নেহ, মায়া-সততা, দয়া-করুণা, সহমর্মিতা, অন্যের ধর্মবিশ্বাসে শ্রদ্ধা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক ন্যায়বোধ, সামাজিক কল্যাণ, নৈতিকতা ইত্যাদি সবগুলো মানব ধর্ম। এগুলো নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য নয়, সমগ্র মানব জাতির জন্য তিনি এ কল্যাণ ধর্মের কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যে মানুষ ও মনুষ্যত্বের জয়গান ঘোষিত হয়েছে যা বিশ্বপ্রেমের দিক নির্দেশ করে, যার আবেদন সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, আস্তিক-নাস্তিক সহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমগ্র মানুষের কাছে সমভাবে কার্যকর।[৫৩]

বুদ্ধের নীতিবাদে সামাজিক মানুষের দুঃখ লাঘবের ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি তাঁর নৈতিক আলোচনায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর[৫৪] কথা বলেন। তিনি মনে করেন সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে সংহতি রক্ষার জন্য এ নীতি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁর আদর্শবাদের লক্ষ্য হলো বিশ্বসমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে মনুষ্যত্ববোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তাঁর এ নৈতিকতার লক্ষ্য হলো বর্ণহীন, বিভেদবর্জিত, অসাম্প্রদায়িক, বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম অপেক্ষা মানুষকে শ্রেয়তর ঘোষণা করে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বিশ্বমানবতাবোধ, বিশ্বসম্প্রীতি, বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তি, যা একটি বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

রাষ্ট্র ও নৈতিকতা পারস্পর নির্ভরশীল। নৈতিক দাবিগুলোর যূথবদ্ধতার ওপর ভিত্তি করেই সমাজ থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কনফুসিয়াস[৫৫] (৫৫১-৪৭১ খ্রিষ্টপূর্ব) তাঁর দার্শনিক পর্যালোচনায় রাষ্ট্র ও সমাজের এ নৈতিক বিয়ষটি স্পষ্ট করেন। তিনি তাঁর আলোচনায় তিনটি নৈতিক শব্দ ব্যবহার করেন। এগুলো হলো 'Jen' 'Li', এবং 'Tao'—এই শব্দ তিনটির বিশ্লেষণ থেকে 'সমাজ' ও নৈতিকতা' প্রসঙ্গে কনফুসিয়াসের বক্তব্য বোঝা যায়। 'Jen' শব্দটিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সামাজিক মানুষের আদর্শিক নীতি হিসেবে। নীতি মানুষকে বিনম্র, শালীন ও দয়ায় উজ্জীবিত করতে সহায়তা করে। 'Jen' হলো এক

ধরনের সদগুণ, এটি নির্ণীত হয় শালীনতা, বদান্যতা, মানবতাবোধ, সৎ চরিত্র এবং সৎ স্বভাব দ্বারা।[৫৬] 'Tao' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে মানব সভ্যতার এমন ভিত্তি যার অনুশীলন দ্বারা মানুষ তাঁর মধ্যকার পশুবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি, কামবৃত্তি ও বিদ্বেষপরায়ণভাব দমন করতে পারে। সমাজকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও রুচিশীল আচরণে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করতে পারে। প্লেটো তাঁর *The Republic, Statesman* এবং *The Law* গ্রন্থে সমাজ ও নৈতিকতা নিয়েও আলোচনা করেছেন। প্লেটো নৈতিকতা বলতে বোঝান আইনের প্রকারান্তরণকে (Modification)। তিনি মনে করেন 'নীতি' ও 'আইনের' সাংগঠনিক ধারাবাহিক সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজে 'সমতা' প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নাগরিকেরা যদি নীতি ও আইনের আলোকে স্বাধীনতা, ঐক্য, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব নিশ্চিত করতে পারে তবে নীতি ও আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব। তিনি গ্রিক নগর-রাষ্ট্রে এসব নীতির অনুশীলনের কথা বলেন। যার ফলে নগর-রাষ্ট্রগুলো বিদ্যমান অনাচার, অরাজকতা ও অসাম্য লোপ করে সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর কাছে নৈতিকতা ও ন্যায়পরতা সমার্থক। তিনি ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়পরতা অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, সমাজের জন্য ন্যায়পরতা হলো 'আত্মা' এবং সমাজ হলো ন্যায়পরতার 'দেহ'। তিনি মনে করেন মানুষ সমাজ, আইন ও সরকার প্রতিষ্ঠা ও প্রণয়ন করে উন্নত জীবনযাপনের মানসে। প্লেটোর মতে উৎকৃষ্ট সরকার হচ্ছে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সংযোগ; কারণ এ ধরনের সরকার ও রাষ্ট্রে সম্মিলন ঘটে প্রজ্ঞা ও স্বাধীনতার।[৫৭] এ কারণে একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। এরিস্টটল ও প্লেটো উভয়েই সঠিক শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা গুরুত্বের সঙ্গে নীতিবান প্রজ্ঞাশীল শাসক তৈরির পন্থার উল্লেখ করেছেন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরির জন্য। কিন্তু তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পরিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র মানুষের দ্বারা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

হেগেলীয় সমাজ-দর্শনেও প্লেটোর এ ধারণাটি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি ব্যক্তি ও তার নীতিবোধকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় অধীনে স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের ভেতরেই ব্যক্তি তার নৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়।[৫৮] তাঁর মতে রাষ্ট্র ও ন্যায়পরতা হলো একই সত্তার দুটি ভিন্ন রূপ। অন্যভাবে বলা যায় ন্যায়ের ধারণা আদর্শ রাষ্ট্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত, একটাকে অন্যটা থেকে আলাদা করা যায় না। ন্যায় হলো আত্মা, রাষ্ট্র হলো দেহ। রাষ্ট্র ও ন্যায়ের সম্পর্ক দেহ ও আত্মার সম্পর্কের মতোই অবিচ্ছেদ্য। প্লেটো মনে করেন ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ না হলে রাষ্ট্র ন্যায়পরায়ণ হতে পারে না। তিনি ব্যক্তির ন্যায়পরতাকে সদগুণের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি ন্যায়ের নীতি ওপর ভিত্তি করে আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্যনীতি বাস্তবায়নের কথা বলেন।

এরিস্টটল সমাজকে নৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে ব্যাখ্যা করেন। তিনি নৈতিক কর্মে পারদর্শী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের দায়িত্বে রাখার পক্ষে ছিলেন। সংহতিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রত্যাশার কারণে তিনি নৈতিকতাকে

বেছে নেন এবং তিনি মনে করেন এর দ্বারাই মানুষের মধ্যে পরিমিতিবোধ ও স্বচ্ছ বিচারবোধের উদ্রেক হয়ে থাকে। সমাজের সাথে নৈতিক বিষয়টির গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি দুই প্রকার ন্যায়পরতার কথা বলেন। ব্যাপক অর্থে ন্যায়পরতা বলতে তিনি সদগুণ, চরিত্রের দক্ষতা, সামাজিক ও গণসম্পর্কের বিষয়কে গুরুত্ব দেন। আর অন্যটিকে ব্যাখ্যা করেন সমতার নীতি দ্বারা। তিনি মনে করেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সমতা বিধান সম্ভব। এককথায় মানুষের প্রাপ্তিটুকু সুষ্ঠুভাবে চুকিয়ে দেওয়া। এর আবার দুটি ভাগ রয়েছে। যথা: (১) বিভাজিত ন্যায়পরতা ও (২) সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা। বিভাজিত ন্যায়পরতা সমাজের মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। তিনি মনে করেন, সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা হলো লাভ ও লোকসানের মধ্যবর্তী অবস্থা। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন: "সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা মূলত অন্য একজন ব্যক্তির বিপরীতে একজন ব্যক্তিকে তার অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং হারানো সমতা পুনরুদ্ধারের জন্য পরিগণিত।"[৫৯] ন্যায়ধর্ম হবে সকলের আদর্শ এবং এই আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের অভ্যাস ও যুক্তিশক্তি উন্নত করতে হবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে নাগরিককে আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তোলা। সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা যদি ঠিকমত প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে সমাজের উন্নতি, প্রগতি ও সাফল্য সম্ভব হবে। এরিস্টটল মানুষের সততার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সৎকর্ম মানুষকে শীর্ষদেশে পৌঁছে দিতে পারে। জন রলস[৬০] মনে করেন, ন্যায়পরতার সাধারণ রূপ অনুযায়ী সকল মানুষের মৌলিক অধিকার ও চাহিদাসমূহকে সমান সমান অংশে বণ্টন করতে হবে। তবে সমাজের কম সুবিধাভোগী ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দারিদ্য বিমোচনের জন্য অসমতা নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে।[৬১] তিনি মনে করেন, দেশের প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে সঠিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করার প্রয়োজন আছে। তিনি বলার চেষ্টা করেন, একটি ন্যায্য ও কার্যকর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে ন্যায়পরতার নীতিগুলোই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে সঠিকভাবে কাজ করে।[৬২]

প্রাচীন যুগের পর মধ্যযুগে গণতন্ত্রের তেমন কোনো বিকাশ হয়নি। ধর্মনিয়ন্ত্রিত মধ্যযুগ ছিল অন্ধকার যুগ। এরপর আধুনিক যুগে যুক্তির সূচনায় দর্শন, সমাজ ও রাজনীতি সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়। আধুনিক যুগের শুরুতে টমাস হবস এবং জন লক-এর রাষ্ট্রচিন্তায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণতন্ত্র ও নৈতিক বোধের সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্র বিষয়ে হবসের আলোচনা পাওয়া যায় তাঁর *Leviathan*[৬৩] গ্রন্থে। সপ্তদশ শতকের বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের মধ্যে তিনি লক্ষ করেন রাষ্ট্রিক শান্তি ও শৃঙ্খলার বিপদ। এ কারণে তিনি রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে *Leviathan* এ নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। তিনি এখানে প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল, পন্থা, সঠিক ও উপযুক্ত

রাষ্ট্র-শাসনের রূপ, রাজনৈতিক আনুগত্যের স্বরূপ ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষমতার জন্য সকল মানুষের মধ্যে একটা স্থায়ী এবং অবিরাম কামনা থাকে। এ ক্ষমতার লোভ, মর্যাদা, ধনসম্পদ ও কর্তৃত্বের জন্য সে অন্য মানুষের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। জীবন যুদ্ধে যারা একে অপরের শত্রু। হবস মনে করেন, এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে দরকার 'সামাজিক চুক্তি'র মাধ্যমে রাষ্ট্র-কাঠামো গঠন করা। এর সাথে যুক্ত থাকবে নৈতিক চেতনা ও ঔচিত্যবোধের কথা। এখানে থাকবে পারস্পরিক অধিকার ত্যাগের অঙ্গীকার। তিনি মনে করেন, যখনই কোনো ব্যক্তি তার অধিকার ত্যাগ করে তখন হয় সে কিছু অধিকার নিজের কাছে স্থানান্তরের কথা ভাবে বা অন্য ভালো কিছুর আশা করে। কেননা এটি একটি ইচ্ছাকৃত কাজ এবং ইচ্ছাকৃত কাজগুলো ব্যক্তির পক্ষে ইতিবাচক হয়।[৬৪] হবস মনে করেন প্রতিটি মানুষেরই উচিত শান্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং নিজের স্বাধীনতার বিপরীতে অন্যকে স্বাধীনতা প্রদান করা। যে চুক্তি মানুষকে শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে অসমর্থ করে বা যে-চুক্তি শক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত সে-চুক্তি বেআইনি। চুক্তির মধ্যে থাকবে পারস্পরিক স্বাধীনতা। হবসের সময় গণতন্ত্র কার্যকর ছিল না। সে-সময় ধর্মীয় প্রশাসন বা রাজতন্ত্র দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। তিনি ধর্মীয় প্রশাসনের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এর প্রচলিত রূপের পরিবর্তে তিনি এর নাম দেন কমওয়েলথ। গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রকেও (aristocracy) তিনি কমওয়েলথের প্রকরণ হিসেবে দেখেছেন, যদিও এ দুটোকে তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু রাজতন্ত্রের সনাতনী রূপটিকে পরিবর্তন করে যেভাবে তিনি এটাকে কমনওয়েলথ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে।[৫৮] কমনওয়েলথ এর ধারণায় ভোট, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এবং শান্তিতে বাস করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে। হবস বহু ব্যক্তিত্বের সংযুক্তির মধ্য দিয়ে একক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ দেখিয়েছেন। এই একক ব্যক্তি 'Leviathan'-কে যিনি পরিচালনা করেন তিনি সার্বভৌম। রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিই সার্বভৌম। বিরামহীন যুদ্ধের অবস্থা থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজ্যে পৌঁছার লক্ষ্যেই পারস্পরিক চুক্তি করে মানুষ তার ক্ষমতা তুলে দেয় যে কর্তৃপক্ষের হাতে এবং যার আনুগত্য স্বীকারে আগ্রহী হয় সে-কর্তৃপক্ষই সার্বভৌম। হবস মনে করেন, সার্বভৌমের সাহায্যে আইন ও নৈতিকতা উভয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হবসের মতের আরও সুসংবদ্ধ ও সুসংহত রূপ দেখা যায় লক-এর বর্ণিত চুক্তিতত্ত্বে। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে এ চুক্তি হলো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এ চুক্তির ক্ষেত্রে তিনি নৈতিকতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষ যদি স্বাধীন না হতো তাহলে তাকে তার কাজের জন্য নৈতিকভাবে দায়ী করা যেত না। ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নীতিবিদ্যার স্বীকার্য সত্য হিসেবে স্বীকার করায় মানুষের সকল কাজের নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। লক এ স্বাধীনতাকে রাজনীতির প্রেক্ষিতে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর *The Second Treatise of Government* গ্রন্থের শুরুতেই রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার

বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন: "রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে কোন বাস্তবতায় আছে, এই বাস্তবতাটা হলো মানুষের কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা।"[৬৫]

লকের রাষ্ট্রচিন্তা আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, মানুষের কার্যকলাপ ও নৈতিকতার পেছনে একটি বিশ্বাস কাজ করে, বিশ্বাসটি হলো ঊর্ধ্বতন শক্তির উপস্থিতি। এ বিশ্বাস মানুষের সংবেদনশীলতা ও অন্তর্দর্শনেরই প্রকাশ। তিনি মনে করেন, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। মানুষের নৈতিক কর্তব্য তার প্রকৃতি থেকে উৎসারিত হয়। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি, যুক্তি ও কাজ করার সবরকম গুণাবলি রয়েছে। শৃঙ্খলার গুণেই সে অন্য সব প্রাণী থেকে পৃথক। এ শক্তিই তাকে কীভাবে চলা উচিত, কী কর্তব্য পালন করার উচিত, এ সবকিছু জানতে সাহায্য করে। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। তবে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের ভালো-মন্দ বিচার ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার প্রেক্ষাপটেই করতে হয়। স্বাধীনতার সংকোচন নয়, সংরক্ষণ ও প্রসারই লক-এর রাষ্ট্রদর্শনের আসল কথা।

লকের বর্ণিত স্বাধীনতা মানুষের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করেন, জনগণের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রশক্তির বৈধতা থাকতে পারে না। স্বাধীনতার এমন চর্চার জন্য প্রয়োজন এমন পরিবেশ যা আমাদেরকে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাবে। অপরের ক্ষতি না করে নিজের স্বাধীনতাকে বজায় রেখে নৈতিকতাকে সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজন এমন সমাজব্যবস্থা যাকে তিনি সুশীল বা রাজনৈতিক সমাজ নাম দিয়েছেন।[৬৬] এখানে অনেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে বর্জন করে জনগণের নিকট তা অর্পণ করে, যাকে তিনি কমনওয়েলথ বলে উল্লেখ করেন। এর লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন। তাঁর এ মতাদর্শ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া একটি গণতান্ত্রিক বিষয়, যেখানে নিজেকে সমাজের অপরের নিকট দায়বদ্ধ করে রাখা হয়, যা নৈতিক দায়বদ্ধতা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। গণতন্ত্রের উত্তম দিকগুলো নৈতিক মূল্যবোধেরই প্রতিফলন। নৈতিক মূল্যবোধ উত্তম সমাজ তৈরিতে সাহায্য করে। হবস্ ও লকের ধ্রুপদী রচনায় যে নৈতিক মূল্যবোধের উল্লেখ পাওয়া যায় তা গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। নৈতিকতা না থাকলে গণতন্ত্র উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রে পরিণত হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক চেতনায় মূল কেন্দ্র হলো জনগণ। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব কাজের যেমন উচিত ও অনুচিতের বিচার করা হয়, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠেরও উচিত ও অনুচিতের বিচার করা হয়। এ আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এর আলোচনা দেখা যায় এডামস্রের বিশ্লেষণে। তিনি মনে করেন, সামাজিক নানা বিষয়ে আমাদের নৈতিক ত্রুটি অনেক ক্ষেত্রেই

তৈরি হয় এ কারণে যে, আমরা কাজ করি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাথে সমন্বিত নৈতিক বিধিমালা দিয়ে, বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের সাথে সমন্বিত নৈতিক বিধিমালা দিয়ে নয়।[৬৭] যেহেতু ব্যক্তি মিলেই গড়ে ওঠে সমষ্টি সেহেতু ব্যক্তিকে গুরুত্ব না দিলে সমষ্টির কল্যাণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আবদুল কালাম বলেন:

> আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের সবার জন্য প্রয়োজন মনে প্রাণে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা। অন্যান্যদের প্রতি অসহনশীল হওয়া, ঘৃণা প্রকাশ করা, অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ, আইন হাতে তুলে নেওয়া এবং মানুষের ওপর উৎপীড়ন কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সকলের অধিকারকে রক্ষা করতে হবে। এগুলো রক্ষিত হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে।[৬৮]

এ কারণে বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্ককে সমষ্টিগতভাবেই বিবেচনা করতে হবে। নীতি নির্ধারকেরা একজন ব্যক্তি বা কিছু ব্যক্তিসমষ্টি হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই ত্রুটি দেখা দিতে পারে। ঐ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দরকার ব্যক্তিগত নৈতিক ত্রুটি থেকে বেরিয়ে আসা। ব্যক্তিকে নৈতিক শিক্ষার ভেতর দিয়ে যদি উত্তম মানুষে রূপান্তরিত করা যায় তবে সেখানে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে চালিয়ে নেয়া সহজ হয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখতে মানুষের নৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন বলেন, "গণতন্ত্রের মুখ্য বিষয় হলো রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সংলাপ এবং প্রকাশ্য বিতর্ক। ... গণতন্ত্রের ধারণাটি ন্যায্যতার সঙ্গে যুক্ত। ন্যায্যতার মূল্যায়ন কেবলমাত্র প্রকাশ্য যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই করা সম্ভব; আবার প্রকাশ্য যুক্তি প্রয়োগ গণতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সুতরাং গণতন্ত্র ও ন্যায্যতার পরস্পরিক সংযোগ খুবই গভীর।"[৬৯]

নৈতিক শিক্ষা মানুষকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় এবং প্রজ্ঞা অর্জনে সহায়তা করে। মানুষ যখন প্রজ্ঞাবান হয় তখন সে অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকে। বাংলাদেশকে যদি আমরা একটি আদর্শিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পেতে চাই তাহলে প্রথমত যে বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো নৈতিক শিক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ রাষ্ট্র চালানোর জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে অবশ্যই নীতিবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে যদি সৎ ও ভালো নেতৃত্ব তৈরি করা, আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সৎভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা যায় তবে মানুষ গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে পারবে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, অপরাধ প্রতিরোধের সাথে সাথে রাষ্ট্রের দক্ষ জনশক্তিকে নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ মানুষে পরিণত করতে হবে, যা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এজন্যই জন ডিউই তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন নৈতিক শিক্ষাকে। আর গণতন্ত্রের

মাধ্যমেই আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকার যথার্থ অর্থে পেতে পারি। গণতন্ত্রের অপব্যবহারের জন্য দায়ী মানুষ। সে-কারণেই গণতন্ত্রের সাথে নৈতিকতাকে সমুন্নত রেখে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে পারলে আমরা একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র আশা করতে পারি।

## তথ্যনির্দেশ


১. লেসলি লিপসন, *গণতান্ত্রিক সভ্যতা*, আবুল বাশার (অনূ.), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৪৬।

২. I. Berlin, *Four Essays on Liberty, 'Two Concepts of Liberty*,' Oxford University Press, Oxford, 1979, p. 31.

৩. *Loc. cit*.

৪. H. J. Laski, *A Grammar of Politics*, Subject Publications, 7th Indian Reprint , Delhi, 2012, p. 142.

৫. এ. ডি. লিন্ডসে, *আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র*, মুহম্মদ আয়েশ উদ্দিন (অনূ.), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৮।

৬. R. M. MacIver, *The Modern State*, Oxford Univerity Press, Oxford, 1960, p. 40.

৭. H. J. Laski, *A Grammar of Politics*, Delhi, 2012, p. 30.

৮. I. Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals,* T. K. Abbott (trans.), London, 1949, p. 46.

৯. *Ibid*, 83.

১০. J. S. Mill, *On Liberty*, Glasgow, Fontana, 1859, p.116.

১১. হ্যারল্ড লাস্কি, *রাজনীতির গোড়ার কথা*, এম. এ. ওয়াদুদ ভূঁইয়া (অনূ.), প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১৫২।

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২।

১৩. বার্ট্রান্ড রাসেল, *রাজনৈতিক আদর্শ*, আবুল কাসেম ফজলুল হক (অনূ.), জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ২৬।

১৪. H. J. Laski, *A Grammar of Politics*, p. 152.

১৫. *Ibid*, P. 153.

১৬. *Ibid*, P. 154.

১৭. Engels, *Principles of Communism, Marx-Engels – Selected Works*, vol.1, pp. 81-97.

১৮. হ্যারল্ড লাস্কি, *রাজনীতির গোড়ার কথা*, এম. এ. ওয়াদুদ ভূঁইয়া (অনূ.), প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১৫৭।

১৯. *The New Encyclopedia Britannica*, founded 1968, 15th edition, printed in USA, vol. 5, p. 200.

২০. G. Alan, *Human Right: Essays on Justification and Application*, Chicago University Press, USA, 1982, p. 1.

২১. R. L. Barker, *The Social Work Dictionary*, NASW Press, Washington, 1995, p. 173.

২২. খিষ্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিসের ব্যক্তিত্ব, সাহচর্য ও মূল্যবান শিক্ষা প্লেটোকে দিয়েছে নতুন পথ ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি যা তাঁকে এক নতুন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি তাঁর ডায়লগের মধ্যে সক্রেটিসকে তুলে ধরেন। ডায়লগের শ্রেষ্ঠ অংশ 'রিপাবলিক'-এ সক্রেটিসের মুখ দিয়েই প্লেটো তাঁর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন। এখানে অধিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, মনোবিদ্যার ধারণা যেমন পাই, তেমনি পাই তাঁর শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি এবং শিল্পতত্ত্বের ধারণা। সক্রেটিস বলেছিলেন, 'জ্ঞানেই ধর্ম, জ্ঞানেই মুক্তি'। তার ভিত্তিতে প্লেটোও মনে করেন, রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা অজ্ঞদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যতক্ষণ না দার্শনিক অর্থাৎ জ্ঞানীর হাতে ন্যস্ত হবে, ততক্ষণ মানুষের মুক্তি নেই। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে তিনি মারা যান।

২৩. এরিস্টটল খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানের সব বিভাগেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ভালো নাগরিক তৈরি করা। নীতিতে ও ধর্মে উন্নত করে নাগরিকদের জীবনের পূর্ণতাসাধন করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রজ্ঞা আমাদের শুভ জীবনের সন্ধান দিতে পারেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২৪. লক আধুনিক যুগের চিরায়ত রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের মধ্যে অন্যতম। রাজনৈতিক চিন্তার বাইরে তিনি বস্তুবাদী দার্শনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে *Two Treatise of Goverment, Eassy Concerning Human Understanding, Thoughts Concerning Education* উল্লেযোগ্য। গণতন্ত্র ও উদারতাবাদ বিকাশে লকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২৫. জন লক, *নির্বাচিত দার্শনিক রচনাবলি*, খণ্ড ২, মস্কো, ১৯৬০, পৃ. ১৯।

২৬. টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪) ছিলেন মধ্যযুগের দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কেবল একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিই নয়, তিনি প্লেটো, এরিস্টটল, কান্ট ও হেগেলের মতো একজন প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরিস্টটলকে অনুসরণ করেন। রেনেসাঁ পর্যন্ত একুইনাসের দর্শনের প্রভাব ছিল। তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো *Summa Contra Gentiles*।

২৭. অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, *রাষ্ট্রতত্ত্বে মানবাধিকার*, ইয়াসিন খান (সম্পাদিত), 'মানব অধিকার: নানাদিক', প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৪।

২৮. M. Cransto, *What are Human Rights*? Bodley Head, London, 1973, p. 9-17.

২৯. দৃষ্টবাদীরা মনে করেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমানায় অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা যে প্রশ্নগুলির সমাধান পাওয়া যায়নি, সেগুলো চিরতরে অমীমাংসিত। ঊনবিংশ শতকের প্রত্যক্ষবাদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাফল্য বিষয়ে আশাবাদী ছিল। অগাস্ট কোঁৎ, জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। তবে কোঁৎ-এর সাথে তাঁদের মতের সামান্য পার্থক্য ছিল।

৩০. Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals*, T. K. Abbott (trans.), London, 1949, p. 114.

৩১. বার্ট্রান্ড রাসেল, *ক্ষমতা*, আরশাদ আজিজ (অনূ.), অবসর, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৮৮।

৩২. জ্যাঁ-জ্যাক রুশো, *সোশ্যাল কন্ট্র্যাক্ট*, সরদার ফজলুল করিম (অনুবাদ), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮ পৃ. ৮৫।

৩৩. James Bryce, *Modern Democracies,* The Macmillian, New York, 1921,Vol-1 P. 113.

৩৪. জ্যাঁ-জ্যাক রুশো, *সোশ্যাল কন্ট্র্যাক্ট*, সরদার ফজলুল করিম (অনুবাদ), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৩৭।

৩৫. মোহিত ভট্টাচার্য এবং বিশ্বনাথ ঘোষ, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, দি ওয়াল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫৭৯।

৩৬. জন স্টুয়ার্ট মিল, *প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার*, দরবেশ আলী খান (অনু.), নালন্দা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭।

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

৩৮. আর. এম. ম্যাকাইভার, *আধুনিক রাষ্ট্র*, এমাজউদ্দিন আহমেদ (অনূ.), সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৪৩।

৩৯. বদিউল আলম মজুমদার, *গণতন্ত্র নির্বাচন ও সুশাসন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৭১।

৪০. প্লেটো, *আইন-কানুন*, আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া (অনূ.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা: ২০১৩, পৃ. ২১৫।

৪১. আনু মুহাম্মদ, *প্রথম আলো*, *উন্নয়ন ও সুশাসন আলাদা কিছু নয়*, ২১ নভেম্বর, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১১।

৪২. এরিস্টটল, *পলিটিক্স*, সরকার ফজলুল করিম (অনূ.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ.২৫।

৪৩. F.M. Cornforth, *The Republic of Plato,* Oxford University Press, New York, 1967 p. 176.

৪৪. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.) , *প্লেটোর রিপাবলিক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮০।

৪৫. ডব্লু. টি. স্টেস, *গ্রিক দর্শনের ইতিহাস*, রশিদুল আলম (অনূ.), নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৫৩।

৪৬. T. More, *Utopia*, R. Robinson (trans.), David Cambell Publishers, London, 1992, p. 57.

৪৭. G. Kateb, '*Utopias and Utopianism*,' P. Edwards (ed), New York, Atherton Press, vol. 8, p. 215.

৪৮. হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২০৭।

৪৯. Ernest Barker (trans.), *The Politics of Aristotle*, Oxford University Press, Oxford, 1946, p. 281.

৫০. C. Beasly, *What is Feminism* , Sage, New Delhi, 1999, p. 21.

৫১. স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন, *পলিটিক্যাল অর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটিজ*, ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (অনূ.), অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৩।

৫২. সুদর্শন বড়ুয়া, *প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক*, তৃতীয় খন্ড, ধর্মরাজিক বৌদ্ধমহাবিহার, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪৪।

৫৩. G.C. Dev, *Buddha the Humanist*, Paramount Publishers, Dacca Karachi Lahore, 1967, P. 99.

৫৪. গৌতম বুদ্ধ জীবনের সব স্তরে দুঃখ উপলব্ধি করেন। দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে তার জন্য তিনি আটটি দুঃখ নিবৃত্তির পথের কথা বলেন। এই আটটি পথকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। এগুলো হলো: ১.

সম্যক দৃষ্টি ২. সম্যক সংকল্প ৩. সম্যক বদ্ধ ৪. সম্যক কর্মান্ত ৫. সম্যক আজীব ৬. সম্যক ব্যায়াম ৭. সম্যক স্মৃতি ৮. সম্যক সমাধি।

৫৫. কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রিষ্টপূর্ব) চীনা দার্শনিক। তিনি মূল্যবোধ বিবর্জিত জ্ঞানকে জ্ঞান বলে স্বীকার করেননি। ক্ষমতার উত্থান-পতনের তত্ত্ব অনুসারে তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র সম্মতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সরকার স্থায়ীত্ব এবং শক্তিমান রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারে। তিনি মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের ওপর গুরুত্ব দেন।

৫৬. আবদুল জলিল মিয়া, 'সমাজ, রাজনীতি ও নৈতিকতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ', *দর্শন ও প্রগতি*, দেব গবেষণা কেন্দ্র, ১৩শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬ (জুন-ডিসেম্বর)), পৃ. ৪০।

৫৭. *প্রাগুক্ত*, ৪০।

৫৮. শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, *হেগেলের দার্শনিক মতবাদ ও মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫০।

৫৯. D. H. Bhandari and R.R. Sethi, *Studies in Plato and Aristotle*, S. Chand and Company (Pvt.) Ltd. p. 206.

৬০. জন রলস সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্রদার্শনিক। তিনি ন্যায় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি মনে করেন ন্যায়বিচার হলো সুবিচার। ন্যায়বিচার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি হবস, লক ও রুশো প্রদত্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদ গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন সমাজের বৈষম্যগুলো স্বীকার করে সমান সুযোগগুলো সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো ন্যায়বিচার। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো *A Theory of Justice*।

৬১. জন রলস, *সামাজিক ন্যায়বিচার*, এ. এস. এম. আবদুল খালেক (অনূ.), নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ৪২।

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

৬৩. *লেভিয়াথান* টমাস হব্‌স কর্তৃক লিখিত একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে হব্‌স সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রশ্নে হবস রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের তত্ত্বকে নাকচ করে সামাজিক চুক্তির তত্ত্বকে সমর্থন করেন। এ গ্রন্থে তিনি একচ্ছত্র শাসন সমর্থন করলেও ব্যক্তির জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বিদ্রোহের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেননি।

৬৪. W. Ebenstein, *Great Political Thinkers*, IBIT Publishing Company, Oxford, 1966, p. 370.

৬৬. J. Locke, *The Second Treatise of Government*, T.P. Peardon (ed.), Bobbs-Merrill, New York 1952, p. 4.

৬৭. J. Adams, *Democracy and Social Ethics, Havard University Press*, New York, 1913 p. 221.

৬৮. এ. পি. জে. আবদুল কালাম, *টার্নিং পয়েন্টস*, মনোজিৎকুমার দাস (অনূ.) ,অন্যধারা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮৪।

৬৯. অমর্ত্য সেন, *নীতি ও ন্যায্যতা*, অনির্বার্ণ চট্টোপাধ্যায় ও কুমার রানা (অনূ.) আনন্দ, কলকাতা, ৩৬৫।

তৃতীয় অধ্যায়

# উদারনৈতিক গণতন্ত্র বনাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

## ৩.১ ভূমিকা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান দুটি রূপ রয়েছেঃ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। উভয় রূপেই জনগণের সম্মতি প্রকাশের সুযোগ থাকে। তাই এ ব্যবস্থাকে সম্মতির ভিত্তিতে শাসন[১] বলা যায়। এখানে সকলে সমান রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী। ফলে এখানে কেউ উপেক্ষিত হয় না। অর্থাৎ গণতন্ত্র এমন ব্যবস্থা যেখানে জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতা বা কতৃত্বের অধিকারী। এখানে জনগণ তাদের সম্মতি ও মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠন করে এবং কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

## ৩.২ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

যে শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে সেটা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। প্রাচীন গ্রিসের নাগরিকগণ নগরের শাসনকার্যে সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করত। গ্রিস ও রোমে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বিশেষ স্থানে সমবেত হয়ে আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ব্যয় নির্ধারণ, সরকারি কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করত। প্রাচীন গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আধুনিককালে রাষ্ট্রসমূহের বিশাল আয়তন, অধিক জনসংখ্যা ও জটিল প্রকৃতির নানাবিধ সমস্যার কারণে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কঠিন হয়ে পড়ায় পরোক্ষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে বর্তমানেও সুইজারল্যান্ডের ক্যাটন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি শহরে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু আছে। কিন্তু , ঐসব অঞ্চলকে 'রাষ্ট্র' বলা যাবে না। কেননা তাদের সার্বভৌমত্ব নেই। এগুলো একটি রাষ্ট্রের অংশবিশেষ মাত্র।[২]

## ৩.৩ পরোক্ষ গণতন্ত্র

পরোক্ষ গণতন্ত্র হলো গণতন্ত্রের আধুনিক রূপ। প্রাচীনকালে গণতন্ত্রকে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকার করা হলেও আধুনিককালে এসে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। এখন গণতন্ত্রকে শুধু লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যার্জনের

একটি উপায় মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে শ্যমপিটার বলেন, গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি, অর্থাৎ এক বিশেষ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা যেখানে রাজনৈতিক, আইনি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩] এ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিনিধি নির্বাচন। এ সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তবে তারা তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। পরোক্ষ গণতন্ত্রের অপর নাম প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোই শাসক ও শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে-দলই শাসনকার্য পরিচালনা করে। বিরোধী দল সংখ্যালঘু হিসেবে সরকারি কার্যকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করে। বিরোধী দলের সদা সতর্ক দৃষ্টি ও সমালোচনার জন্য সরকার খেয়ালখুশিমত আচরণ করতে পারে না। এ কারণে স্বৈরাচারের উদ্ভব হয় না। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। বিরোধী দলের অভাবে রাষ্ট্র অস্থিতিশীল এবং সরকার অনমনীয়, অনুভূতিহীন ও কতৃত্ববাদী হয়ে ওঠে।[৪] প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সাধারণ নাগরিক সরাসরি প্রশাসনে ও নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে না, প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অংশ নিয়ে প্রশাসনে কাজ ও নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিনিধিত্বমূলক বা অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের ইচ্ছা সরাসরি জনগণ দ্বারা প্রণয়ন এবং ব্যক্ত করা হয় না, তা হয় প্রতিনিধিদের দ্বারা, যাদের ওপর তারা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করে।[৫] এখানে জনগণের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রবিন্দু বিধায় একে প্রতিনিধিত্ব মডেল বলা হয়। এ ব্যবস্থায় আমরা তিনটি স্তর দেখতে পাই। সর্বোচ্চ স্তরে থাকে মন্ত্রীসভা, দ্বিতীয় স্তরে থাকে আইনসভা বা সাংসদ এবং সর্বশেষ স্তরে থাকে নাগরিক বা ভোটার। এখানে তৃতীয় স্তরকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। কারণ ভোটারদের পছন্দের লোক নিয়ে আইনসভা গঠিত হয়। চূড়ান্তভাবে ভোটাররাই নির্ধারণ করে দেয় কারা তাদের শাসন করবে, যে কারণে গণতান্ত্রিক শাসনে ভোটারগণের মূল্য বেশি।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক মডেল রয়েছে। তবে প্রধানত দুই প্রকার শাসনব্যবস্থাই বেশি পরিলক্ষিত হয়। যথা: (১) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং (২) ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায় তাতে শাসনব্যবস্থার বিভাজনটি প্রধান। একদিকে থাকেন রাষ্ট্রপতি, অন্যদিকে থাকে কংগ্রেস বা আইনসভা। উভয়েই জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তবে নির্বাচিত পদ্ধতি ও কার্যকাল এক নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্বাচন সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন। অপরপক্ষে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ প্রতিনিধি সভার সদস্যগণ জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। উচ্চকক্ষের গঠন পদ্ধতি আলাদা। তবে সিনেটর

সদস্যগণকে নির্বাচিত হতে হয়। এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার বিশেষত্ব হলো আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ স্বাধীনভাবে সংবিধান অনুযায়ী নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

অন্যদিকে ব্রিটিশ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার-ব্যবস্থায় প্রশাসনে তিনটি স্তর থাকলেও কাজ করে দুটি স্তর। প্রথমটি হলো মন্ত্রীসভা ও দ্বিতীয়টি আইনসভা। রানি বা রাজা সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করেন। কিন্তু দৈনন্দিন বা চূড়ান্ত স্তরে নীতি নির্ধারণে রাজা বা রানির কোনো ভূমিকা নেই। রাজা বা রানি হলেন আড়ম্বরপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। ব্রিটেনে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ এক জায়গায় মিশে গিয়েছে এবং ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুযায়ী কেউ পুরো স্বাতন্ত্র্য ভোগের সুযোগ পায় না। আইনসভা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সে-কারণে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সিদ্ধান্ত আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কেননা আইনসভা জনগণের নিকট দায়বদ্ধ। আর ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের রূপটি ব্রিটিশ ও মার্কিন মডেলের সংমিশ্রণে তৈরি। মডেলেটির একটি বিশেষ দিক হলো এর দায়বদ্ধতা। যেহেতু এখানে নাগরিকগণ সরাসরি শাসনকাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায় না, সে-কারণে যাদেরকে তারা তাদের হয়ে কাজ করতে পাঠাচ্ছে তারা দায়বদ্ধ থাকবে। সংসদ সদস্য থাকাকালীন তারা যা কিছু করে তা তারা সাধারণ জনগণের নিকট ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার আগে নির্বাচন হয়। সেখানে পূর্বের সদস্য নির্বাচিত হতে নাও পারেন। আবার সমস্ত প্রতিনিধিকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় না বিধায় মন্ত্রীসভার সদস্যগণ আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। আইনসভার সদস্যদের প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, সমালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে দায়বদ্ধতার নীতিটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত উপায় হলো অনাস্থা প্রস্তাব এনে মন্ত্রীসভার অপসারণ ঘটানো। তবে এ দায়বদ্ধতা ব্রিটেন ও আমেরিকায় এরকম দেখা যায় না। ব্রিটিশ পদ্ধতি হলো মন্ত্রীসভার সমালোচনা করা, প্রয়োজনে অপসারিত করা। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কোনোভাবেই আইনসভার সমালোচনার প্রেক্ষিতে পদত্যাগ করেন না। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট অন্যায় কাজ করলে তাঁকে অভিশংসনের সাহায্যে অপসারিত করা যায়।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগ সবসময় জনগণের অনুকূলে কাজ করে থাকে। একে এমন একটি সরকার ব্যবস্থা বলা হয় যেখানে সরকার পরিচালনার ক্ষমতা আপেক্ষিকভাবে ছোট ও নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তির ওপর অর্পিত হয়। এখানে প্রতিনিধিরা যাতে স্বেচ্ছাচারিতা করতে না পারেন সেজন্য কতকগুলো বাস্তবমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়; যেমন গণনির্দেশ, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতি ও গণভোট। গণনির্দেশ হলো জনগণের রায়। সরকার দেশের আইন ও সংবিধান সম্পর্কিত কোনো পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে জনগণের মতামত জানতে ও গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে গণরায় বা গণনির্দেশের ভিত্তিতে প্রয়োজনে সাংবিধানিক কোনো আইনের সংশোধন বা সংযোজন করা হয়। সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের কোনো আইন

পরিবর্তন করতে হলে গণনির্দেশ গ্রহণ করা অপরিহার্য। এছাড়াও ইউরোপীয় অনেক দেশে গণনির্দেশের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। তাদের পদচ্যুত করার জন্য লিখিত অভিযোগ জানাতে পারে। এ অভিযোগ যদি দেশের অধিকাংশ জনগণ সমর্থন করে তবে ক্ষমতাসীন শাসক বা সরকারি কর্মচারীর পদচ্যুতি ঘটবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিরুদ্ধে গণরায়ের ফলে তাকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। গণভোট বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনমত গ্রহণের একটি প্রচলিত পদ্ধতি। অনেক সময় অবৈধ ক্ষমতা দখল করে সরকার বৈধতা লাভের জন্য তাড়াহুড়া করে গণভোট আহ্বান করে। আবার সরকারের স্বরূপ পরিবর্তনের জন্যও অনেক সময় গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি গণভোটের ফলাফল হিসেবে ২০১৬ সালে ব্রিটেন ইইউ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কোনো রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয়বারের মতো গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এভাবে প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থায় জনগণ অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন থাকে। তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা, অধিকারবোধ, কর্তব্যবোধ এবং সর্বোপরি আত্মোপলব্ধি জাগ্রত হয়। গণউদ্যোগ তৈরি হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম দুটি রূপ হলো: উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

### ৩.৪ উদারনৈতিক গণতন্ত্র

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব দেশেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। অতি সাম্প্রতিককালে (১৯৯০ সালের পরবর্তীকাল থেকে) এ ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা রূপে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই স্বীকৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ভারত, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। বুর্জোয়া গণতন্ত্র[৬] থেকেই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব। পাশ্চাত্যে শিল্পবিপ্লবের আগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা বুর্জোয়া গণতন্ত্র। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমি মালিকেরাই সমাজের কর্তৃত্বে ছিল। জনগণের অধিকার বলে বস্তুত কিছুই ছিল না। স্বাধীনতা ও সাম্য ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লব অথবা ফরাসি বিপ্লবের অব্যবহিত পরেও যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাকেও বুর্জোয়া গণতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করা হয়।[৭] শিল্প বিপ্লব অথবা ফরাসি বিপ্লবের অব্যবহিত পরিণাম অতি শোচনীয় রূপে দেখা যায়। এ সময় দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারিত পুঁজিপতিরা জনগণকে শোষণ ও নিপীড়ন করে অধিকতর বিত্তবান হয় এবং বিত্ত ও পদমর্যাদার প্রভাবে দেশের শাসনব্যবস্থাকে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রয়োগ করে এবং জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়।

পুঁজিপতিদের নীতিহীন আগ্রাসী বাণিজ্যিক মনোভাব, নারীদের পণ্যরূপে ব্যবহার হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় চরম নৈরাজ্যজনক অবস্থা লক্ষ করে ফ্রান্সের শাঁ-সিমো[৮], চার্লস ফুরিয়ে[৯] এবং ইংল্যান্ডের রবার্ট ওয়েন[১০], সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনের সংবিধানই সর্বপ্রথম উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সংবিধানরূপে চিহ্নিত হয়। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, জার্মানি, ভারত, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, ইসরাইল, জিম্বাবুয়ে প্রভৃতি দেশে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রসারিত হয়। এ শাসনব্যবস্থার মূল প্রবক্তা হলেন লক, বেন্থাম, মিল, অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ চিন্তাবিদ।

জনসাধারণের অধিকার, স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের উদার মনোভাব এবং অহেতুক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা থেকে নিজেকে বিরত থাকা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে গুটম্যান বলেন, "উদারনৈতিক গণতন্ত্র বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, ভারসাম্য, ক্ষমতা পৃথকীকরণের জন্য অধিকতর নীতিনিষ্ঠ ক্ষেত্র তৈরি করে।"[১১] সমাজের মধ্যে অনেক সমিতি, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলো নানাভাবে নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত করে। এ সমস্ত সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করে সরকার ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের কথা ভাবতে পারে না। রাষ্ট্রের নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের কতগুলো অধিকার আছে, যেগুলো সংরক্ষণ করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার যা খুশি তা করতে পারে না। সরকারের কর্তৃত্বকে সীমিতকরণ এবং একে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সুনির্দিষ্ট অধিকারের রক্ষাকবচ বলে অভিহিত করা যেতে পারে, যা তাদের চারপাশে এক ধরনের চক্রাকার বেষ্টনী তৈরি করে।[১২] উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকের স্বার্থ ও মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে সংঘ ও সমিতি গড়ে উঠবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র বাধা দেবে না। জাতীয় স্বার্থের কথা রাষ্ট্রকে ভাবতে হবে। রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট মূল্যবোধ বা নৈতিকতার প্রতীক হবে না। নৈতিকতা ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। ব্যক্তি তার নিজের বিবেক অনুযায়ী চলবে এবং রাষ্ট্র বাধা দিবে না। ধর্ম বা অন্য যে-কোনো বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের অধিকার ব্যক্তির থাকবে। রাষ্ট্রের এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হলে রাষ্ট্র সহনশীল হয়ে উঠবে। হিতবাদী ধারণাও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে জড়িত। এ ধারণার মূল রূপকার হলেন জেরেমী বেন্থাম। তিনি রাষ্ট্রকে সকল অধিকারের উৎস বলেছেন। সকলের ভরসার স্থান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য "সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ।"[১৩] বেন্থামের হিতবাদী দর্শনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক উদারনীতিবাদ। এ ধারাকে বিকশিত করেন ডেভিড রিকার্ডো, জেমস মিল, জন অস্টিন, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ চিন্তাবিদ।

বেন্থাম মনে করেন, রাষ্ট্র যদি ভুল করে, অন্যায় করে তাহলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করার নৈতিক অধিকার জনগণের রয়েছে। তিনি প্রচলিত ব্রিটিশ শাসন ও আইন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার দাবি করেন। তিনি মনে করেন উপযোগিতার নীতিকে বিঘ্নিত করে রাষ্ট্রীয় আইন দণ্ড-বিধানের ব্যবস্থা করবে না। দুঃখ দেয়া দণ্ডদানের লক্ষ্য ঠিকই, কিন্তু মাত্রারিক্ত দণ্ডবিধান সুখের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই জনগণের কাছে আইনের উদ্দেশ্য সহজ ও সরলভাবে উপস্থিত করাই কাম্য। ব্যক্তির উপযোগের মাপকাঠিতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারই উত্তম। বেন্থাম মনে করেন ব্যক্তির সুখ ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করাই গণতান্ত্রিক শাসনের লক্ষ্য। মার্কিন বা ফরাসি চিন্তা বেন্থামকে আকর্ষণ করলেও স্বাভাবিক অধিকারের যে ধারণা উভয় দেশের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁর মতে তা ভ্রান্ত, অমূলক। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে মানুষ জন্ম থেকেই স্বাধীন বা সমান নয়। স্বাধীনতায় নয়, মানুষের উপযোগিতার মূল্যেই বিচার হবে তার অধিকারের তাৎপর্য। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান কাজ হলো নাগরিককে সরাসরি ক্ষমতার স্বৈচারাচিতা থেকে সুরক্ষা দান করা।

উনিশ শতকে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের পরিশীলিত প্রকাশ ঘটেছে জন স্টুয়ার্ট মিলের চিন্তায়। তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক মত উপস্থাপন করেন। তিনি ব্যক্তির মতামত প্রকাশ ও আচরণের স্বাধীনতার এক শক্তিশালী প্রবক্তা। মিল বিশ্বাস করেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের শরীর ও মনের ওপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। মানবিক বৃত্তির প্রতিটি দিক অর্থাৎ উপলব্ধি, বিচারবুদ্ধি, চিন্তার বৈচিত্র্য, মানসিক তৎপরতা, নৈতিক পছন্দ সবকিছুই ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির নিজের পছন্দ-পরিকল্পনার ওপরই নির্ভর করে কীভাবে তার বৃত্তিকে সে কাজে লাগাবে। ব্যক্তি তার পর্যবেক্ষণকে ব্যবহার করবে প্রত্যক্ষ করতে, যুক্তি বা বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগাবে পূর্ব অনুমানের জন্য, সক্রিয়তাকে ব্যবহার করবে উপকরণ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে, ভালমন্দ বিচার করবে সিদ্ধান্ত নিতে এবং দৃঢ়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করবে তার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে। মিল মনে করেন যে, মানুষের সৃষ্টিকর্মে মানুষ নিজেই সবচেয়ে ভালো সৃষ্টি, মানুষ যা করে যন্ত্রের দ্বারা তা সম্পন্ন হলেও যন্ত্র মানুষের বিকল্প নয়। মানবিক প্রকৃতি তার নিজ বৈশিষ্ট্যে মহান। মিল বলেন, মানব প্রকৃতি কোনো মডেলের অনুকরণে এবং অর্পিত আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের জন্য তৈরি কোনো যন্ত্র নয়, বরং স্বাধীন প্রক্রিয়া যা অভ্যন্তরীণ শক্তির মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বিকশিত করে তোলে।[১৪] তিনি ব্যক্তির কাজকে আত্মকেন্দ্রিক ও পরার্থকেন্দ্রিক বলে উল্লেখ করেন। ব্যক্তির পরার্থকেন্দ্রিক কাজের ফলাফল ও প্রভাব অন্যের ওপর পড়ে। সে-ধরনের কাজের ক্ষেত্রে মিল সীমিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক কাজের ফল অন্যের ওপর বর্তায় না। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রকার রাষ্ট্রীয় ও সরকারি হস্তক্ষেপের বিপক্ষে। তিনি মনে করেন, এ

ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এছাড়া উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে মিলের অবদান হলো কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা এবং গণতন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা।[১৫]

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে উদারনৈতিক দর্শনচিন্তা ও ভাবধারার সামাঞ্জস্য প্রতিপন্ন হয়। এ মতবাদ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উদারনৈতিক দর্শনের বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। এর দুটি রাজনৈতিক মূলনীতি হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা। সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উদারনৈতিক গণতন্ত্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে তা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 'শাসিতের সম্মতি'র দ্বারা বৈধতা অর্জন করে। তাছাড়া ক্ষমতার লক্ষ্য হলো জনসাধারণের মঙ্গল। ক্ষমতাকে অবশ্যই নির্ধারিত লক্ষ্যকেন্দ্রিক এবং আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হয়। সীমিত সরকারের ধারণা কার্যত উদারতাবাদের গুরুত্বপূর্ণ দিক। আইনের শাসন, ক্ষমতা পৃথকীকরণ, সাংবিধানিকতা, সিভিল লিবার্টির ওপর গুরুত্ব দেয়া—এ সবই উদারতাবাদের রাজনৈতিক উপাদান।[১৬]

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সাম্যকে যতটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয়, অর্থনৈতিক সাম্যকে ততটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয় না। কারণ বাজারনীতি প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি ভোটদানের অধিকার স্বীকার করা হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয় এবং জনসাধারণকেই যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতায় একমাত্র উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের জন্য সম্পত্তি, শিক্ষা, বৃত্তি নির্বাচন, ধর্মাচারণ করা ইত্যাদির অধিকার স্বীকার করা হয়।

২. এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় 'অবাধ-বাণিজ্যনীতির' পরিবর্তে, 'পরিকল্পিত বাণিজ্যনীতি' গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পিত বাণিজ্যনীতিতে কয়েকটি মাত্র শিল্পকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়; অন্যান্য শিল্পকে বেসরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়।

৩. উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বহুদলীয় শাসনব্যবস্থাকে স্বীকার করা হয়, যেখানে শাসন-ক্ষমতা অধিকারের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অবাধে ও প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা থাকে। নির্বাচনের

মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল অর্থাৎ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারাই ক্ষমতা ভোগের অধিকার অর্জন করে।

৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে প্রত্যেকের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের পথ উন্মুক্ত থাকে। যে-কোনো নাগরিক এখানে নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতা ভোগ করতে পারে।

৫. উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সরকারের নির্ধারিত মেয়াদ শেষে, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শাসনব্যবস্থা জনমত বিরোধী হলে ভোটের মাধ্যমে জনগণ নির্বাচিত সরকারকে অপসারিত করতে পারে।

৬. এ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা স্বীকৃত। সরকারি ক্ষতিকর নীতির বিরোধিতা করার অথবা সমালোচনা করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ জন্য সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা হয়, যাতে ঐসব মাধ্যমগুলো নিরপেক্ষভাবে সরকারের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করতে পারে।

৭. উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আদালতকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাখা হয়। সরকারের আইনসভা প্রণীত কোনো আইন অথবা শাসন বিভাগের কোনো কার্যক্রম নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে আঘাত করলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই অধিকারকে সুরক্ষিত করে।

৮. এ ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুর স্বার্থ ও অধিকারের বিষয়টি তদারকি করার জন্য বহুবিধ প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়।

৯. এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ অধিকার যাতে অন্যায়ভাবে কেউ খর্ব করতে না পারে সে-বিষয়ে লক্ষ রাখা হয়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সৌন্দর্য নির্ভর করে সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকারের সহাবস্থানের ওপর। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমিত করা হয়। রাষ্ট্রের ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের হাতে না রেখে ব্যক্তির হাতে অর্পিত হলেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও বেশি সুদৃঢ় করা যায়।

### ৩.৫ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিবাদ হিসেবে বিশ্বের কয়েকটি দেশে যেমন উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়, তেমনি কয়েকটি দেশ, যেমন, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলত কার্ল মার্কস ও লেনিনের মতবাদের ওপর নির্ভরশীল। এ ব্যবস্থার মূলে রয়েছে মার্ক্সের তত্ত্ব এবং লেনিন কর্তৃক সেই তত্ত্বের প্রয়োগ। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করে সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে, বুর্জোয়াদের শাসনক্ষমতা থেকে অপসারিত করে প্রলেতারিয়েত শ্রেণিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস যে আদর্শ শাসনব্যবস্থার কথা বলেন তা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নয়, তা হলো এক শ্রেণিহীন, শোষণহীন, রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থা। শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব হলো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।[১৭] সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলো সর্বজনীন রাষ্ট্র। তাতে প্রকাশ পায় শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার অভিপ্রায় আর রক্ষা করা হয় তাদের স্বার্থ।[১৮]সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংগঠন ও ক্রিয়াকলাপ চলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসারে। এ নীতির অর্থ নিচু থেকে ওপর পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠিত হবে নির্বাচনের ভিত্তিতে, তারা জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে, ঊর্ধ্বতন সংস্থার সিদ্ধান্ত নিম্নতনের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এ নীতিতে মিলিত হয়েছে কেন্দ্রিকতা—একক পরিচালনার সঙ্গে গণতন্ত্র—জনগণের উদ্যোগশীলতা ও সক্রিয়তা।[১৯]

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে একটি সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় সমাজিকভাবে ও সমন্বিতভাবে। সম্পদ অর্জিত হয় সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে, সার্বিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক দিক থেকে গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা।[২০] অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হলো এমন একটি রাজনৈতিক আদর্শ, যা গণতান্ত্রিক রাজনীতির সমর্থনের সাথে সাথে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানার কথা বলে। এটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে সকল প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়। সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এঙ্গেলসের মতে, নতুন সমাজ গড়তে প্রলেতারিয়েত সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ও তার বাঁচার ব্যবস্থা করতে না পারলে শ্রমিক শ্রেণির কাছে গণতন্ত্রের কোনো মূল্য নেই। তিনি বলেন, কমিউনিজমের ওপর সংগঠিত সমাজ সর্বতোমুখী ক্ষমতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগের ব্যবস্থা করবে।[২১] এ কর্মসূচি হলো কম সুবিধাভোগীদের জন্য বেশি সুযোগ; জন্মগত অসাম্যের অবসান; সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি; নারী-পুরুষ, ধর্ম, বংশ সামাজিক শ্রেণিভেদে বৈষম্যের অপসারণ; সমগ্র সমাজের স্বার্থে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ; পীড়িত, বেকার ও বার্ধক্যের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা; নগর ও শহরের নতুন পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন; প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের উন্নতি, প্রতিযোগিতা ও মুনাফাভিত্তিক সমাজের পরিবর্তে সহযোগিতার এক সমাজ গড়ে তোলা। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বুর্জোয়াদের শাসনক্ষমতা থেকে সরিয়ে প্রোলেতারিয়েত সেই ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে মার্কসের তত্ত্বকে প্রয়োগ করে লেলিন যে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার পত্তন করেন তা হলো সাম্যবাদী সমাজ পত্তনের পথে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় প্রলেতারিয়েত শ্রেণি শাসন-পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এখানে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি মাত্র শ্রেণি থাকায় শ্রেণিশোষণ থাকে না। ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় সমাজের সব সম্পত্তির মালিক হয় সর্বহারা শ্রেণি। সমাজের সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় এ ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কোনো অনিশ্চয়তাবোধ থাকে না।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র শব্দটি মাঝে মাঝে সমাজতন্ত্রের সাথে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে যারা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেন তারা মূলত গণতান্ত্রিক বিশেষণটি ব্যবহার করেন লেনিনবাদী, স্ট্যালিনবাদী এবং মাওবাদী ধরনের সমাজতন্ত্র থেকে একে পৃথক করার জন্য। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় বাস্তবে এগুলো অগণতান্ত্রিক প্রকৃতির। 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র' শব্দটি আবার মাঝে মাঝে 'সামাজিক গণতন্ত্র' বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। এ ধারণা বিভ্রান্তিকর, কেননা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানার কথা বলে, সামাজিক গণতন্ত্র যা বলে না।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সোভিয়েত মডেলের কেন্দ্রীভূত সমাজতন্ত্র এবং সামাজিক গণতন্ত্র থেকে আলাদা। সামাজিক গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাজনীতি সমর্থন করে, যে রাজনীতি রাষ্ট্রের জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রের প্রধান শিল্প-কারখানাসমূহের সর্বসাধারণের মালিকানার কথা বলে, কিন্তু আবার রক্ষণশীল এবং উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার কথা জোরের সাথে ঘোষণা করে। সামাজিক গণতন্ত্র মিশ্র অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নিয়ন্ত্রণের কথা বলে এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্র[২২] সমর্থন করে।[২৩] সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পার্থক্য করা হয় বিশ শতকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তার ভিত্তিতে।[২৪] আবার সামাজিক গণতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পার্থক্য হলো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র একটি পদ্ধতিভিত্তিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু সামাজিক গণতন্ত্র তা নয়।[২৫] সামাজিক গণতন্ত্রপন্থীরা কেবল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই পুঁজির মানবিকীকরণের কথা বলেন, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রপন্থীরা পুঁজিবাদকে দেখেন স্বাধীনতা, সমতা ও সংহতির মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহের সাথে বেমানান হিসেবে। তাঁরা মনে করেন, পুঁজিবাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করা যেতে পারে শুধুমাত্র ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক সমাজের পরিবর্তন করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পুঁজিবাদ কখনো যথার্থ অর্থে মানবিকীকরণ করতে

পারবে না। কাজেই এর বিলোপ-সাধন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[২৬] এমন সমাজতন্ত্র হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে যৌথ অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদন উপকরণ, উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন এবং বিনিময় ব্যবস্থার অধীনে সমবণ্টনের নীতি কার্যকর হয়ে শ্রেণিহীন সমাজের দিকে তা ধাবিত হবে এবং প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্য পাবেন, ফলে সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।[২৭]

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিশেষভাবে বিপ্লবাত্মক বা পুনর্গঠনমূলক নয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের একটি অপরটির সাথে মিশে যেতে পারে বা আংশিকভাবে সামাজিক গণতন্ত্রের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে। পুঁজিবাদী পুনর্গঠনের প্রস্তাবনাকে সমর্থনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এ মতবাদ।[২৮] সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কিছু আবার সামাজিক গণতন্ত্রের পুনর্গঠনমূলক পদক্ষেপকে সমর্থন করে, যেগুলো বিদ্যমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক করে তোলে। এর কিছু আবার রাজনৈতিক দিকের বিবেচনায় বিপ্লবাত্মক এবং তারা বুর্জোয়া শ্রেণির বিলোপের মাধ্যমে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের কথা বলে।

১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পর সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিভিন্ন স্তরে এই বিপ্লবের রণকৌশল রচনার প্রশ্নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন মাও সেতুং। মার্কস-এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিগুলোকে অনুসরণ করে লেনিন তাঁর 'ঔপনিবেশিক থিসিসে'[২৯] উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে যে কর্মসূচি ও কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন, চীন বিপ্লবের পটভূমিকায় মাও সেতুং তার একাধিক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন ও চীন বিপ্লবের নিজস্ব প্রয়োজনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গঠন প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব সংযোজন করেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে মাও সেতুং-এর তাত্ত্বিক সংযোজনগুলোর মধ্যে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

চীন বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশল ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৩৭ সালে মাও সেতুং-এর উদ্যোগে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় প্রচেষ্টায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত নির্বাচনের মাধ্যমে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু হয় এবং এ নতুন ব্যবস্থাকে মাও সেতুং নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আখ্যা দেন। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ১৯৪০ সালে তাঁর *On New Democracy*[৩০] রচনায় নয়া গণতন্ত্রের ধারণার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, যেখানে দেখা যায় মাও সেতুং যে নয়া গণতন্ত্রের চিন্তা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, কুয়ামিন্টাং দলের ছত্রছায়ায় চীনে পুঁজিতন্ত্রের যে প্রসার ঘটেছিল, তার বিকল্প একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঐতিহাসিকভাবে চীনে সে-সময় প্রয়োজন ছিল একটি

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, কারণ অপসৃয়মান সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠা তখন শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে চীনের বেশ কয়েকটি শিল্পোন্নত অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণির সংগঠিত উন্মেষও পরিলক্ষিত হয়েছিল। মাও সেতুং-এর উদ্দেশ্য ছিল যুক্তফ্রন্টের পরিচালনায় এ বিপ্লবকে সম্পন্ন করা। কিন্তু এ বিপ্লবের লক্ষ্য হবে পুঁজিবাদকে সুসংহত করা নয়, বরং পুঁজিবাদের বিকল্প একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, যেটি হবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাও সেতুং নয়া কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি নয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি নতুন ধরনের রাষ্ট্রশক্তি গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। এটি ছিল নয়া গণতন্ত্রের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে মাও সেতুং কর্তৃক সৃষ্ট একটি বৈপ্লবিক মতবাদ। লেনিন এ মতবাদের পূর্ব প্রতিনিধি যিনি এর গোড়াপত্তন করেন এবং এ বিষয়ক বিশ্লেষণ প্রদান করেন। যদিও তিনি নয়া গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেননি, তদুপরি তিনি বুর্জোয়াদের দ্বারা সম্পন্ন বিপ্লবের সাথে সাম্যবাদীদের দ্বারা বিপ্লবের পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন। লেনিন বুর্জোয়াদের দ্বারা সাধিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশ্লেষণের সাথে সাথে সাম্যবাদী প্রলেতারিয়েতের দ্বারা সাধিত নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি হাজির করেন। তিনি প্রলেতারিয়েতের কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে অর্জিত গণতন্ত্রকে বলেছেন প্রলেতারীয় গণতন্ত্র। তার কাছে প্রলেতারীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল একে অপরের পরিপূরক। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' থেকে কোনো চীনের প্রাচীরে আলাদা হয়ে নেই।[৩১] তিনি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে লিখেছেন, "বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সারবস্তুর অর্থ মধ্যযুগীয়তা থেকে, ভূমিদাসপ্রথা থেকে, সামন্তবাদ থেকে দেশের সামাজিক সম্পর্কের পরিশুদ্ধি।"[৩২] সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে পড়ে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সম্পর্ক। লেনিন উল্লেখ করেন যে, "রাশিয়ার বিপ্লবের সরাসরি ও আশু কর্তব্যটি ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মধ্যযুগীয়তার অবশেষগুলোর উচ্ছেদ, সেগুলোকে শেষ পর্যন্ত চূর্ণ করা; রাশিয়া থেকে এই বর্বরতা, এই লজ্জা, আমাদের দেশের সমস্ত সংস্কৃতি ও সমস্ত প্রগতির এই প্রচণ্ডতম বাধাটার বিলুপ্তি।"[৩৩]

লেনিনের কাছে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা প্রলেতারীয় বিপ্লবের অর্থই হচ্ছে মধ্যযুগীয়তার সমস্ত জেরগুলো, ভূমিদাস প্রথা ও সামন্তবাদ থেকে নিঃশর্ত পরিপূর্ণ উচ্ছেদ। তৎকালীন রাশিয়ার ভূমিদাসপ্রথার প্রধান অভিব্যক্তি, জের ও অবশেষ বিষয়ে তাঁর মত হলো—রাজতন্ত্র, সম্প্রদায় ব্যবস্থা, ভূমি অধিকার, ভূমি বন্দোবস্ত, নারীদের অবস্থা, ধর্ম, জাতিসত্তার পীড়ন হচ্ছে ভূমিদাসপ্রথার জের।[৩৪] তিনি চেয়েছেন নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এ সমস্ত জেরকে সমূলে উৎখাত করতে। লেনিন গণতান্ত্রিক বিপ্লবে *সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির* দুই রণকৌশল বইতে দেখান, সশস্ত্র অভ্যুত্থান হচ্ছে জারতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের নির্ধারক

উপায়। প্রলেতারিয়েত ও কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা অর্থাৎ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম করতে হবে, আগের বিপ্লবগুলোতে যা হয়েছে সেভাবে বিজয়ী অভ্যুত্থান থেকে বুর্জোয়ার ক্ষমতা স্থাপন চলবে না। অথচ মেনশেভিকরা মনে করত ক্ষমতা নেবে বুর্জোয়ারা। শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য হলো তাদের সমর্থন করা।[৩৫] গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে লেনিন তাঁর এই গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "মার্কসবাদ প্রলেতারিয়েতকে এই শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে দূরে সরে না থাকে, এর প্রতি উদাসীন না হয়, বুর্জোয়াকে যেন বিপ্লবে নেতৃত্ব ছেড়ে না দেয়, বরং তারা যেন এতে খুব প্রবলভাবে অংশগ্রহণ করে, সংগতিপরায়ণ প্রলেতারীয় গণতান্ত্রিকতার জন্য, বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য তারা যেন অতি দৃঢ়তাসহ সংগ্রাম চালায়।"[৩৬]

কাউতস্কির মতো যারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলে প্রচার করেছেন তাদেরকে লেনিন নির্লজ্জ বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি মনে করেন, সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান ও ইতিহাসের বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট যে যতক্ষণ বিভিন্ন শ্রেণি থাকছে ততক্ষণ বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের কথা আমরা বলতে পারি না, বলতে পারি শুধু শ্রেণি গণতন্ত্রের কথা। বিশুদ্ধ গণতন্ত্র হলো উদারনীতিকদের কপট বুলি যার মাধ্যমে তারা শ্রমিকদের বোকা বানাতে চায়। সামন্তবাদের স্থানাধিকারী বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থানাধিকারী প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের কথাই ইতিহাস জানে।[৩৭] লেনিন বলেন, "সুবিধাবাদীরা মনে করত যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতেরা একা নামবে, সহযোগী ছাড়াই। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটতে পারবে কেবল তখনই যখন প্রলেতারিয়েতরা হবে দেশের অধিকাংশ।"[৩৮] এই প্রতিপাদনের ভ্রান্তি, ক্ষতিকর দিক দেখিয়ে দিয়েছিলেন লেনিন। লেনিনবাদী এ ধারণার বিকাশের উদ্দেশ্য হলো পশ্চাদপদ কোনো দেশে, অনুন্নত পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী যে-কোনো দেশেই প্রলেতারিয়েত ও অন্যান্য বিপ্লবী শ্রেণিগুলোর সহায়তায় নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। মাও সেতুং রাজনৈতিক ক্ষমতার শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুনিয়ার বিবিধ ধরনের রাষ্ট্রগুলোকে যে তিন ধরনের একনায়কত্ব বলে অভিহিত করেছিলেন তার শেষটি হচ্ছে 'কয়েকটি বিপ্লবী শ্রেণির একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র' যা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে আবির্ভূত হয়।[৯]

লেনিনের কাছে উল্লেখযোগ্য প্রধান কাজটি ছিল বুর্জোয়াদের দ্বারা সাধিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাথে কমিউনিস্টদের দ্বারা সাধিত নয়া গণতন্ত্রের পার্থক্যরেখা নিরূপণ করা। লেনিন তাঁর *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* গ্রন্থে সেই নয়া গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,

> পুঁজিবাদী সমাজে আমরা পাই কাটাছেঁড়া, হতচ্ছাড়া, জাল করা একটি গণতন্ত্র যা কেবল ধনীদের জন্য, অল্পাংশের জন্য। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, কমিউনিজমে উৎক্রমণের পর্বটাই প্রথমে দেবে শোষকদের ওপর সংখ্যাল্পদের

আবশ্যকীয় দমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের জন্য অধিকাংশের জন্য গণতন্ত্র। কেবল কমিউনিজমই দিতে পারে সত্যাসত্যই পরিপূর্ণ গণতন্ত্র।[৪০]

লেনিনবাদী চিন্তা গণতন্ত্রকে বিকশিত করেছে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রণনীতিগতভাবে লেনিনবাদ শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও তার সহযোগী বিভিন্ন স্তরের জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে। লেনিনবাদ বিপ্লবী শ্রেণিগুলো কর্তৃক শাসক-শোষক শ্রেণিগুলো ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে বলপ্রয়োগ, গৃহযুদ্ধ ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাতের কথা বলে। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অবশ্যই প্রলেতারীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, যা বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে গুণগতভাবে উন্নততর এবং এ বিষয়টি লেনিন *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মাও সেতুং পরবর্তীকালে বলেছেন যে, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকেই। অবশ্য চীনে এটি শুরু হয়েছে ১৯১৯ সালের চতুর্থ মে বিপ্লবের পর থেকেই। তাঁর মতে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলো প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে বিপুল জনসমর্থনের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লব।[৪১]

মাও সেতুং সামন্তবাদী ও আধা-সামন্তবাদী দেশে যে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব দিয়েছেন, সেরকমই লেনিন প্রলেতারীয় তত্ত্ব এনে বিপ্লবের অগ্রগামী শ্রেণি হিসেবে শ্রমিক ও তার সহযোগী শ্রেণিসমূহের হাতে কর্তৃত্ব তুলে দেন। লেনিনবাদের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখল, তার জন্য রণনীতি নির্ধারণ এবং সে-অনুযায়ী কাজ করা, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা, বুর্জোয়া ও শোষক শ্রেণিকে দমন করা, প্রলেতারীয় বিপ্লব সম্পাদন করা, শ্রমিক ও প্রলেতারিয়েতকে মুক্ত করে শিল্পবিপ্লব এগিয়ে নেওয়া। প্রলেতারীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে প্রলেতারীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে।

লেনিনীয় পার্টির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ। ফ্রিডরিক এঙ্গেলস তাঁর 'কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে' লেখায় কতৃত্বকে কেন্দ্রিকতাবাদ অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। এ মতবাদের মূলকথা হলো, আলোচনা হবে বহুমূখী, কিন্তু কাজ হবে ঐক্যবদ্ধ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ বলতে লেনিনবাদী রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত নীতিসমূহকে নির্দেশ করা হয়। মাঝে মাঝে আবার যে-কোনো রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গৃহীত কোনো লেনিনপন্থী নীতিকেও এ অর্থে বিবেচনা করা হয়। এ সাংগঠনিক পদ্ধতির 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয় যে, কোনো নীতি নির্ধারণের পূর্বে দলীয় সকল সদস্যের সে-বিষয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং মতবিনিময় করার অধিকার রয়েছে, আর 'কেন্দ্রিকতাবাদ' দ্বারা বোঝানো হয় যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তখন দলের প্রত্যেক

সদস্যই সে-সিদ্ধান্তটিকে মেনে নেবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ শব্দযুগলকে লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এটি হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং কার্যক্ষেত্রে ঐক্য।[৪২] এঙ্গেলস ও লেনিনের সূত্র ধরে মাও সেতুং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। ফলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ সম্পর্কে লেনিন বলেন:

> কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অবশ্যই হবে কেন্দ্রিকতা ও সর্বহারা গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ (ফিউশন)—উভয়ের মিলনের প্রকৃত নির্যাস। এ সংমিশ্রণ সমগ্র পার্টির মধ্যে সর্বদা একত্রে কাজ, সর্বদা একত্রে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল অর্জন করা যায়। কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে কেন্দ্রিকতা নয়; এই কেন্দ্রিকতা হলো সাম্যবাদী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রিকতা, যার অর্থ হলো, এমন একটি সুদৃঢ় শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে তোলা যা বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত, আবার একই সাথে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় পারদর্শী। আনুষ্ঠানিক বা যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হলো পুঁজিবাদী আমলা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা—সংগঠনের সজীব জীবনধারার বাইরে থেকে যা পার্টির অবশিষ্ট সদস্যের উপর বা বিপ্লবী সর্বহারা জনতার ওপর আধিপত্য চালায়।[৪৩]

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে মাও সেতুং বলেছেন:

> জনগণের ভেতরে গণতন্ত্র কেন্দ্রিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং স্বাধীনতা শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ সবই হচ্ছে একটি একক বস্তুর দুটি বিপরীত দিক, তারা পরস্পর বিরোধী, আবার ঐক্যবদ্ধও; আমাদের একটার ওপর একতরফাভাবে জোর দিয়ে অন্যটাকে অস্বীকার করা উচিত নয়। জনগণের ভেতরে, স্বাধীনতা ছাড়া চলে না, শৃঙ্খলা ছাড়াও চলে না; গণতন্ত্র ছাড়া চলে না, কেন্দ্রিকতা ছাড়াও চলে না। এই ধরনের গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার একত্ব এবং স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার একত্বের অর্থ হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এই ব্যবস্থায় জনগণ ব্যাপক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করেন; একই সময়ে আবার সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলার মধ্যে অবশ্যই তাদের নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে হয়।[৪৪]

সমাজতান্ত্রিক সমাজে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের প্রকাশ ঘটে একক নীতি অনুসরণে, অধঃস্তন সংস্থাগুলোর দ্বারা ঊর্ধ্বতন সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ আবশ্যিকভাবে পালনে এবং সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুর অধীন থাকার মাধ্যমে। এ সমাজে মেহনতি জনগণের সামাজিক আত্মশাসন চলে মেহনতিদের জন্য মেহনতিদের মাধ্যমে। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যেক মেহনতি কর্মীকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে যোগদানের সুযোগ দেয়। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তাদের যোগদান কোনো সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রমে আবদ্ধ নয়। মাও সেতুং লিখেছেন:

> পার্টির ভিতরে গণতান্ত্রিক জীবন সম্পর্কে শিক্ষার কাজ অবশ্যই চালাতে হবে, যাতে করে পার্টির সদস্যরা বুঝতে পারেন, গণতান্ত্রিক জীবনের অর্থ কী, গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মধ্যেকার সম্পর্ক কী এবং কীভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে কাজে লাগানো যায়। শুধুমাত্র এ উপায়েই, একদিকে পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক জীবনকে সত্যি

সত্যি প্রসারিত করা সম্ভব; অন্যদিকে উগ্র-গণতন্ত্র, শৃঙ্খলা লঙ্ঘনকারী উদারনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতাকে এড়ানো সম্ভব।[৪৫]

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ বলতে বুঝতে হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্র, পার্টি, গণসংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর পরিচালনার নীতি। এ সমাজে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব গঠিত ও চালিত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের ভিত্তিতে। এই নীতির অর্থ হচ্ছে সমাজ-রাষ্ট্র-পার্টি-সংগঠনের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকল সংস্থায় নির্বাচন হয় সর্বজনীন, সমান ও গোপন ব্যালটে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। এই নীতি অনুসারে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত নির্বাচিত পরিচালকবর্গকে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি, দায়িত্ববোধ, প্রতিবেদন প্রদানের প্রক্রিয়া নিয়মিত ও স্বচ্ছ এবং নির্বাচিতদের যে-কোনো সময় প্রত্যাহারের নীতি কার্যকর থাকবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের নীতি অনুসারে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ সংস্থা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় রাষ্ট্রীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে।[৪৬]

পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো কেমন হবে তা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় নয়, বরং কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক ভূমিকা কী হবে সেটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলোর পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং তারা মনে করেন, বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই। সে-কারণে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাও তাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটানো এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এটা করতে গেলে এমন ধরনের পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে যা প্রবল পরাক্রমশালী রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণিগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক স্তরে সংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম। এটা এমন একটা পার্টি, যা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, তা সে যত সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন, তা বুর্জোয়া একনায়কত্বের রাষ্ট্রে শুধু নির্বাচনী সাফল্যের জন্যই কাজ করবে না এবং শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না।

এখন মূল প্রশ্ন হলো শ্রমিকশ্রেণিকে সংগঠিত করতে ও নেতৃত্ব দিতে এবং বিপ্লবী গণআন্দোলন পরিচালনায় পার্টি নিজেকে তৈরি করতে পেরেছে কি না। পার্টি সম্পর্কে লেনিনীয় ধারণা হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য পার্টির নিজেকে প্রস্তুত ও উন্নত করতে হবে। সে-কারণে তিনি শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগামী অংশকে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াতে হবে পার্টিকেই। তাহলেই সে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে তৈরি হবে। শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ সংগঠন দৃঢ় হবে এবং আইনি, আধা-আইনি ও বেআইনি যে-কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারবে। শ্রেণি রাজনীতির জন্য এমন একটি পার্টি গড়ে তুলতে হবে যা চলতি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এক পদ্ধতি

থেকে অন্য পদ্ধতিতে সংগ্রামের ধরন পরিবর্তনে সক্ষম হয়। লেনিন এক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীভূত পার্টি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। মার্কসবাদ ও শ্রেণিসংগ্রামের ভিত্তিতে গঠিত পার্টির জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নীতি। শ্রেণিসংগ্রাম হচ্ছে একটি সমষ্টিগত কার্যক্রম। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়নে যৌথ কার্যক্রমের অনুশীলন, যেখানে চিন্তার স্বাধীনতা ও কাজের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে।

যৌথ কাজের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হয় না, সমগ্র পার্টির যৌথ উদ্যোগ ও মতামত মেনে চলতে হয় এবং ব্যক্তিগত মতামত পার্টি সিদ্ধান্তের অধীন থাকে। লেনিন ও বলশেভিকদের সাথে মেনশেভিকদের যে বিতর্ক রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে হয়েছিল, সেখানে লেনিন বিপ্লবী পার্টি ও সাংগঠনিক নীতিসহ কতকগুলো প্রয়োজনীয় শর্তের কথা বলেছেন। লেনিন বলেন, পার্টি ও তার সংগঠন হচ্ছে বিপ্লবী গণআন্দোলনের পূর্বশর্ত এবং তার ফসল এ দুটোই। অর্থাৎ লেনিনীয় ধারণা হচ্ছে পার্টি যেমন বিপ্লবী গণসংগ্রামের স্রষ্টা, তেমনি বিপ্লবী সংগ্রামের ফসলও বটে। তাঁর মত হচ্ছে, পার্টিকে হতে হবে এমন একটি সংগঠন যা বিপ্লবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে এবং রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে শ্রেণিশত্রুদের আক্রমণ মোকাবেলায় নিজেকে সক্ষম করে তুলতে সচেষ্ট থাকে। এ ধরনের একটা পার্টিকে কঠোরতম সাংগঠনিক শৃঙ্খলার ওপর ভিত্তি করে গঠন করতে হবে। এটা এমন এক ধরনের শৃঙ্খলা যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে এবং সংগ্রামের ধরনে নমনীয়তা অনুসরণে পার্টিকে সক্ষম করে তুলবে। মার্কসবাদ ও শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাসী কোনো পার্টির মতাদর্শ থেকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার পরিণামে পার্টি সংগঠনের মূলনীতিকে বর্জন করার বিপদ দেখা যায়।

ইতিহাসের গতিধারায় বুর্জোয়া ব্যবস্থা বিকাশের সাথে সাথে বুর্জোয়া শ্রেণির বিপরীতে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।[৪৭] বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যত বিকাশ ঘটে প্রলেতারিয়েত শ্রেণিরও ততই বিকাশ ঘটে। সামন্তবাদীদের হটিয়ে বুর্জোয়ারা যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে, অনিবার্যভাবেই তার বিপরীত ধারায় প্রলেতারীয় গণতন্ত্রও বিকশিত হয়। প্রলেতারীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাজ হিসেবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করতে হবে, যাকে মার্কসীয় পরিভাষায় বলা হয় প্রলেতারিয়েত শ্রেণির একনায়কত্ব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেন, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র সমাজব্যবস্থাটাই পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সকলের স্বার্থে সকলের প্রয়োজনে।[৪৮] কমিউনিস্ট ইশতেহারে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই প্রলেতারীয়

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের উচ্ছেদ; অর্থনৈতিক ও তার আইনী রূপ উভয় অর্থে।[৪৯] কমিউনিস্ট ইশতেহারের ব্যাখ্যা হচ্ছে, শ্রেণি বিরোধের ওপর, অল্পলোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলোকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করার ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও পূর্ণতম প্রকাশ যে বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণায় নিহিত আছে, তার চূড়ান্ত অবসানের জন্য প্রয়োজন প্রলেতারীয় গণতন্ত্র তথা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে উত্তরণ।

প্রলেতারিয়েত শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব যা তারা সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ ও দৃঢ়করণের জন্য ব্যবহার করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রয়োজনীয় শর্ত হলো সৃজনশীলতা ও গণতান্ত্রিক মানসিকতা। অর্থাৎ, নিপীড়ক ও নিপীড়িত শ্রেণিসমূহের মধ্যে সমাজের বিভক্তির অবসান ঘটানো, মানুষের ওপর মানুষের শোষণ লোপ করার অবস্থা সৃষ্টি। প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং সামাজিক সংগঠন, যেমন শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, যুব সংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বের পর্যায়ে থাকে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির কমিউনিষ্ট পার্টি।[৫০] মার্কস বলেন:

> প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ঘটাতে উত্তরণ পর্বে এক প্রয়োজনীয় জিনিস। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ নির্মাণের দিকে সমাজের রূপান্তর সাধন। পুঁজিবাদী সমাজ আর কমিউনিস্ট সমাজ, এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে একটি থেকে অপরটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের এক পর্ব। তারই সহগামী থাকে একটি রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্ব যখন রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।[৫১]

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠলেই চলে আসে গণতান্ত্রিক সাম্যের কথা। গণতন্ত্র যে শ্রেণিনিরপেক্ষ হতে পারে সে-কথা বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা কখনোই মেনে নেয় না। অর্থাৎ তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিদৃষ্টিতে এক ধরনের একনায়কতন্ত্র, এটা তারা বুঝতে চায় না। রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণায় তারা রাষ্ট্রের শোষণ প্রক্রিয়াটিকে আড়াল করেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বুঝতে চান না যে, রাষ্ট্র একটি যন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শ্রেণিশত্রুকে দমন করা এবং একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বার্থ হাসিল করার সব রকমের সুযোগ সুবিধার বৈধতা দেয়া। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ করে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন, শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক প্রভুত্ব বা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের

প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তত্ত্বের প্রধান কথা। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ছাড়া কমিউনিজম নির্মাণ অসম্ভব। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রসঙ্গে লেনিন বলেন:

> বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপ অসাধারণ বিচিত্র, কিন্তু তাদের মূল কথাটা এক; এ সমস্ত রাষ্ট্রই কোনো না কোনোভাবে, এবং শেষ বিচারে অবধারিতভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্ব। পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণে অবশ্যই রাজনৈতিক রূপের বিপুল প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য না দেখা দিয়ে পারে না, কিন্তু তাদের মূলকথাটা থাকবে অনিবার্যভাবে একটা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব।[৫২]

লেনিনের বক্তব্যকে যদি আমরা বিপরীত দিক থেকে দেখি তাহলে বর্তমানে জারি থাকা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে দেখতে পাই, যা মূলত শ্রমিকশ্রেণির ওপর বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্ব। এটি শুধু আইন-কানুন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, বলপ্রয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ শাসনের প্রতি আছে গুটিকয়েক বুর্জোয়ার সহানুভূতি আর সমর্থন। স্তালিনের মতে, রাষ্ট্র হলো শ্রেণিশত্রুকে দমন করার জন্য শাসকশ্রেণির হাতে যন্ত্রবিশেষ। এই হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের সাথে অন্য কোনো শ্রেণির একনায়কত্বের পার্থক্য নেই। কারণ শ্রমিকের রাষ্ট্র বুর্জোয়াদের দমন করার যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হলো যে, ইতিহাসে এ পর্যন্ত যত শ্রেণিরাষ্ট্র হয়েছে সেগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত জনগণের ওপর সংখ্যালঘু শোষকের একনায়কত্ব; আর শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব হলো সংখ্যালঘু শোষকের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব।[৫৩]

*গোথা কর্মসূচির সমালোচনা* গ্রন্থে মার্কস-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, নৈরাজ্যবাদী[৫৪] অতি উৎসাহী ব্যক্তিরা মনে করেন আমরা রাতারাতি যাদুমন্ত্রের মতো পুঁজিবাদ ও বুর্জোয় রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে ফেলব। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচুর্য ও স্বাধীনতার জন্য এবং সুখ-শান্তির এই নতুন যুগে প্রবেশের জন্য আমাদেরকে কী কী করতে হবে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। এই গ্রন্থে সাম্যবাদের বস্তুগত বিষয়াবলি সকলের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছে দিতে হবে। যত দিন পর্যন্ত আমরা প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত উন্নতি সাধন করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন ও অভাব থেকে উল্লম্ফনের মাধ্যমে মুক্ত হয়ে, পূর্ণাঙ্গভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটাতে পারব না। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিপ্লবী সময় অতিক্রম করতেই হবে। পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে এই সময় অতিক্রম করতেই হবে। অন্তর্বর্তীকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সাধন করে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাজ হিসেবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখলের পর প্রলেতারিয়েত শ্রেণি উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ

করবে এবং অংশগ্রহণমূলক পন্থায় কতিপয় ধনিকশ্রেণির মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে সকলের স্বার্থে তা পরিচালনা করবে। তখনই অতি দ্রুত সমাজের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণের সাথে সাথে বেকারত্ব নির্মূল, বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, সার্বজনীন শিক্ষা, বাসস্থান ও দরকারি সবকিছু নিশ্চিত হবে। মানুষের সকল সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে, মানুষ হয়ে উঠবে সৃজনশীল, বৃদ্ধি পাবে তাদের উৎপাদনশক্তি। এঙ্গেলস এরূপ রাষ্ট্রের ব্যাখ্যায় বলেন:

> ইহা সত্যিকার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বশীল একটি সমাজ হবে, এই শব্দটি তার প্রচলিত অর্থের তাৎপর্যই হরিয়ে ফেলবে, রাষ্ট্র বিলীন হবে সমাজের মাঝে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমাজের খুবই অল্প মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। আর সে জন্যই তারা বেশির ভাগ মানুষের ওপর প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্মম পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তবে যদি একবার সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সকলের স্বার্থে শুরু হয়ে যায় তবে দ্রুত পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিলোপ হতে থাকবে এবং এর সাথে সাথে পুঁজিবাদী সমাজে চলমান শোষণ, নিপীড়ন ও বৈষম্য ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হয়ে যাবে। এ ছাড়া পুঁজিবাদী সমাজে প্রচলিত ভয়ভীতি প্রদর্শন, শক্তি প্রয়োগ থাকবে না, সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাটাই পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সকলের স্বার্থে সকলের প্রয়োজনে।[৫৫]

লেনিন মনে করেন, সাম্যবাদী সমাজে যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটবে, যখন সমাজে আর্থিক কারণে সামাজিক শ্রেণিভেদ থাকবে না, তখন রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটির বিলোপ ঘটবে এবং মানুষ বাক-স্বাধীনতা লাভ করবে, আর কেবল তখনই সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বাদ পাবে নাগরিক সমাজ। তাঁর মতে, কমিউনিজমের দিকে বিকাশ এগোয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মধ্য দিয়ে, অন্যভাবে আগানো যায় না। কেননা, শোষক পুঁজিবাদীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার মতো আর কেউ নেই এবং অন্য পথ অসম্ভব। লেনিনের মতে, মার্কসের রাষ্ট্র বিষয়ক মতবাদের মর্মার্থ কেবল সেই আয়ত্ব করেছে যে বোঝে যে, একটি শ্রেণির একনায়কত্ব কেবল সাধারণভাবে সমস্ত শ্রেণিসমাজের জন্য, কেবল বুর্জোয়া উৎখাতকারী প্রলেতারিয়েতের জন্য দরকার তা নয়, পুঁজিবাদ এবং শ্রেণিহীন সমাজ কমিউনিজমের অন্তর্বর্তী সমগ্র ঐতিহাসিক পর্বটার জন্য তা দরকার। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রসঙ্গে লেনিন আরও বলেন, এর অর্থ কেবল শোষকদের ওপর বলপ্রয়োগ মাত্র নয়, এমনকি প্রধানত বলপ্রয়োগও নয়। এই বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের অর্থনৈতিক ভিত্তি, তার প্রাণশক্তি ও সাফল্যের গ্যারান্টি হলো এই যে প্রলেতারিয়েত পুঁজিবাদের তুলনায় একটা উচ্চতর ধরনের সামাজিক শ্রমব্যবস্থার মুখপাত্রও গণতান্ত্রিক উপায়ে কার্যকর করে। কমিউনিজমের অনিবার্য পূর্ণ বিজয়ের উৎস, শক্তি ও নিশ্চয়তা এখানেই।

ব্রিটেনে উইলিয়াম মরিসের সমাজতান্ত্রিক লীগ এবং ১৮৮০-এর দশকে ফেগ্রাবিয়ান সমাজে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধারার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। পরবর্তী সময়ে জর্জ অরওয়েলের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি ১৮৯০-এর দশক পর্যন্ত এ প্রতিনিধিত্ব চালিয়ে যায়। ১৯২০-এর দশকের শুরুতে জি. ডি. এইচ

কোলের সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হয়ে ওঠে সোভিয়েত মডেলের কর্তৃত্ববাদী ধরনের এক বিকল্প সমাজতান্ত্রিক সমাজের কল্পনা। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী মিচেল ফুট এবং টনি বেন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নতুন ধারণা প্রদান করেন। অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী এ ঘোষণাকে সমর্থন করেন।

ইউরোপের অন্যান্য অংশে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী পার্টিই ১৯২০ সালের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক দলসমূহের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর সংঘবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক দলসমূহের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সামাজিক গণতন্ত্রী এবং অপূর্ণ সমাজতন্ত্রী বলে বিবেচিতদের পরিচালিত হওয়ার পথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্র বিরোধী বলে বিবেচিতদের জন্যও একপ্রকার নির্দেশনা দেয়া হয় তাদের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মেলনের মাঝামাঝি সময়ে স্পেনে লেবার পার্টি এবং ওয়ার্কাস পার্টি মার্কসবাদী আদর্শের সমর্থনে সমন্বিত হয়। ১৯৪৮ সালের চূড়ান্ত সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতালিতে ১৯৪৭ সালে ইতালিয়ান সমাজতান্ত্রিক দল যখন সোভিয়েত অর্থায়নে পরিচালিত ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগ দেয়, ইতালিয়ান সমাজতান্ত্রিক দল তখন ভেঙ্গে ইতালিয়ান সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দলে পরিণত হয়। ইতালিয়ান পার্লামেন্টে পাঁচ দশক ছোট দল বলে অস্তিত্বশীল থাকলেও, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দলের নেতা জিসুপি সারাগাট ১৯৬৪ সালে ইতালির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ব্রিটেনের ফেনার ব্রুকওয়ে নামক একজন নেতৃত্বস্থানীয় স্বাধীন লেবার পার্টির সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী তাঁর Britain's Frist Socialists[৫৭] গ্রন্থে প্রাথমিক পর্যায়ের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের তিনটি ধারা চিহ্নিত করেছেন। প্রথম হলো সাম্যবাদী ধারা। এ ধারার সমর্থকগণ রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অগ্রপথিক ছিলেন এবং জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলতেন। দ্বিতীয় হলো আন্দোলনকারী ধারা। এ ধারার সমর্থকগণ কর্মস্থলে পদমর্যাদা অনুযায়ী অংশগ্রহণমূলক নিয়ন্ত্রণক্ষমতার কথা প্রচার করতেন। এবং তৃতীয় হলো শ্রমজীবী ধারা, যারা সামাজিক মালিকানা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমানাধিকারের কথা বলতেন। গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়পরতা সম্পর্কে তাদের সচেতনতার কারণেই তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অগ্রপথিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজতন্ত্রী শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮২৭ সালে ব্রিটেনের একটি সাময়িকীতে।[৫৮] রবার্ট ওয়েন এ মতটিকে এর অনুসারীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, যাদের মূল লক্ষ্য ছিল সাম্যবাদী আন্দোলন। ওয়েনের অনুসারীরা ভোক্তা সমবায়, আমানতদারী সংঘ এবং পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমাজের আকারে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সাম্যবাদ উভয়ের ওপর জোর

দিয়েছিলেন। অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনীতির সাথে বৃহদার্থে বিবেচিত গণতন্ত্রের সমন্বয় ঘটানোর পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। অনেক দেশেই এ ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কিছু ধারা বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। এরা সমাজ রূপান্তরের পক্ষে। অন্যান্য ধারা থেকে এগুলো পৃথক। যেমন পিটার হেইন[৫৯] সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে উদারতাবাদী সমাজতন্ত্রের শ্রেণিভুক্ত করেন, স্ট্যালিনবাদের বিপরীতে এটি কর্তৃত্ববাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি বিকল্প। হেইনের মতানুসারে, এ দৃষ্টিভঙ্গি বিপ্লবাত্মক এবং পুনর্গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এ ধারণা জনসাধারণ, বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিকভাবে ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এ ধারণা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে বিশিষ্টতা দান করে। কারণ জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়করণ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণীত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সরকারের দ্বারা, সে-সরকার নির্বাচিত হোক আর নাই হোক। এটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যও বটে। প্রায় একই ধরনের কিন্তু অধিকতর জটিল প্রকৃতির যুক্তি উপস্থাপন করেন নিকোস পোলানজাস।[৬০] ড্রেপার সমাজতন্ত্রের একটি ধারা হিসেবে 'বিপ্লবাত্মক গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' শব্দমালা ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করেন, বিপ্লবাত্মক গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মুখপাত্রদের অন্যতম রোজা লুক্সেমবার্গ[৬১] জোরালোভাবেই স্বাধীন শ্রমজীবী শ্রেণির ধারাবাহিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য মিথ তৈরিকারকেরা তাঁর জন্য স্বতঃস্ফূর্ততা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্যান্য ধারাগুলো চূড়ান্তভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এটি প্রতিষ্ঠিত হবে ধীরে, ক্রমান্বয়িক, সংস্কারমূলক এবং ক্রমবিকাশের মাধ্যমে, বিপ্লবাত্মক পথে নয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এ ধারা প্রায়ই মার্কসবাদী-লেলিনবাদী সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক বলে বিবেচিত হয়। এ ধারার অনুসারীরা মনে করেন শ্রমিকদের আত্মব্যবস্থাপনা, শিল্পায়িত গণতন্ত্র এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভবের ফলে উদারনৈতিক গণতন্ত্র উদারনৈতিক পুঁজিবাদী ধারা থেকে বিবর্তিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ, লোকসাননির্ভর অর্থনীতি, বিচ্ছিন্ন শ্রম, সম্পদ ও ক্ষমতার সর্বজনীন অসমতা, বর্ণ ও লিঙ্গবৈষম্য, সামাজিক মর্যাদার অজুহাতে নিষ্ঠুরতা ও জুলুম প্রভৃতিকে বাতিল করার কথা বলেন। তারা সমাজতন্ত্রী কারণ তারা সম্পদ অর্জন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। সমতা বিধানকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, ন্যায়সঙ্গত বণ্টনব্যবস্থা, নারীবাদী চিন্তা, বর্ণভিত্তিক সমতা, অ-নিপীড়নমূলক সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতির কথাও তারা বলেন, যা তাদেরকে একটি বাস্তবসম্মত পৃথিবীর ধারণার দিকে নিয়ে যায়। তাদের সমাজতান্ত্রিক কৌশল সমাজে শ্রেণিবৈষম্যের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। তারা যে শ্রেণিবৈষম্যের কথা

তুলে ধরেন তা সমাজের অর্থনৈতিক পরাশক্তি ও বৃহদাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেয়। সমতার একটা অর্থপূর্ণ আকার তাদের ধারণা থেকে আমরা পেতে পারি, যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটা ফলপ্রসূ দিক হতে পারে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণকারী হবে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বিষয়াদি জনকল্যাণমুখী হবে। বাজার সমাজতন্ত্রের কতিপয় প্রবক্তা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে মূলত একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেন, যা রাজনৈতিক ভাবাদর্শনির্ভর।

বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার যে রূপান্তর সাধিত হয়েছে তা লাতিন আমেরিকাভিত্তিক এবং অঞ্চলভিত্তিক, যেখানে অনেক দেশই বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের সরকার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পর্যবেক্ষকেরা এ অঞ্চলের বামপন্থী সরকারগুলোকে সামাজিক গণতন্ত্রী এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী[৬২] এ দুই ভাগে ভাগ করেন। সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারার দেশসমূহ হলো ব্রাজিল, চিলি, উরুগুয়ে ইত্যাদি, আর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী ধারার দেশ হলো ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া এবং কোনো কোনো সরকারের মেয়াদে আর্জেন্টিনা। এসব দেশের কোনো কোনোটি আবার অন্যগুলোর তুলনায় অধিক গণতন্ত্রমনা। দুর্বল অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও ধীরগতির উন্নয়ন এ অঞ্চলে সব ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বিস্তারকে অসম্ভব করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পক্ষের অধিকাংশ চিন্তাবিদ অবশ্য লাতিন আমেরিকার দৃষ্টান্তের প্রতি সংশয় প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন, এ ধারার রাজনীতিকে সমাজতান্ত্রিক না বলে জনতুষ্টবাদী[৬৩] বলাই যুক্তিযুক্ত। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মতো একুশ শতকের লাতিন আমেরিকার বামপন্থী বা সমাজতন্ত্রীরাও প্রগতি, গণতন্ত্র ও অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা জনসমর্থনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাননির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধান করে। প্রগতিবাদী রাজনীতিতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠনের প্রয়োজন হবে। লাতিন আমেরিকার বামপন্থী সরকারগুলো এ ধরনের পুনর্গঠনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। সেখানে বার বার সংবিধান পুনর্লিখিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহীদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে। আবশ্যিকভাবেই এটি বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া, কেননা পুরনো পদ্ধতির সুবিধাভোগীরা নাগরিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে-কোনো পরিবর্তন ও সংযোজিত নতুন বিষয়গুলোর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাদের কাছে এটি মোকাবেলার প্রাথমিক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় জনতুষ্টবাদী সংস্কৃতির সমাবেশ।

জনতুষ্টবাদী রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে অধিকাংশ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ এক ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এর বিরোধীরা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন যে, তারা নাগরিকদেরকে 'আমরা' এবং 'তারা' এভাবে বিভাজন করতে চান না। তারা সবাইকে সমভাবে বিবেচনা করে একসাথে কাজ করার কথা বলেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন মডেল ও ভিন্নতাকে সমর্থন করেন।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা সামাজিক মালিকানাধীন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিছু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী আবার বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কথা বলেন।[৬৪] ঐতিহাসিকভাবেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ, যেখানে উৎপাদনের এককসমূহের প্রতিটি একেকটি সংস্থা এবং আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে এসব সংস্থাগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করে। বাজার সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিককালের প্রবক্তরা[৬৫] মনে করেন, সোভিয়েত মডেলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ হলো এটি ছিল সর্বগ্রাসী প্রকৃতির রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত গণতান্ত্রিক মানসিকতার অভাব, এবং একইসাথে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার পর্যাপ্ত নিয়ম প্রণয়নেও তাদের ব্যর্থতা ছিল।[৬৬] সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, যদি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কারও কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নাও থাকে এবং তাদের কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার নাও করে তথাপি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় রাজনৈতিক কারণেই, অর্থনৈতিক কারণে নয়। রিচার্ড পাইপস[৬৭] মনে করেন, সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমন্বয়ে যে ধারণা অন্তর্নিহিত রয়েছে তা চরমভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে এবং জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আমলাদেরকে সফল করে। আমেরিকান অর্থনীতিবিদ জোসেফ এ. শুম্পিটার মনে করেন যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, পূর্ণাঙ্গ অর্থে সমাজতন্ত্রের ধারণার সাথে রাজনৈতিক গণতন্ত্র পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৬৮]

১৯৬৩ সালে সর্বভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস কমিটির সভায় জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, "রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কোনো অর্থই হয় না, যদি এতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সংশ্লেষণ না থাকে। আর অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।"[৬৯] ঐতিহাসিক রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ থিওডর ড্রেপার বলেন, "সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ছাড়া এমন কোনো রাজনৈতিক ধারণার কথা আমার জানা নেই, যা অবিচলভাবে সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক মনোভাবের বিরোধীতা করে।"[৭০] রবার্ট হেলব্রোনার মনে করেন, মানবিক স্বাধীনতার ধারণার সাথে সমাজতন্ত্রের কোনো বিরোধ নেই। আসলে, সমাজতন্ত্রের ধারণা হলো মানবিক স্বাধীনতার সংক্ষিপ্তসার। এ মতবাদ ব্যক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে। প্রতিটি মানুষের কাজে গণতন্ত্রীকরণ ও মানবিকীকরণ এখানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সৃজনশীলতার মূল্যায়নের দিকটিও গুরুত্ব পেয়েছে।[৭১]

সাম্প্রতিককালের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বিশ্বাস করেন যে, জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা উভয়ই গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। একটি অধিকতর

ন্যায্য সমাজব্যবস্থার স্বার্থে বিদ্যমান বৈশ্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে সাধারণ জনগণ তাদের জীবনমানে প্রভাব ফেলে এমন বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেরা অংশগ্রহণ করতে পারে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ তারাই গ্রহণ করবে, যারা এগুলো দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। সাম্প্রতিককালের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ও পরিকল্পিত সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণার সাথে একমত নন। তারা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। তারা বিশ্বাস করেন যে, গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কেবল পারে সামগ্রিক গণপরিবহনব্যবস্থা, গৃহায়ণ, শক্তি উৎপাদন, বাজার ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিপক্ষে। তারা মনে করেন, এটি ব্যক্তিগত মুনাফাভিত্তিক এবং শ্রমিক থেকে বিচ্ছিন্ন। এটি লিঙ্গ ও বর্ণবৈষম্য বাড়িয়ে তোলে। পরিবেশের কথা বিবেচনা না করে কেবল অধিকতর মুনাফার আশায় নিষ্ঠুরভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে তা পরিবেশকে ক্রমেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা এমন একটি মতাদর্শের কথা বলেন যা মানবিকীকৃত। এমন একটি আন্তর্জাতিক সামাজিক বিন্যাসের কথা বলেন যা হবে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাভিত্তিক। এর বাজার ব্যবস্থাপনা এমন হবে যাতে সব ধরনের সম্পদের সুষম বন্টন হবে এবং কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হবে। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, স্থিতিশীল উন্নয়ন, লিঙ্গ ও বর্ণভিত্তিক সমতা এবং মানবিকীকৃত সামাজিক সম্পর্কের প্রতি এ মতাদর্শ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এককথায়, অর্থনৈতিক ন্যায়পরতা বলতে আমরা যা বুঝি, তার প্রতিষ্ঠানিকীকরণের পথে গণতান্ত্রিক আদর্শকে ধারণ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্যতম মূলমন্ত্র।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। সমাজতন্ত্র যেহেতু এমন একটি প্রত্যয় যা প্রধানত শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলে, এটি এমন ব্যবস্থার কথা বলে যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও বিচ্ছিন্নতা দূর করে প্রত্যেক মানুষের সমান সুযোগ সুবিধা-লাভের পরিবেশ সৃষ্টি হবে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হলো সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক রূপ। একে সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পদ্ধতি হিসেবেও দেখা হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গড়ে ওঠে।[৭২]

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলা হয়, যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। যতদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তন না হচ্ছে

ততদিন পর্যন্ত বর্তমান সমাজের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে না। ধনীরা গণতন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এবং পরিণামে তা ধনিকতন্ত্রে পরিণত হয়। প্রতিটি মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যেই গণতন্ত্রের সার্থকতা, ধনিকতন্ত্রে তা সম্ভব নয়। সাম্য ও স্বাধীনতা হলো গণতন্ত্রের ভিত্তি। যা কেবল রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেই হবে না। অর্থনৈতিক জীবনেও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয় । সমাজে ধনবৈষম্য থাকলে গণতান্ত্রিক আদর্শ সফল হয় না।

১৯৮১ সালে ব্রিটেনে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি স্থাপিত হয়। গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র তথা সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল এ পার্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও পরে পার্টির কৌশল পরিবর্তিত হয়। উদারনীতিবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়াকে পার্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। শ্রেণিসংগ্রাম ও বিপ্লবের পরিবর্তে বাজার-অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলা হয়। সামাজিক গণতন্ত্রপন্থীদের মতে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামো রচিত হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সমাজতন্ত্র সব সময় সমাজের আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী এ কথা সত্য, কিন্তু সে-পরিবর্তন আসবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। সামাজিক গণতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পার্থক্য এখানে যে, সামাজিক গণতন্ত্রে বিপ্লবের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া সম্ভব বলে মনে করা হয়। এতে উৎপাদনের উপকরণের ওপর বিশেষ কোনো শ্রেণির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার ওপর সমগ্র সমাজের এ অধিকার ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক পথে কার্যকরী করতে হবে। সামাজিক গণতন্ত্রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের কথা বলা হলেও শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় না।[৭৩]

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বিশ্বাস করেন যে, জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য সংখ্যালঘুর স্বার্থ যাতে প্রাধান্য না পায়, সেজন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা উভয়ই গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। কারণ গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র হাতে হাত রেখে চলে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আমলাতান্ত্রিক কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান না। তারা বরং চান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ তারাই গ্রহণ করবে যারা এগুলো দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও স্টিল প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানা অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন ভোক্তা চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সমবায়ের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালোভাবে পরিচালিত হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা

কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত সামগ্রিক ব্যবস্থার ধারণার তীব্র বিরোধীতা করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কেবল পারে সামগ্রিক গণপরিবহনব্যবস্থা, গৃহায়ন, শক্তি উৎপাদন, বাজার ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সামাজিক গণতন্ত্র এবং বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক। সামাজিক গণতন্ত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পুঁজি ও উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে। অন্যকথায়, এ ব্যবস্থায় অধিকাংশ সম্পদ উৎপাদিত হয় ব্যক্তিগতভাবে ও গোপনে। সামাজিক গণতন্ত্রে করারোপ, সরকারি ব্যয় নির্বাহ এবং ব্যক্তিগত খাতের পরিচালনা বিধিগুলো বিশুদ্ধ পুঁজিবাদের চেয়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক গণতন্ত্র কোনোপ্রকার বিপ্লব বা মার্কসীয় ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং এটি পুঁজিবাদের বিলোপের কথাও বলে না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা মনে করেন না যে, উৎপাদনের উপায়ের সাথে সরকারের যুক্ত হওয়া উচিত বা সরকারি নিয়ন্ত্রণেই উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু তারা মনে করেন, সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও শ্রমজীবী শ্রেণি, যারা সম্পদ উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তারা যা পায়, তার চেয়ে তারা বেশি কিছু পাওয়ার যোগ্য। কাজেই রাষ্ট্রের কাজ হবে পুঁজিবাদী বণ্টনব্যবস্থার পরিবর্তে তাদের প্রস্তাবিত বণ্টনব্যবস্থা চালু করা। অর্থাৎ সম্পদসমূহ এমনভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত যাতে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ একটি সভ্য ও উন্নত সমাজের সুফলগুলো ভোগ করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ব্যাপক সংশোধনের কথা বলেন। তারা মনে করেন, পাবলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অবৈতনিকভাবে শিক্ষা প্রদান করা উচিত, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রচারণা চালানো উচিত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা উচিত। তারা শুধু প্রান্তিক পর্যায়ের লোকদের জন্য পরিমিত পরিবর্তনের কথা বলেন না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পক্ষে যা সমাজের সকলের জন্য কাজ করবে।

### ৩.৫.১ *সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট*

বিশ শতকের শেষের কয়েক দশকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের সম্পদ ও সম্পত্তির জাতীয়করণের ঝোঁক নানা দেশে ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। জাতীয়করণের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় সম্পদ সৃষ্টি করা ও তার সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায় সমাজের সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ অগ্রগতি সাধিত হলেই সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যটি প্রায় অধরাই থেকে যায়। অনেকেই ভাবলেন, সম্পদ সৃষ্টি বা

বৃদ্ধির জন্য বাজার-অর্থনীতি বা পুঁজিবাদই উপযুক্ত কৌশল এবং সে-কারণে পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের জন্য তারা জোর চেষ্টা শুরু করেন। ফলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নৈতিকতার এক চরম সংকটের মধ্যে পড়ে।

পুঁজিবাদের অবসান না ঘটিয়ে সমাজে ন্যায়বিচার স্থাপন, সাম্য প্রতিষ্ঠা, বেকার সমস্যা দূরীকরণ অধিক পরিমাণে সম্পদ সৃষ্টি ইত্যাদি উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার কথা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র জোর দিয়ে বলেছে। কিন্তু বিশ শতকের পাঁচের দশকের পর থেকে শেষ দশক পর্যন্ত সময়ে পুঁজিবাদকে না হটিয়ে লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি। বরং পুঁজিবাদ স্ফীতি লাভ করেছে এবং সম্পদ বণ্টনে যে বৈষম্য ছিল তা একই রকম রয়ে গেছে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সম্প্রসারণ ঘটেছে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য একাধিক কারণ দায়ী হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যায়। এ ব্যর্থতা অর্থনীতিকে এক গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ব্রিটেনের উদাহরণ দিয়ে হেউড এ বিষয়ে বলেন যে, শ্রমিক দল কল্যাণ রাষ্ট্র, জাতীয়করণ প্রভৃতি ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করায় ১৯৭৯-১৯৯২ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোনো সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি।[৭৪] এ সময় মার্গারেট থ্যাচার ও তাঁর রক্ষণশীল দল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং তিনি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা বর্জন করেন। জার্মানিতে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ১৯৮২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় প্রবেশ করতে পারেনি। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দল খুবই শক্তিশালী বলে দাবি করা হয়। কিন্তু ১৯৯৩-২০০০ সালের মধ্যে এই দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে ব্যর্থ হয়।

গত শতকের আটের দশকের পর থেকে অর্থনীতি জগতে বিশ্বায়ন তার যাত্রা শুরু করে। এ সময় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশই বিশ্বায়নের আওতায় এসে গেছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অবস্থা নিয়ে। কারণ বিশ্বায়নের নেতৃত্বে আছে শিল্পোন্নত দেশগুলো। বহুজাতিক সংস্থার নেতৃত্বে একটি অখণ্ড পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তীব্র সংকট দেখা দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিশ্বায়ন জাতি-রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ওপর তীব্র আঘাত হেনেছে এবং সেই আঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল পড়ছে যাদের ওপর তাদের মধ্যে একটি হলো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এ চাপকে উপেক্ষা করে নিজের সুবিধা মতো অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রণয়ন করা সহজ নয় এবং কোনো রাষ্ট্র তা করতে পারছে না। এখানেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সংকট। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আজ আর আগের মতো জনগণকে প্রভাবিত করতে পারছে না।

### ৩.৬ উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের তুলনা

উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ। নিম্নে দুটি মতবাদের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দেয়া হলো:

**প্রথমত:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে শ্রেণিবৈষম্যকে স্বীকার করা হয়। সমাজে ধনী, দরিদ্র, বিত্তবান ও বিত্তহীন উভয়েরই স্থান আছে। তাদের মধ্যে সম্পর্ক কখনো সহযোগিতার, আবার কখনও প্রতিযোগিতার। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে শ্রেণিবৈষম্যকে অস্বীকার করা হয়; সমাজে শ্রেণি থাকবে একটি—প্রলেতারিয়েত শ্রেণি (শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনগণ) এবং এই শ্রেণিই রাষ্ট্রের পরিচালনায় থাকবে।

**দ্বিতীয়ত:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বহুদলের অস্তিত্ব থাকে, যেখানে প্রতিটি দল প্রকাশ্যে ও স্বাধীনভাবে অন্যান্য দলের বিরোধিতা করে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে একাধিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার না করে একটি মাত্র দলের অস্তিত্বের কথা বলা হয়।

**তৃতীয়ত:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তার মালিকানাকে স্বীকার করা হয়। ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মালিক হয়। অন্যদের এ সম্পদের ওপর কোনো অধিকার থাকে না। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও অধিকার স্বীকার করা হয় না। উৎপাদনের উপকরণ, চাষের জমি, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি অর্থাৎ যাবতীয় সকল উপকরণের প্রকৃত মালিক থাকে রাষ্ট্র।

**চতুর্থত:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। জনগণের বাক-স্বাধীনতা, জনমত গঠনের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি স্বীকার করা হয়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে এ ব্যবস্থায় কর্মসংস্থানের অধিকার, পারিশ্রমিকের অধিকার, অবসর বিনোদনের অধিকার, খাদ্য ও বাসস্থানের অধিকার সমান গুরুত্ব পায়।

**পঞ্চমত:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন হয়। প্রশাসনিক আদালতের অস্তিত্বের জন্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আইনের অনুশাসন ও ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে জনগণের সঠিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে যে সকল কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য তৎপরতা শুরু করা হয় তা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকারকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থাকে।

**ষষ্ঠত:** উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা মূল বিষয়। এখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে পরম বলে জ্ঞান করা হয়। ফলে এ ব্যবস্থায় সামরিকতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিলেও এখানে ব্যক্তি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে মানবসত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

এগুলোর বাইরেও দুটি ব্যবস্থাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দেয়ায় এখানে একাধিক শ্রেণির উদ্ভব হয়। এখানে বহুত্ববাদিতাকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের অন্যতম ফল হলো বহুত্ববাদী তত্ত্বের উদ্ভব। এ তত্ত্বে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক দিকের পাশাপাশি সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ নাগরিকদের আচরণগত বা রাজনৈতিক অংশগ্রহণমূলক দিকটির প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। বহুত্ববাদকে গণতন্ত্রের সারকথা বলে গণ্য করা হয়। বহুত্ববাদীদের মতে, বিভিন্ন স্বার্থবাদী গোষ্ঠীই হলো গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি। বহুত্ববাদী গণতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। এ তত্ত্ব অনুসারে গণতন্ত্র কেবল জনগণের শাসন বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়। গণতন্ত্র হলো এমনই এক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বেসরকারী গোষ্ঠীসমূহ, স্বার্থবাহী সংগঠনসমূহ এবং সেই সকল সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভাগ হয়ে যায়।[৭৫]

বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের ধারণা উদারনৈতিক তত্ত্বেরই সাম্প্রসারিত রূপ। এখানে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল ধারণাগুলোকে সমর্থন করে সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হয়। বহুত্ববাদী গণতন্ত্রে উদার গণতন্ত্রের মতো ব্যক্তিস্বার্থকে সমর্থন করা হয়েছে। তবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতো বহুত্ববাদীরা একথা মনে করেন না যে, ব্যক্তি নিজেই তার স্বার্থ সংরক্ষণে সমর্থ। মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে। বহুত্ববাদ মূলত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মতো বহুত্ববাদও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতাকে স্বীকার করে। তবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মতো ব্যক্তিসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা নয়, বহুত্ববাদ মূলত স্বার্থবাহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কথা বলে থাকে। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্য হলো স্বার্থবাহী গোষ্ঠীগুলো কর্তৃক সরকারের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। বহুত্ববাদ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মতো রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এটি অধিকাংশ নাগরিকের বিচক্ষণতায় আস্থাশীল এবং তারা রাজনীতিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং অধিক সংখ্যক লোক রাজনীতিকরণ বঞ্চিত বলে মনে করেন। এভাবে বহুত্ববাদ মনে করে ব্যক্তির একক ও বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নয়, প্রয়োজন হলো সমস্বার্থসম্পন্ন বা

সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিসমূহের সংঘবদ্ধভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। কেননা সংঘবদ্ধভাবে ও স্বার্থবাহী গোষ্ঠীসমূহের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা সম্ভব। একইসাথে ব্যক্তিস্বার্থকে রক্ষা করা ও তার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এখানে অংশগ্রহণকারী নাগরিকত্বকে গুরুত্ব দেয়া হয়। বহুত্ববাদে রাজনীতিকে একটি মিথষ্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, যেখানে নাগরিকগণ রাজনৈতিক গতিধারা প্রভাবিত করে। বহুত্ববাদী গণতন্ত্রে সহমতের রাজনীতির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।[৭৬] বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংঘগুলোর মধ্যে সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলো বণ্টিত হবার সুযোগ ঘটে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে জনগণকে অহেতুক নিয়ন্ত্রণ ও চাপ থেকে মুক্ত রাখা হয়। এখানে সকল প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্য থেকেই উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক সাম্যের দিকটি বেশি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। এ গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের আদর্শ। এতে সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের সুন্দর জীবন, জীবিকা, মৌলিক অধিকার, সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারকে স্বাভাবিক অধিকারের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার ফলে এ অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ফলে ব্যক্তি তার মৌলিক অধিকারগুলো প্রয়োগ করতে পারে না।

উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থায় বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এখানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত থাকে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকলেও এ স্বাধীনতা অনেক সময় উশৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার রূপ নিতে পারে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সকলের সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্র সমাজতান্ত্রিক এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক উভয় শাসনব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সকলের সমান সুযোগ লাভের নিশ্চয়তা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে যেভাবে এবং যতটা সম্ভব, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সেভাবে এবং ততটা সম্ভব নয়। তবে এ দুয়ের সমন্বয়ে কোনো শাসনব্যবস্থা তৈরি হলে সেটি অধিক ন্যায়ভিত্তিক ও সাম্যভিত্তিক হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা থাকলেও উদারনৈতিক গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যকে অত্যাবশকীয়রূপে গ্রহণ করেছে। তেমনি আবার সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যকে প্রয়োজনীয়রূপে গ্রহণ করেছে। এ থেকে বলা যেতে পারে, ভবিষ্যতে হয়তো এদের মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে। উভয়ের সম্মিলনে যদি কোনো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পাওয়া যায় তবে তার মাধ্যমে জনগণের অধিকতর কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে মহান রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা তিন দশকের মধ্যে মানবজাতির এক তৃতীয়াংশের

মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর বিলুপ্তি ঘটে গত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এবং সেখানেই বিকাশ ঘটে উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের। একে মার্কসবাদী নীতি মনে করা হলেও মার্কসবাদের সাথে তার পার্থক্য রয়েছে। মার্কসবাদে যেখানে প্রলেতারিয়েতের কর্তৃত্বের কথা বলা হয়, উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে সেখানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে সীমিত করার কথা বলা হয়। সেই সাথে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে সামাজিক কার্যাবলি সম্পাদন করার কথা বলা হয়। একটি রাষ্ট্রের জন্য যা কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক তা অধিক গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করা হয়। কাজেই এ দুই ধরনের গণতন্ত্রের এক সমন্বয়ী রূপ রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে।

## তথ্যনির্দেশ

১. রুশোর সামাজিক চুক্তিতত্ত্বে সম্মতির শাসনের উল্লেখ রয়েছে। রুশোর আগে লকের সম্মতিতত্ত্বে এ ধারণা বিধৃত। রুশো দেখালেন রাষ্ট্রনৈতিক কতৃত্বের উৎস জনসাধারণ এবং সাধারণের মঙ্গলসাধনই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। রাষ্ট্র জনসাধারণের সক্রিয় ইচ্ছা ও সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, নিষ্ক্রিয় সম্মতির ওপর নয়।

২. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, *সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৩৩।

৩. J.A. Schumpeter, *Capitalism, Socicalism and Democracy*, Union Paper Backs, 1987, p. 242.

৪. আর. এম. ম্যাকাইভার, *আধুনিক রাষ্ট্র*, এমাজউদ্দিন আহমদ (অনূ.), সময় প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ২৭৮।

৫. A. G. Agarwal, *Politcal Theory*, S. Chand and Company pvt. Ltd., New Delhi, Reprint 2016, p. 266.

৬. বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চরিত্র পুঁজিবাদী সামাজিক বিন্যাসের মধ্যেই নিহিত, শোষণের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্র বলতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের অধিকারকে বোঝায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ গণতন্ত্রকে সমগ্র জনগণের সরকার নামে অভিহিত করলেও বাস্তবে জনগণের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা সম্ভব নয়।

৭. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, *সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৩৬।

৮. কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি যাঁরা গড়েছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ফরাসি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সাঁ সিমোঁ। তিনি সমাজতন্ত্রকে একটি আদর্শ হিসেবেই দেখেননি, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এক স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে দেখেছেন। সাঁ সিমোঁর রচনার মধ্যে *Letters of a Resident of Geneva, New Christianity, The Rcognization of European Society, The Industrial System* উল্লেখযোগ্য।

৯. কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের অন্য একজন প্রতিষ্ঠাতা ফরাসি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ চালর্স ফুরিয়ে। তিনি তাঁর সমাজতন্ত্রে এক সাম্যভিত্তিক ও শোষণহীন সমাজের কথা তুলে ধরেন। ফুরিয়ের মতে, মানুষের প্রয়োজন মেটানো ও সমবণ্টনই হলো সমাজের অগ্রগতির বড়ো চিহ্ন। তিনি সমাজতন্ত্রের মধ্যেই পেলেন তাঁর ভবিষ্যৎ সমাজ সংগঠনের ধারণাকে। তাঁর রচনার মধ্যে *The Theory of the four Movements and the Future in General*, *The Traits of Domestic and Agricultural Association, The Industrial Society* উল্লেখযোগ্য।

১০. সমকালে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ রবার্ট ওয়েন। তিনি চেয়েছেন এক শোষণমুক্ত, সাম্যভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে। এ সমাজের পরিকল্পনাকে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর নিউ ল্যানার্কের কারখানায় 'হোম কলোনি' স্থাপনের মাধ্যমে। এ হোম কলোনির আদর্শ হলো সমাজতন্ত্র। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো *New View of Society, Social System* প্রভৃতি। তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন কারখানা ও শ্রমের সংস্কারে কথা বলে। ইংল্যান্ডে সমকালে যে সাংবিধানিক সংস্কার, সামাজিক সংস্কার ও প্রগতি অর্জিত হয়েছিল তার পিছনে ওয়েনের বিশেষ অবদান ছিল।

১১. R. E. Goodwin and P. Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Blackwell, 1996, p. 414.

১২. S. E. Finer, *Comparative Government*, Penguin, 1974. p. 64.

১৩. জন স্টুয়ার্ট মিল, *উপযোগবাদ*, হাসনা বেগম (অনূ.) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯।

১৪. J.S. Mill, *On Liberty and Considerations on Representative Government,* R. B. Mccallum (ed.), Blackwell, 1946, p. 117.

১৫. প্রলয়দেব মুখোপাধ্যায়, *রাষ্ট্র ও রাজনীতি: তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক*, বিজয়া পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১১০।

১৬. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, *রাজনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান জ্ঞানকোষ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৭, পৃ. ৫৯৫।

১৭. দীপক কুমার দাশ (সম্পা.), *রাজনীতির তত্ত্বকথা*, একুশে, কলকাতা, পৃ. ১৪২।

১৮. ইয়েভগেনিয়া স্তেপানভা, *কার্ল মার্কস*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃ. ৮২।

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

২০. Donald F. Busky, *Democratic Socialism: A Golbal Survey*, Greenwood Publishing, USA, 2000. p. 7.

২১. Engles, *Principles of Communism*, Marx-Engles-Selected Works, Progress Publishers, Vol. I, Moscow, 1969, pp. 81-97.

২২. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মৌল ভিত্তি হলো সরকার কর্তৃক নাগরিকদের সমৃদ্ধি বা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব গ্রহণ। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে বেকারভাতা, পারিবারিক অনুদান, স্বল্প মজুরির কারণে অভাব দূরীকরণ কর্মসূচি, বার্ধক্যজনিত কারণে অভাব দূরীকরণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচির বিস্তার, বিনামূল্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, গণ আবাসস্থল নির্মাণের মাধ্যমে জনগণকে রক্ষা করে থাকে। রাষ্ট্রের এ ধরনের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপসমূহ প্রথমে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে কিছু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এগুলো গ্রহণ করে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে।

২৩.Badie, Berg-Schlosser, Morlino, Bertrand, Derk, Leonardo (September, 7, 2011), *International Encyclopedia of Political Science,* Volume. 1, SAGE. p. 242.

২৪. Curian Alt, Chambers, Garrett, Levi, McClain, George Thomas, James E., Simone, Geoffrey, Margaret, Paula D. (October 12, 2010). *The Encyclopedia of Political Science Set*. CQ Press, p. 401.

২৫. Eatwell and Wright, Roger & Anthony, *Cantemporary Political Indelogies*, Second Edition, Bloomsbury Academic, (March 1, 1999), p.80.

২৬. Anderson and Herr, Gany L. and Kathyan G., *Encyclopedia and Social Justic*e. SAGE Publication, inc., 2007, p. 447.

২৭. মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *রাজনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান জ্ঞানকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৭, ঢাকা, পৃ. ৩১২।

২৮. Kendall, Diana, *Sociology in Our Time: The Essentials*, Cengage Learning, (January 2011), pp.125-127.

২৯. Lenin, Vladimir I., "Preliminary Draft Theses on the National and Colonial Questions," *Selected Work*, x, International Publishers, New York, 1938, p. 236.

৩০. দেখুন, Mao Tse-tung, Selected Works, Foreign Language press, Peking, 1940.

৩১. লেনিন, অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে, ১৪ অক্টোবর, ঢাকা, ১৯২১।

৩২. *প্রাগুক্ত*।

৩৩. *প্রাগুক্ত*।

৩৪. *প্রাগুক্ত*।

৩৫. লেনিন, *গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির দুই রণকৌশল*, গ্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪, পৃ.৬।

৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

৩৭. লেনিন, 'প্রলেতারিয় বিপ্লব ও দলদ্রোহী কাউতস্কি', *বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয় গণতন্ত্র*, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

৩৮. লেনিন, *গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল*, গ্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪, পৃ. ৬-৭।

৩৯. মাও সেতুং কৃত ভাগটি হচ্ছে, ১. বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্বধীন প্রজাতন্ত্র, ২. সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বধীন প্রজাতন্ত্র, ৩. কযেকটি বিপ্লবী শ্রেণির একনায়কত্বধীন প্রজাতন্ত্র।

৪০. দেখুন, ভি. আই. লেনিন, *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, গ্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৬, পঞ্চম অধ্যায়।

৪১. Mao Tse-tung, *'The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party'*, Chapter-5, Selected Works, vol. 2, December, 1939, p. 327.

৪২. Lenin, V. Report on the Unity Congress of the R.S.D.L.P., 1906.

৪৩. ভি. আই. লেনিন, *কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের মূলনীতি*, ভ্যানগার্ড প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৮-৯।

৪৪. মাও মেতুং, *জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে*, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং, ১৯৫৭,পৃ. ৪-৫।

৪৫. দেখুন, মাও মেতুং, *জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান*, নির্বাচিত রচনাবলী, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১।

৪৬. এম আর চৌধুরী, *সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রক্রিয়া*, দি ডলফিন এন্টারপ্রাইজ, ২০১০, পৃ. ১০৪-১০৭।

৪৭. দেখুন, হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১৯।

৪৮. মার্কস-এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', ১৮৪৮, *মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৪৩।

৪৯. *প্রাগুক্ত*।

৫০. সোফিয়া খোলদ, *সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৯০, পৃ. ১০০-১০১ ।

৫১. কার্ল মার্কস, 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা ', *মার্কস এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ২৬-২৭।

৫২. লেনিন, *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ২৬-২৭।

৫৩. স্তালিন, *লেনিনবাদের ভিত্তি ও সমস্যা*, নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূ.), এনবিএ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৯।

৫৪. নৈরাজ্যবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনৈতিক চিন্তার ধারা, যা তার অনুসারীদের মধ্যে এমন চেতনার জন্ম দেয়, যে চেতনা অর্থনৈতিক একচেটিয়াবাদ, রাজনৈতিক এবং সামাজিক নিপীড়নমূলক প্রতিষ্ঠানের বিলয় ঘটিয়ে দিতে চায়, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি মুক্ত সমিতির ফেডারেশনের মাধ্যমে সকল প্রকার উৎপাদন পদ্ধতি পরিচালনা করতে চায়; যার লক্ষ্যই হবে সমাজের প্রতিটি সদস্যের চাহিদা মেটানো, তা কোনোভাবেই প্রচলিত সমাজের স্বল্প সংখ্যক মানুষের সুবিধা ভোগ ও নিয়ন্ত্রণ চলতে দেবে না। প্রচলিত রাষ্ট্রে যে প্রাণহীন যান্ত্রিক আমলাতন্ত্র চলছে তার পরিবর্তে নৈরাজ্যবাদ স্বাধীন, মুক্ত ও প্রাণবন্ত মানুষের সংস্থা গড়ে তুলতে চায়। তবে সকলে সকলের সাথে সামজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এবং স্ব স্ব কর্ম সম্পাদনের জন্য তারা স্বাধীন ও স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির আওতায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

৫৫. Engles, F. *Anti-Duhring*, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 321-322.

৫৬. দেখুন, লেনিন, *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২।

৫৭. Donal F. Busky, *Democratic Socialism: A Golval Survey*, Greenwood Publishing, 2000, p. 12.

৫৮. P. Hain, *Back To The Future of Socialism*, Policy Press, University of Bristol, UK., 2015, p. 13.

৫৯. Ibid, pp. 133-172.

৬০. Nicos Poultantaz, *State, Power, Socialsm,* Verso, London, 2014, pp. 251-266.

৬১. Rosa Luxemburg, *Reform and Revolution*, Militant Publication, London, 1986. p. 37-67.

৬২. গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়, যারা কেবল আপত সমতা এবং উদার সামাজিক বণ্টন ও ব্যায়নির্বাহের কথা না বলে বরং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক, গণতান্ত্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক বিন্যাসের কথা বলেন।

৬৩. জনতুষ্টবাদী সরকার বলা হয় তাদের, যারা প্রগতি, গণতন্ত্র এবং অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা জনসমর্থনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাননির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধান করেন।

৬৪. Anderson and Herr, Gary L. and kathyn G., *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, SAGE Publication, inc. 2007, p. 448.

৬৫. সাম্প্রতিককালের প্রবক্তারা হলেন নিকোলাই বুখারিন, লিও ট্রটস্কি, স্তালিন, আন্তনীয় গ্রামসি, মাও সেতুং প্রমুখ।

৬৬. Gregory and Stuart, Paul and Robert , *Comparing Economic System in the Twenty-First*, South Western College pub, 2003, p. 152.

৬৭. Richard Pipes, *Communism : A History, A Modern Library*, Chronicles Book, USA, 2003, pp, 1-21.

৬৮. J. A. Schumpeter, *Capitalism, Socicalism and Democracy*, Routedge, London and New York, 2003, pp. 296-302.

৬৯. S. Jafar Raza Bilgrami, 'Problems of Democratic Socialism and Democracy', *Indian Journal of Political Science*, 26 (4), 1965, pp. 26-31.

৭০. Theodore Draper, *A Struggle for Power: The American Revolution,* Vintage Books, A division of Randam House, inc., New York, 1997, pp. 3-25.

৭১. R. L. Heilbroner, *An Inquiry into the Human Prospect : Looked at Again for the 1990s,* W. W. Norton & Company, New York and London, 1991, pp. 153-169.

৭২. প্রলয়দেব মুখোপাধ্যায়, *রাষ্ট্র ও রাজনীতি: তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক*, বিজয়া পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২০০।

৭৩. মোহিত ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ ঘোষ, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৪৩।

৭৪. A. Heywood, *Political Theory,* Palgrave, Macmillan, 1994, p. 147.

৭৫. প্রলয়দের মুখোপাধ্যায়, *রাষ্ট্র ও রাজনীতি: তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক*, বিজয়া পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৯৮।

৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯।

## চতুর্থ অধ্যায়

# সংবিধান ও গণতন্ত্র

Constitution is a set of rules governing an organization[১]

**Mairi Robinson**

### ৪.১ ভূমিকা

যে প্রকারের প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন, তার কাজ সুচারুরূপে পরিচালনা করতে হলে প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বা কাঠামো কেমন হবে, সদস্যদের কী অধিকার থাকবে, তাদের কর্তব্য কী ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম-কানুন থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র মানুষের আচরণকে কোনো নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই তার গঠন কী হবে, বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা কীভাবে বণ্টিত হবে, কীভাবে রাষ্ট্রের কাজকর্ম পরিচালিত হবে এবং রাষ্ট্রের নাগরিক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ে কিছু নিয়ম থাকে। এ নিয়মকানুনগুলোকেই শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলা হয়। যে-কোনো রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি কেমন তা সংবিধানের মাধ্যমে জানা যায়। সংবিধান স্থায়ী কোনো বিষয় নয়। এটি পরিবর্তনশীল। সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সংবিধানের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে এল. লিপসন উল্লেখ করেন:

> শাসনতন্ত্র বা সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের তথা প্রশাসনযন্ত্রের গঠনতন্ত্র ও ক্ষমতাবলির একটি মৌলিক প্রকল্প এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহের একটি দলিল। এতেই সন্নিবিষ্ট থাকে এমন কতকগুলো সুবিদিত ও সর্বজনগ্রাহ্য নিয়মকানুন যার আওতার মধ্যেই রাজনীতির লক্ষ্যগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব।[২]

কাজেই বলা যায়, রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবিধান হলো তার মৌল আইন ও বিধিমালার সমন্বিত রূপ। এই অর্থে শব্দটি ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের পরে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। যখন, ধরে নেওয়া হয় যে, ক্ষমতাচ্যুত রাজা দ্বিতীয় জেমস রাজ্যের সংবিধান অমান্য করেছেন (যদিও ব্রিটিশ সংবিধানের কোনো সুস্পষ্ট রূপ অধ্যাবধি দেখা যায় না, এটি জাতীয় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ)। খুব সহজ-সরলভাবে বলা যায় জনগণের মৌলিক অধিকার, সেইসঙ্গে কর্তব্য, সরকারপদ্ধতি, কতৃত্বের ধরন, জনগণের করণীয়, সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও কার্য ইত্যাদি সংবিধানের আওতাভুক্ত। ব্রিটিশ সংবিধান কোনো লিখিত দলিল নয়। তারপরও বলা যায় ব্রিটেনে সংবিধান রয়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সংবিধান লিখিত আকারে

প্রকাশিত হয়েছে। সংবিধান জাতির ইচ্ছার প্রতিফলন; সময়, চাহিদা ও প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতি, রুচি এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। এটি একটি গতিশীল সত্তা। মৌল বিষয়গুলো পৃথিবীব্যাপী মানব সমাজের জন্য প্রায় একরূপ হলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, জীবনাচার পদ্ধতি, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। এজন্য এক দেশের সংবিধান হুবহু অন্য দেশে প্রচলন সম্ভব নয়। সংবিধান সুসভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অনন্য দলিল, সংবিধান ব্যতীত একটি রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না।[৩]

## ৪.২ সংবিধান

যে-কোনো মানবীয় প্রতিষ্ঠান যে লিখিত ও অলিখিত নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। কোনো রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি কিরূপ তা সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়। এজন্য সংবিধানকে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবিও বলা হয়। সংবিধানের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে শাসন করার নৈতিক ভিত্তি ও প্রকৃত ক্ষমতা। প্রত্যেক সংবিধানে তিনটি মৌলিক বিষয়ে স্বীকৃতি আবশ্যক। প্রথমত, যেসব স্বার্থ ও গোষ্ঠী নিয়ে সমাজ গঠিত সেসব স্বার্থ ও গোষ্ঠী সুসংগঠিত করার এবং সেগুলোকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দানের উপায় হলো সংবিধান। দ্বিতীয়ত, সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। সংবিধানই সমাজকে এমন একটি দৃঢ় কাঠামো তৈরি করে দেয় যাকে কেন্দ্র করে সমাজের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। এ রকম একটি কাঠামো বিবেচনা করা হলেই দেখা যাবে যে সংবিধান হচ্ছে প্রশাসনের দায়িত্বসমূহ ও ক্ষমতাবলি এবং নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহের সমাহার সংবলিত একটি দলিল। এটি হচ্ছে প্রশাসনের নিয়মপ্রণালী, শাখা-প্রশাখা ও অঙ্গ-উপাঙ্গের একটি প্রতিকৃতি। কোনো সমাজ তার প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্যে যেসব নৈতিক ও দার্শনিক আদর্শ বাঞ্ছনীয় মনে করে সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকে এই দলিলে। তৃতীয়ত, সংবিধান সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দ্যোতক। সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন ও অন্য সকল আইনের উৎস।[৪] সংবিধান রাষ্ট্রচিন্তার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রচিন্তা বস্তুনিষ্ঠ ও আদর্শনিষ্ঠ উভয়ই হয়। সংবিধানের আইনের দিক নিয়ে আলোচনাকে বলা হয় বস্তুনিষ্ঠ দিক, আর নীতির দিক নিয়ে আলোচনাকে বলা হয় আদর্শনিষ্ঠ দিক। দুটোই রাষ্ট্রের মূল চেতনার সাথে জড়িত।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোই প্রথম রাষ্ট্র, সংবিধান, আইনকানুন বিষয়ক রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেন এবং এ বিষয়গুলোকে দার্শনিক দিক থেকে মূল্যায়ন করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং এজন্য প্রয়োজন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিকদের নৈতিকতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা। আইন মানুষকে সুখী করে, কারণ তা সদগুণ

প্রদান করে। সদগুণের মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞা, সংযম, ন্যায় এবং সাহস। আইন নাগরিকদের সদগুণ তথা নৈতিকতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। আইনকে শুধু নিছক আইন হিসেবে উপস্থাপিত হলেই চলবে না, এর একটা যৌক্তিক ভিত্তি থাকতে হবে এবং তা জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।[৫] আইনপ্রনেতারা আইনের ভিত্তিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। প্লেটো ও এরিস্টটল রাষ্ট্রকে আইনি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনা করে তাঁরা একটি আদর্শ রাষ্ট্রের সংবিধানের ধারণা দেন, যা হবে রাষ্ট্র পরিচালনার আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি। 'মানুষ রাজনৈতিক জীব', 'রাষ্ট্রের মধ্যেই তার পরিপূর্ণ নৈতিক বিকাশ', এ ধারণার প্রবক্তা তাঁরাই। কীভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় বা রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থায়িত্বের ভিত্তি কী—এ সম্পর্কে কতকগুলো আইনগত ও নৈতিক মানদণ্ড প্রদান করে তাঁরা সংবিধানের ধারণার গোড়াপত্তন করেন।[৬] প্লেটো বলেন, "আইনপ্রণেতাকে আইনের যৌক্তিক ভিত্তি তুলে ধরতে হবে" অর্থাৎ, "কীভাবে একজন মানুষ আচরণ করবে, নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে মানুষ কীভাবে আইনসঙ্গত উপায়ে নিজের জীবনকে বিন্যস্ত করবে, তা আইনের নিজের পরম্পরা উপস্থাপন করবে"।[৭] তাঁর মতে, আইনপ্রণেতার কাজ দুটি—জনসাধারণকে আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা এবং আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি বিধান করা। আর এ কাজে "তাঁদের হাতে দুটি যন্ত্র আছে যুক্তিদানের মাধ্যমে প্রত্যয় উৎপাদন এবং শক্তিপ্রয়োগ, যা তাঁরা আইন প্রণয়নের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।"[৮]

শাসনব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই প্লেটো সংবিধান বলেছেন। তিনি মনে করেন, সংবিধানের জন্মদাত্রী আছে, তা হলো রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র, এবং সকল বিধানের জন্ম এ দুটো থেকেই। তিনি ফার্সি রাজতন্ত্রকে রাজতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ এবং এথেনীয় গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্লেটো বলেন, কোনো নগরী যদি এ দুটি দিয়ে গঠিত না হয় তবে তা সুশাসিত নগরী হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। কোনো একটি ব্যবস্থা যদি পুরোপুরি এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রাজতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত থাকে, অথবা অন্য একটি যদি একইভাবে স্বাধীনতার সাথে যুক্ত থাকে, তবে তাদের কোনোটিই সংযম অর্জন করতে সক্ষম হয় না।[৯] তিনি রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয় শাসনব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে বলেন, উভয়ের পতন ঘটে সংযমের অভাবে। কাজেই এদের কোনো একটিকে প্রাধান্য না দিয়ে এ দুয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি আদর্শ সংবিধান তৈরি করাই শ্রেয়। এভাবে প্লেটো রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের একটি মিশ্র সংবিধানের সুপারিশ করেন। *আইনকানুন*-এ প্লেটো আইনকে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করেন। কতিপয় প্রজ্ঞাবান ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্র শাসনের সুপারিশ করেন।[১০]

প্লেটোর মতো এরিস্টটলও রাষ্ট্রব্যবস্থা বা শাসন-ব্যবস্থাকেই সংবিধান বলেছেন। তিনি মনে করেন, সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসমূহের বিন্যাস-ব্যবস্থা। সংবিধান হলো একটি পরিকল্পনা এবং এ পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকে। তাঁর মতে, নগর রাষ্ট্রের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাই সংবিধান।[১১] সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন, এর দুটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে, একটি হলো সৎ বা নৈতিক জীবনযাপন অর্জন করতে সাহায্য করা এবং আরেকটি হলো ব্যক্তির সুখলাভ বা সন্তুষ্টি বিধান করা। এরিস্টটল বলেন, সকল সংবিধান একই নীতি অনুসরণ করে চলে না। কোনো কোনো সংবিধানে শাসকশ্রেণি অভিন্ন স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা করে। এ জাতীয় সংবিধানকে তিনি সঠিক সংবিধান বলেছেন। কোথাও কোথাও শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনে সচেষ্ট থাকে। একে তিনি ভুল বা বিকৃত সংবিধান বলেছেন। শাসকের সংখ্যাকে ভিত্তি করে তিনি সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এরিস্টটলের মতে, শাসন-ক্ষমতা একজন, অল্প কয়েকজন ও বহুজনের ওপর ন্যস্ত থাকতে পারে। একজন, অল্প কয়েকজন বা বহুজন অভিন্ন স্বার্থ বা সমাজের সকলের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যখন শাসনকার্য পরিচালনা করেন তখন তাকে আদর্শ বা সঠিক সংবিধান বলে। একজনের শাসনকে তিনি রাজতন্ত্র, অল্প কয়েকজনের শাসনকে অভিজাততন্ত্র এবং অনেকের শাসনকে পলিটি বলেছেন। ভুল সংবিধানে একজনের শাসনকে স্বৈরতন্ত্র, অল্প কয়েকজনের শাসনকে সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র, এবং বহুজনের শাসনকে গণতন্ত্র বলেছেন। প্লেটোর মতো তিনিও একটি মিশ্র সংবিধানের সুপারিশ করেছেন, যাকে তিনি পলিটি বা মধ্যবিত্তের শাসনব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন। পলিটি বা মধ্যবিত্তের শাসনকে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট সংবিধান বলেছেন।[১২] তাঁর মতে, এ ধরনের সংবিধান ধনী ও গরিবদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে জনগণের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখে, ন্যায়নীতিকে প্রতিফলিত করে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।[১৩] রোমানরাও গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজতান্ত্রিক শাসনের বিলোপ করে প্রজাতান্ত্রিক শাসনের সূত্রপাত করে। রাজতন্ত্রের যুগে জনসাধারণের জন্য কোনো লিখিত আইন বা সংবিধান ছিল না। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের যুগে এসে সর্বপ্রথম আইনের লিখিত সংকলন বা সংবিধান রচনার ভার অর্পণ করা হয়, যা Decimivirate নামে পরিচিত। এ আইনের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে রোমের যাবতীয় আইন-কানুন রচিত হয়েছিল। রোমানরাও গ্রিকদের মতো মিশ্র সংবিধানে বিশ্বাসী ছিলেন। পলিবিয়াসের মতে, একটি বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থা কখনও সমাজের সকলের মঙ্গল সাধন করতে পারে না। এরিস্টটলের মতো তিনি সরকারকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র। তিনি মনে করেন, কতকগুলো ত্রুটির কারণে পৃথকভাবে কোনো শাসনব্যবস্থাই স্থিতিশীল হতে পারে না। কাজেই সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন এই তিন প্রকারের মধ্যে মিশ্রণ। অর্থাৎ রাজা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। পরামর্শদাতারা আসবেন অভিজাত সম্প্রদায় থেকে এবং আইনসভা গঠিত হবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে। এ

ধরনের মিশ্র সংবিধানের জন্যই রোম ইউরোপে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে পলিবিয়াস মিশ্র সংবিধানের রাষ্ট্রদর্শনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের যে মত প্রতিষ্ঠা করেন আজও তা প্রাসঙ্গিক।[১৪]

প্রাচীন গ্রিস ও রোমের রাষ্ট্রদর্শনে সংবিধান বিষয়ে যে ধারণা ছিল তা আধুনিককালের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উৎস বলে মনে করা যায়। প্রাচীন গ্রিসে সংবিধান বলতে রাষ্ট্রকেই বোঝানো হতো, রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র কোনো বিষয় হিসেবে সংবিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কিন্তু আধুনিককালেই সংবিধান রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে, রাষ্ট্র পরিচালনার লিখিত দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিককালে এ ধারণার সূত্রপাত করেন ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক। *Two Treatise of Civil Government* নামক গ্রন্থে তিনি সংবিধানকে একটি রাষ্ট্রদার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান, যাকে সংবিধানতন্ত্র বলা হয়। জন লককে তাই সংবিধানতন্ত্রের জনক বলা হয়। তাঁর মতে, আইনসভা (সংসদ) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী সংস্থা এবং আইনসভা সংবিধান বা লিখিত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য আইনসভা সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করবে। বিচারকদের মতামত, স্বীকৃত প্রথা ও প্রতিষ্ঠিত আইন ইত্যাদির দ্বারা আইনসভা শাসনকার্য পরিচালনা করবে। সর্বোপরি দেশে যে সমস্ত লিখিত আইন তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে তাদের সাহায্য নিয়ে শাসন করবে। আইনসভা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও তাকে লিখিত আইনের গণ্ডির মধ্যে থাকতে হবে। লকের এ তত্ত্বকেই সংবিধানতন্ত্র বলা হয়। ব্রিটেনে তিনি এ সংবিধানতন্ত্র প্রবর্তন করেন। আইনসভাকে সংবিধান বা লিখিত আইন অনুযায়ী চলতে হবে। লক প্রবর্তিত সংবিধানতন্ত্রের এ ধারণা বিশ্বব্যাপী সংসদীয় বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে, যা আজও কার্যকর রয়েছে। লককে সাংবিধানিক সরকারের জনক বলে অভিহিত করা হয়।[১৫] লকের রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাবে উনিশ শতকের উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তা বিস্তার লাভ করে, যা রাজনীতিতে যুক্তিবাদিতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। উদারনৈতিক রাষ্ট্রদার্শনিকেরা রাষ্ট্রক্ষমতার ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, সংবিধান, আইন ও শাসনক্ষমতা সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব হাজির করেন, রাষ্ট্র ও রাজনীতির নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করেন। এভাবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে ভোটাধিকার, সংবিধান, আইন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংস্কার সাধিত হয়।[১৬] উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাত্ত্বিক দিক থেকে রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক জনগণ, কিন্তু প্রায়োগিক দিক থেকে রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক ধনিক-বণিক শ্রেণি। ধণিক-বণিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে মার্কসবাদ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করে। মার্কস প্রবর্তিত এ ব্যবস্থা শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী। মার্কসবাদীরা এ ব্যবস্থাকে যথার্থ গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থা বলে মনে করেন। তবে রাষ্ট্র, রাজনীতি, সংবিধান, আইন, আমলাতন্ত্র এসব বিষয়ে মার্কস কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত তত্ত্ব দেননি। মার্কসের কাছে গণতন্ত্র রাজনৈতিক ধারণার চেয়েও বেশি কিছু। প্রকৃত গণতন্ত্র মানে জনগণের গণতন্ত্র, যাতে জনগণের সার্বভৌমত্ব থাকে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, জনসার্বভৌমত্বের মধ্যে রাষ্ট্র অবস্থান করে। মার্কস গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের জায়গায় স্থাপন করেন এবং মানুষকে গণতন্ত্রের স্থপতি হিসেবে দেখেন। তাঁর কাছে গণতন্ত্রে আইন মানুষের জন্য, মানুষ আইনের জন্য নয়।[১৭]

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংবিধানের সংজ্ঞা প্রদান করেন। এরিস্টটল সংবিধানকে জীবন-পদ্ধতি বলেছেন, যা রাষ্ট্র স্ব-ইচ্ছায় বেছে নেয়। তিনি বলেন, "সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হচ্ছে ক্ষমতার পদগুলিকে বণ্টন করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বিশেষ।"[১৮] সি. এফ. স্ট্রং তাঁর *Modern Constitutions* গ্রন্থে লিখেছেন, "শাসনতন্ত্র হচ্ছে সে-সব নিয়ম-কানুনের সমষ্টি যা দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে।"[১৯] কে. সি. হুইয়ার বলেন, "শাসনতন্ত্র হলো বৈধ বিধানাবলির একটা সংগ্রহ, যা অনুসরণ করে দেশের সরকার পরিচালিত হন। আর এই বিধানগুলো পাওয়া যাবে একটা মূল্যবান দলিলে।"[২০] তিনি মনে করেন, অধিকাংশ দেশের সরকার-পদ্ধতি আইনের দুটি ধারার (আইনসম্মত এবং অতি-আইনি) সুন্দর সংমিশ্রণ, আর এ বিধানগুলোর সংগ্রহ বা সংকলনকে 'শাসনতন্ত্র' বলা চলে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সংবিধান এক নয়। রাষ্ট্রসমূহ তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও নানাবিধ বিষয়াবলির নিরিখে নিজ নিজ রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করে থাকে, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহ পরিচালিত হয়। এক কথায় সংবিধান হলো রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি যা রাষ্ট্র বা সরকারের যথাযথ স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

সংবিধান দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়: ব্যাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লিখিত বা অলিখিত সব রকমের নিয়ম-কানুনকে বোঝায়। এ ক্ষেত্রে লিখিত নিয়ম-কানুন অর্থে আইন এবং অলিখিত নিয়ম-কানুন অর্থে প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি, আচারব্যবস্থা প্রভৃতিকে বোঝানো হয়। সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান বলতে কতকগুলো লিখিত মৌলিক আইন-কানুনকে বোঝায়, যেগুলোর ভিত্তিতে সরকারের গঠন, সরকারের বিভাগসমূহের সংগঠন, ক্ষমতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক যে-কোনো সাধারণ আলোচনায় শাসনতন্ত্র কথাটা অন্তত দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, এটি একটি দেশের গোটা সরকার-কাঠামো বর্ণনা করার জন্য কাজে লাগে। অর্থাৎ যে বিধানগুলো দ্বারা সরকার

গঠন ও পরিচালিত বা শাসিত হয় তাকে বোঝায়। এই বিধানগুলো অংশত আইনসম্মত, এই অর্থে যে বিচারসভাগুলো এগুলোকে স্বীকার এবং প্রয়োগ করবে, আবার অংশত বৈধ নয়, কিংবা বলা যায় অতি-আইনি; এগুলো আচার, বোঝাপড়া, প্রথারূপে পাওয়া যায়, কিন্তু বিচারসভা এগুলোকে আইন হিসেবে স্বীকার করেন না কিন্তু সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলো কম কার্যকর নয়। আইনি অনুশাসনের ক্ষেত্রে এগুলো প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ।[২১] গেটেল বলেন:

> রাষ্ট্রের গঠন নির্ধারণকারী মৌলিক নীতিগুলোকে সংবিধান বলে। রাষ্ট্র সংগঠনের পদ্ধতি, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন, সরকারি কার্যাবলি সম্পাদনের সুযোগ ও পদ্ধতি এবং সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক যাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয় তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত। সংবিধান রাষ্ট্র তৈরি করে না তবে এটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বাহ্যিক কাঠামো।[২২]

## ৪.৩ সংবিধানের উৎসসমূহ

*প্রচলিত রীতিনীতি ও আচারপ্রথা*: প্রাচীনকাল থেকে জীবনব্যবস্থার যেসব রীতিনীতি ও আচারপ্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে, সেগুলো যখন কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন বা স্বীকৃতি লাভ করে, তখন সেগুলো সংবিধানের রীতিনীতি হিসেবে গণ্য হয়। ব্রিটিশ সংবিধানের একটি বড় অংশ এ ধরনের প্রচলিত রীতিনীতির অংশ।

*মৌলিক দলিল*: কোনো কোনো সংবিধানের উৎস মৌলিক দলিল। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে ফিলাডেলফিয়ায় আমেরিকার সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রস্তাবের ভিত্তিতে আমেরিকার সংবিধানের মৌলিক ধারাগুলো দলিল হিসেবে লিখিত হয়।

*বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত*: অনেক সময় বিচারকগণ উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রচলিত বিধানের বাইরে মামলা নিষ্পত্তির জন্য নিজস্ব মেধা ও বিবেকের দ্বারা কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসব সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে উত্তরসূরীরা গ্রহণ ও অনুসরণ করেন। এভাবে বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তসমূহ আইনে পরিণত হয়।

***সনদ***: সনদ সংবিধানের একটি অন্যতম উৎস। ব্রিটিশ সংবিধানে দেখা যায়, ব্রিটেনের রাজন্যবর্গ কতকগুলো ঐতিহাসিক দলিল ও সনদের মাধ্যমে নাগরিকদের কিছু অধিকার স্বীকার করে নেয়। যেমন

১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদনপত্র, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল ইত্যাদি।

*আইন বিশেষজ্ঞদের রচনাবলি*: সংবিধান প্রণয়নের সময়ে রাষ্ট্রের প্রখ্যাত আইনবিদদের রচিত গ্রন্থাবলি থেকে বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাষ্ট্র ও সরকার-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত সংবিধানে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

*বিধিবদ্ধ আইন*: রাষ্ট্রের সাংবিধানিক সংকট নিরসনের জন্য আইনসভা কতকগুলো বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করে। যেমন জনগণের ভোটাধিকার, নির্বাচন পদ্ধতি, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষমতার এখতিয়ার প্রভৃতি বিষয়ে আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত আইনসমূহ সংবিধানের উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানেও সংবিধানের কোনো আইন সংশোধন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আইনসভার অনুমোদনকৃত আইনসমূহ সংবিধানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

*সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি*: সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সংবিধানের উৎস হিসেবে গণ্য হয়। সংশোধন পদ্ধতি অনুসারে সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী পাস করা হয়।

*পার্লামেন্টের আইন*: পার্লামেন্টের সদস্যরা যে সকল সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করেন সেগুলো আইনের মতো প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোও সংবিধানের অংশবিশেষ।

*প্রামাণ্য পুস্তকসমূহ*: সংবিধান সম্পর্কে রচিত প্রামাণ্য পুস্তকসমূহ অনেক সংবিধানের অন্যতম উৎস হতে পারে। এসব প্রামাণ্য পুস্তকের মধ্যে ওয়ালটার বেজহটের *ইংল্যান্ডের সংবিধান*, অ্যানসনের *সংবিধানের আইন ও রীতিনীতি*, ডাইসির *সংবিধানের আইন* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

*ধর্মগ্রন্থ:* প্রতিটি রাষ্ট্রেই কমবেশি বিধিবিধান তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করে। অনেক সময় ধর্মীয় নেতাদের নীতি আইন হিসেবে সংবিধানে গৃহীত হয়।

*গণপরিষদ:* অনেক সময় গণপরিষদকেও সংবিধানের উৎস বলা হয়। যেমন : বাংলাদেশে গণপরিষদ সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য খসড়া সংবিধান কমিটি গঠন করে।

## ৪.৪ সংবিধান প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান একই নিয়মে বা একই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এক এক দেশের সংবিধান এক এক প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে। তবে সংবিধান সব সময় গতিশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। হঠাৎ করে কোনো রাষ্ট্রে সংবিধান সৃষ্টি হয় না। সংবিধান সৃষ্টির পেছনে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বাধীনতা লাভের পর্যায় ও প্রক্রিয়া, ভাষা, ধর্ম সবকিছুই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অধ্যাপক গেটেল[২৩] সংবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য চারটি পদ্ধতির কথা বলেন:

১. মঞ্জুরির দ্বারা (by grant)

২. পরিকল্পনার দ্বারা (by deliberate creation)

৩. বিপ্লবের দ্বারা (by revolution)

৪. বিবর্তনের দ্বারা (by gradual evolution)

### *৪.৪.১ মঞ্জুরির দ্বারা সংবিধান প্রতিষ্ঠা*

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। রাজা বা রাজন্যবর্গের হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল। এ সকল নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাচারী শাসকের আদেশ-নির্দেশেই রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। রাজার আদেশই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন এবং তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র শাসক। এ অবস্থায় জনগণের অধিকার বিপর্যস্ত ও সীমিত ছিল। সময়ের পরিবর্তনে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন এবং তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা পেতে সোচ্চার হন। রাজা, রাজন্যবর্গ গণবিপ্লব বা গণঅসন্তোষের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের কঠোর হাতকে শিথিল করেন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান এবং জনগণের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির জন্য সংবিধান প্রণয়ন করেন। একটি আইনগত দলিলে কতকগুলো নীতির আলোকে ক্ষমতা ব্যবহারের কথা ভাবেন। এভাবে রাজার মঞ্জুরির ফলে অথবা

তার আদেশক্রমে অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণীত হয়েছে। এইরূপ দানকৃত সংবিধানই হলো মঞ্জুরির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংবিধান। ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক স্বাক্ষরিত 'ম্যাগনাকার্টা' মঞ্জুরিকৃত আইন। জনগণের অধিকার সম্বলিত এই আইন ব্রিটিশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এভাবে ১৯০৮ সালে চীনা সম্রাটের সংবিধান, নেপালের রাজা মহেন্দ্রর সংবিধান মঞ্জুরির দ্বারা গৃহীত হয়েছে। আফগানিস্থানের বাদশাও দেশবাসীকে এভাবে শাসনতন্ত্র দান করেছিলেন।

### *৪.৪.২ পরিকল্পনার দ্বারা সংবিধান প্রতিষ্ঠা*

গেটেল বলেন, একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর স্বেচ্ছায় অনেকগুলো সংবিধান তৈরি করা হয়।[২৪] অনেক রাষ্ট্রেই আলাপ-আলোচনা ও পরিকল্পনার দ্বারা সংবিধান রচিত হয়েছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলো অন্য রাষ্ট্রের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পর নিজস্ব সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ কারণে সংবিধান রচনার প্রয়োজনে বিশেষভাবে সংগঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরিষদ, নির্বাচিত প্রতিনিধি বা তাদের বিশেষ কমিটিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এসব সংগঠন তাদের সুচিন্তিত আলাপ-আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সংবিধান রচনা করে থাকে। আধুনিক সভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতিতেই সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। সংবিধান প্রণয়নের এ পদ্ধতিকে ইচ্ছাকৃত রচিত সংবিধানও বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রে এভাবেই সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

### *৪.৪.৩ বিপ্লবের দ্বারা সংবিধান প্রতিষ্ঠা*

কখনও কখনও বিপ্লবের মাধ্যমে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লব তখনই ঘটে, যখন প্রচলিত সরকারের অত্যাচার ও উৎপীড়নে জনগণ অতিষ্ঠ থাকে, নির্যাতিত জনগণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারকে বিদায় জানাতে না পারলে বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করে। এ রকম সংকটের সময় বিপ্লবী পরিষদ নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। এ প্রসঙ্গে গেটেল বলেন, "যখন জনগণ বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং আইনগত উপায়ে এটি পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না তখন এটি ঘটে।"[২৫] আবার অনেক সময় সংবিধানের বিষয়টি গণপরিষদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। গণপরিষদ সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে জনগণের অনুমোদন গ্রহণ করে। ১৯১৭ সালে রাশিয়া, বর্তমানে স্পেনে উক্ত পদ্ধতিতে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

### *৪.৪.৪ বিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান প্রতিষ্ঠা*

যে-কোনো দেশের সংবিধানে সেই দেশের রীতি-নীতি, প্রথা, লোকাচারের স্পষ্ট ছাপ থাকে। বহুদিন ধরে প্রচলিত এ সকল রীতি-নীতি ক্রমান্বয়ে সংবিধানের অংশ হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন সর্বদা পরিবর্তনশীল। তাই কালের গতিধারায় প্রথা, অভ্যাস, লোকাচার বিবর্তিত হয়ে সমাজ-জীবনের অত্যাবশ্যক আইনে পরিণত হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠিত সংবিধানকে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সংবিধান বলা হয়। গেটেলের মতে: "এ ধরনের সংবিধান মূলত অলিখিত বা একক সর্বাঙ্গীণ বিবৃতি না দিয়ে একাধিক নথিতে প্রদর্শিত হয়।"[২৬] ব্রিটিশ সংবিধান বিবর্তন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ কারণেই বলা হয়, ব্রিটেনের সংবিধান গড়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং বলা যায়, "সাংবিধানিক সিদ্ধান্তগুলো যোগ্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত, যা বৈধ ব্যাখ্যার পদ্ধতি অনুসরণ করে ও মেনে চলে। সাংবিধানিক আলোচনার বিস্তৃতি সুদূরপ্রসারী, যা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের মতো একাধিক শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়কে একত্রিত করে।"[২৭]

## ৪.৫ সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য সংবিধানের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। লর্ড ব্রাইস প্রচলিত নিয়মে সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, যথা:

১. লিখিত ও অলিখিত সংবিধান

২. সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

সংবিধানের লিপিবদ্ধকরণের প্রকৃতি ও পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সংবিধানকে লিখিত ও অলিখিত এবং এর সংশোধনের ওপর ভিত্তি করে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়—এ শ্রেণিবিভাজন করা হয়েছে।

### *৪.৫.১ লিখিত সংবিধান*

লিখিত সংবিধান হলো সেই সংবিধান যেখানে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলোকে এক বা প্রকাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এরূপ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সকল সূক্ষ্ম দিক, ধারা-উপধারা এবং সকল প্রকার রীতিনীতি লিপিবদ্ধ থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচালনার বেশিরভাগ দিক, বেশিরভাগ ধারা-উপধারা, রীতি-নীতি লিখিত থাকে। এ প্রসঙ্গে গেটেল বলেন: "লিখিত সংবিধানে

সরকার বা সংস্থার মৌলিক নীতিগুলোর বেশিরভাগই একটি নিয়ম বা ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে।"[২৮] অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংবিধান রচিত হয়েছে; তা প্রায় সবই লিখিত সংবিধান, লিখিত সংবিধানের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও প্রাচীন উদাহরণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। এছাড়াও ভারত, ফ্রান্স, রাশিয়া, কানাডা, চীন, জাপান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের সংবিধানও লিখিত। লিখিত সংবিধান হয় সুস্পষ্ট। এখানে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত থাকে। জনগণের মৌলিক অধিকার সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এ সংবিধানে সরকারের সকল বিভাগের ক্ষমতা লিপিবদ্ধ থাকে। যে কারণে সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করে। লিখিত সংবিধান ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক, এখানে বাস্তব ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটে।

### *৪.৫.২ অলিখিত সংবিধান*

কোনো রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার মৌলিক নিয়মগুলো যখন প্রথা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তখন তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ দিকই প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। এরূপ সংবিধান তৈরি হয় না, গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে গেটেল উল্লেখ করেন:

> লিখিত সংবিধানে সরকারি সংস্থার অধিকাংশ মৌলিক নীতিগুলো চূড়ান্তভাবে লিখিত আকারে বা মৌলিক নথিতে মূর্তমান হয় না, বরং এটি বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত রীতিনীতি, ব্যবহার, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত এবং আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত। এটি সংবিধান গঠনের কোনো সংস্থা দ্বারা তৈরি হয় না বরং এটি রাষ্টের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলাফল।[২৯]

এখানে আইন প্রণেতাগণ সংবিধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেননি এবং এর ফলে সাংবিধানিক আইনকে অন্য প্রকার আইন থেকে পৃথক করা যায় না। এটি ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফল। এটি দলিলে লিখিত হয় না। আইভর জেনিংস বলেন: "সংবিধান বলতে যদি লিখিত কোনো দলিলকে না বুঝিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয় তাহলে বলতেই হবে যে, ব্রিটিশ সংবিধানের উদ্ভাবন আপোসে হয়েছে, এর কোনো দলিল নেই।"[৩০]

ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত। অলিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায়। সমাজের প্রগতির সাথে এ সংবিধানও পরিবর্তিত হয়। এখানে বিপ্লবের আশংকা কম থাকে। অলিখিত সংবিধান পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। এ সংবিধান বেশ জনপ্রিয়। সরকার সহজেই জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার

অনুকূলে সংবিধানের সংশোধন করতে পারে। দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ও ব্যবহারিক বিচারে অলিখিত সংবিধান সমর্থনযোগ্য। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাগুলোকে ভিত্তি করে অলিখিত সংবিধান সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে বলে তা জাতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টিতে অবদান রাখে। এ সংবিধানে সহজে জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়। কারণ এ সংবিধান দেশ ও দেশবাসীর প্রয়োজনে গড়ে ওঠে। অলিখিত সংবিধানে রাষ্ট্রের সর্বসময় কর্তৃত্ব আইনসভার হাতে থাকে। আইনসভা অলিখিত সংবিধানের যে-কোনো অংশ যে-কোনো সময় সংশোধন বা বাতিল করতে পারে। গেটেলের মতে, "লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য মাত্রাগত, মূলগত নয়।"[৩১] অলিখিত সংবিধানের যেমন অনেক লিখিত দিক রয়েছে, তেমনি লিখিত সংবিধানেরও অনেক অলিখিত দিক রয়েছে। তবে এ সংবিধানের ব্যবহারিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। লিখিত সংবিধানের বিধিবদ্ধ অংশকে ভিত্তি করেই অলিখিত অংশের সৃষ্টি হয়।

### *৪.৫.৩ সুপরিবর্তনীয় সংবিধান*

সংবিধানে উল্লেখিত যে প্রক্রিয়ায় দেশের সাধারণ আইন পাসের প্রয়োজন, ঠিক সেই একই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যদি সংবিধানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাহলে এ সংবিধান প্রগতির সহায়ক। এটি পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। এ সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। এটি পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। উন্নয়নশীল সমাজের জন্য এ সংবিধান সুবিধাজনক। এ ধরনের সংবিধানে সহজে পরিবর্তন এনে জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করা সম্ভব। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান পরিবর্তনশীল বিধায় জনগণকে বিপ্লব করতে হয় না। এ সংবিধানে শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি অলিখিত থাকে। বলা যায়, সুপরিবর্তনীয় সংবিধান পরিপূর্ণ। এ সংবিধানে সরকারের যে সমস্ত দোষত্রুটি থাকে, তা সহজেই সংশোধনযোগ্য। গেটেল বলেন, "যদি সংবিধান সাধারণ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং পদ্ধতি দ্বারা সহজেই সংশোধন করা যায় তবে এটিকে নমনীয় হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে।"[৩২]

### *৪.৫.৪ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান*

যে সংবিধান সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য দেশের প্রচলিত সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতি ব্যতিরেকে ভিন্নতর কোনো বিশেষ বা জটিল পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয় তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে। সাধারণ আইন পাসের নিয়ম ছাড়া যদি দেশের সাংবিধানিক আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা

সংশোধনের প্রয়োজনে সংবিধানে বিকল্প বা ভিন্নতর কোনো নিয়ম বা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ থাকে, তবে সে-সংবিধানে বিধৃত সে-বিকল্প বা ভিন্নতর নিয়ম বা পদ্ধতিই জটিল বা বিশেষ পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। কারণ হলো আমেরিকার কংগ্রেস সাধারণ আইনের ন্যায় সংবিধানের সংশোধন করতে পারে না। এক্ষেত্রে বিশেষ বা জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। গেটেলের মতে: "সংবিধানের সাধারণ আইন গঠনের তুলনায় যদি সংশোধনীর জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা আরও জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয়, এটি অনমনীয় হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হতে পারে।"[৩৩]

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ়। এ সংবিধান পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি হয়। তারা সব সময় লক্ষ রাখেন যাতে সংবিধানে দেশের ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। যে-কোনো রাজনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থায়ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান স্থিতিশীল থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ সংবিধানের মাধ্যমেই কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা সম্ভব। এখানে শাসনতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। এ সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকার কারণে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষিত থাকে।

### ৪.৬ সাংবিধানিক সরকার

সাধারণ অর্থে সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক সরকার বলতে সংবিধানের প্রতি অনুগত বা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত সরকারকে বোঝায়। কিন্তু সকল সরকারকেই সাংবিধানিক সরকার বলা যায় না। সাংবিধানিক সরকারে রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের ক্ষমতা সাংবিধানিক বিধি-নিষেধ মোতাবেক ব্যবহার করে। এখানে শাসকের ক্ষমতা সংবিধানের আইন, জনগণের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এ ব্যবস্থা শাসক ও শাসিতের কাছে তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়বদ্ধ। এখানে জনগণের মুখপাত্র বা প্রতিনিধি হিসেবে সরকার রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় আইনের অনুশাসনের দ্বারা সরকারের ক্ষমতা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে স্বৈরশাসকের উত্থান ঘটতে পারে না, জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে। এটি ব্যক্তির ইচ্ছাধীন সরকার নয়। সাংবিধানিক সরকারের ক্ষমতা সীমিত থাকায় এ সরকারকে সীমাবদ্ধ সরকার বলা হয়। এ প্রসঙ্গে কে. সি. হুইয়ার বলেন:

> শাসনতান্ত্রিক সরকারের তাৎপর্য শাসনতন্ত্রের শর্তাবলি মেনে চলা সরকার থেকে বিস্তৃততর। শাসনতান্ত্রিক সরকার বিধান মোতাবেক চলে, স্বেচ্ছাচারী সরকার এটা নয়। এই সরকার শাসনতন্ত্রের শর্তাবলি দ্বারা সীমাবদ্ধ, যারা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাদের বিচিত্র অভিলাষ ও সামর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।[৩৪]

সুতরাং সাংবিধানিক সরকার হলো এমন সরকার যেখানে জনগণের স্বাধীনতা ও ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে।

### *৪.৬.১ সাংবিধানিক সরকারের বৈশিষ্ট্য*

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সংবিধান রয়েছে। কিন্তু সংবিধান থাকলেই কেবল সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। সাংবিধানিক সরকারের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. আইনের দ্বারা লিখিত সরকার: সাংবিধানিক সরকার আইনের দ্বারা লিখিত সরকার। এ ব্যবস্থায় সরকারের কার্যাবলি, ক্ষমতা ও সাংবিধানিক রীতিনীতি সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সীমাহীন স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের কোনো সুযোগ সাংবিধানিক সরকারে থাকে না।

২. স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই: সাংবিধানিক সরকার সংবিধানের বিধানাবলিকে যথাযথ মেনে চলে। সংবিধানের বিধিবর্হিভূত কোনো কাজ বা স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ সাংবিধানিক সরকারের নেই। এ কারণে এই সরকার গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল।

৩. স্থিতিশীল: জনমত ও জনসমর্থনের আলোকে গঠিত এ সরকার খেয়ালখুশি মতো পরিচালিত হতে পারে না। সুনির্দিষ্ট নিয়মে পারিচালিত সরকার স্বাভাবিকভাবেই স্থিতিশীলতা লাভ করে।

৪. ব্যক্তির সরকার নয়: সাংবিধানিক সরকার রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং এটি কতকগুলো সুস্পষ্ট নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলো রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং যাদের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ দিক থেকে সাংবিধানিক সরকার ব্যক্তিগত সরকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৫. সর্বোচ্চ ও মৌলিক আইন: সংবিধানই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও মৌলিক আইন। বিচারবিভাগ সংবিধানের হেফাজতকারী হিসেবে কাজ করে। সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী এ ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা বণ্টনের রূপরেখা নির্ণয় করা হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতিমালা এখানে নির্ধারণ করা থাকে। যার ফলে সরকার পরিচালনা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর হয়।

৬. স্বচ্ছতা বজায় রাখা: সাংবিধানিক সরকার তার কার্যপ্রণালীর স্বচ্ছতা বজায় রাখে। সরকার তার কার্যক্রম জনসমক্ষে তুলে ধরে এবং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে দায়িত্ব পালন করে। সাংবিধানিক সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকে। মৌলিক অধিকার হিসেবে সংখ্যালঘুর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে।

৭. গণতান্ত্রিক সরকার: সাংবিধানিক সরকার বলতে গণতান্ত্রিক সরকারকেই বোঝায়। যেহেতু এখানে গণতন্ত্রের অবাধ চর্চার পথ প্রশস্ত, সে-কারণে এ সরকারে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ সরকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষমতা ও প্রভাবের ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অবাধ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকায় দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

৮. পরিবর্তনশীলতা: সাংবিধানিক সরকার প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল। সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীলতা ও গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার-ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন সাধন করা হয়। এ ধরনের পরিবর্তন সমাজে কাম্য। এরূপ পরিবর্তন সামাজিক অগ্রগতি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।

৯. ভারসাম্য: সাংবিধানিক সরকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ ভারসাম্য রক্ষা করা অবশ্যম্ভাবী নয়। সরকার রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে এ সকল বিভিন্ন স্বার্থকামী গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করে।

১০. বিচার বিভাগের প্রাধান্য: সাংবিধানিক সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিচার বিভাগের প্রাধান্য। বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে তা সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা নির্ধারণ করে।

১১. দায়িত্বশীলতা: সাংবিধানিক সরকার সবসময় জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থেকে জনস্বার্থের অনুকূলে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

১২. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: সাংবিধানিক সরকার-ব্যবস্থায় ক্ষমতা জাতীয় এবং আঞ্চলিক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। কেননা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা অধিকাংশ সময় স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দেয়।

সাংবিধানিক সরকারের গঠন পদ্ধতি, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত থাকে। এ ধরনের সরকার গণতান্ত্রিক সরকার। গণতন্ত্রই এ সরকারের অপরিহার্য শর্ত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা এ সরকারের প্রধান লক্ষ্য। বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি উন্নত দেশে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে সাংবিধানিক সরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

### *৪.৬.২ উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য*

সাংবিধানিক সরকার-ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমেই একটি দেশের সার্বিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি একটি দেশের প্রধান ও পবিত্রতম বিধান, যার মাধ্যমে জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রীয় স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। যে-দেশের সংবিধান যত উন্নত ও আদর্শমুখী সে-দেশ এবং জাতি তত উন্নত এবং আদর্শ স্থানীয়। সুতরাং উত্তম সংবিধান যে-কোনো দেশের জন্য অপরিহার্য। উত্তম সংবিধান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। একটি উত্তম সংবিধানের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা নিম্নরূপ:

**প্রথমত:** উত্তম সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। এতে সমাজের মৌলিক দাবিগুলো সুনির্দিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। লিখিত হলে এটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে পারে। সংবিধানের ধারাগুলো সম্পর্কে মতানৈক্যের সুযোগ থাকলে বা অর্থ নিয়ে মতান্তর ঘটলে এর উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা নিয়ে প্রায়শই বিবাদ বা বিসংবাদ চলতে থাকে। এর ফলে শাসনব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। গেটেল বলেন, "দ্বন্দ্ব বা বিরোধ এড়াতে সংবিধান কী বা এর অর্থ কী তা নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। সেজন্য শাসনতন্ত্র হবে লিখিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।"[৩৫]

**দ্বিতীয়ত:** সংক্ষিপ্ততা উত্তম সংবিধানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। এটার বিভিন্ন ধারা, উপধারা সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার, যাতে এটার মধ্যে অথবা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অনুপ্রবেশ না ঘটে। অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ করে সংবিধানকে ব্যাপক না করাই ভালো।

**তৃতীয়ত:** উত্তম সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়িত্ব। সংবিধানের মূলনীতি যাতে সাময়িক ভাবাবেগ বা উত্তেজনাবশত পরিবর্তন করা না যায়, সেজন্য এটা খুব সুপরিবর্তনীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই। সংবিধান কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া উচিত, যাতে কেবল জনগণের সত্যিকারের প্রয়োজনেই তা সংশোধন করা

যায়। সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হলেও এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা উচিত। কারণ স্থায়ী সংবিধান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সহায়ক।

**চতুর্থত:** উন্নত সংবিধান কিছুটা ব্যাপক হবে। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ-পদ্ধতি, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের রূপরেখা প্রভৃতি সম্পর্কে বিধিবিধান সংবিধানে উল্লেখ থাকা উচিত। গেটেলের মতে, একটি সংবিধান সর্বাঙ্গীণ হওয়া উচিত, এতে সরকারের পুরো ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।[৩৬]

**পঞ্চমত:** উত্তম সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকলে সরকার কখনও স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। শাসনবিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করতে চাইলে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র ভাঙ্গার অভিযোগ আনতে পারে। ফলে সরকারের স্বৈরাচারী প্রবণতা রুদ্ধ হয়। জনগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। সুতরাং মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তি উত্তম সংবিধানের একটি বিশেষ দিক।

**ষষ্ঠত:** সময়োপযোগিতা উত্তম শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উত্তম শাসনতন্ত্রকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। জনগণের চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষারও পরিবর্তন ঘটে। সংবিধানকে অবশ্যই জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে। অন্যথায় সংবিধানের বিধিবিধান ও উদ্দেশ্যের সাথে জনগণের ইচ্ছার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখা দেবে। ফলে বিপ্লব দেখা দিতে পারে।

**সপ্তমত:** উত্তম শাসনতন্ত্র সার্বভৌম ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। এটি রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমত্ব, সরকার, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও জনগণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। অন্যথায় গণ-অভ্যুত্থানের ভয় থাকে।

**অষ্টমত:** উত্তম শাসনতন্ত্র সামাজিক ঐতিহ্য ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই একটি দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পরিচয় লাভ করা যায়। এর মাধ্যমেই জাতির স্বকীয়তা ও মৌলিকতা ফুটে ওঠে।

**নবমত:** উত্তম সংবিধানে বিচার বিভাগের প্রাধান্য থাকে। বিচার বিভাগের হাতে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বিচার বিভাগকে নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত নয়, এবং এটিকে নির্দ্বিধায়, নির্ভয়ে বা পক্ষপাতহীনভাবে জনগণের মৌলিক অধিকারের অভিভাবক হিসেবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেয়া উচিত।

**দশমতঃ** সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতি খুব সহজ বা খুব কঠিন দুটোর কোনোটি হওয়াই উচিত নয়। সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতি যদি খুব সহজ হয় তাহলে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর হবে। আবার সংবিধান খুব বেশি দুষ্পরিবর্তনীয় হলে সমাজের পরিবর্তনের সাথে তাল রক্ষা করে চলতে পারে না।

সুতরাং উত্তম সংবিধান যে-কোনো রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উত্তম সংবিধানের অভাবে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিতে পারে। কাজেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনের জন্য রাষ্ট্রের একটি উত্তম সংবিধানের প্রয়োনীয়তা অনস্বীকার্য।

## ৪.৭ সংবিধান ও গণতন্ত্র

সংবিধানের বিষয়বস্তুর প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে গণতন্ত্রের নিজস্ব মতামত থাকলেও এ বিষয়ে গণতন্ত্র যে কয়েকটি নতুন প্রশ্নের অবতারণা করে, যা সকল সংবিধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, গণতান্ত্রিক সংবিধান সে-প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যেতে পারে না। সেজন্য প্রথমেই আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধানের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে এরিস্টটলের বক্তব্যটি বিবেচনা করা যেতে পারে। এরিস্টটল মনে করতেন যে, ধন ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। কাজেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংবিধান উভয়ের ওপরেই সমাজের যে প্রভাব রয়েছে তার পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিবিন্যাসকরণ সম্ভব। কিন্তু তিনি শুধু সামাজিক শ্রেণি-বৈচিত্র্যের আলোকে সংবিধানের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, ধনবণ্টনে বৈষম্যের গুরুত্বের ওপরও তিনি আলোকপাত করেন। অতি ধনী কিংবা অতি দরিদ্র লোকদের পক্ষে সবসময় আইন মেনে চলা সম্ভব হয় না বলে তিনি মনে করতেন। কারণ, অতি ধনীরা তাদের ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তির রক্ষাবর্মের অন্তরালে থেকে শাস্তির তোয়াক্কা না রেখে দিব্যি একের পর এক আইন ভঙ্গ করতে পারেন। পক্ষান্তরে অতি দরিদ্র যারা, তারা কষ্টের জ্বালায় দিশেহারা হয়েই পরের সম্পদ অপহরণে বাধ্য বা প্রলুব্ধ হতে পারে। কাজেই সবচেয়ে স্থিতি প্রত্যয়শীল অংশ হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কারণ এই শ্রেণি অতি ধনীও নয়, অতি দরিদ্রও নয়। যেখানেই অন্য শ্রেণিগুলোর তুলনায় এ শ্রেণি আকারে বৃহৎ সেখানেই সমাজের সাধারণ মেজাজটি মধ্যপন্থী তথা নরমপন্থী এবং আইনের প্রতি বশ্যতাও প্রায় ব্যতিক্রমহীন হয়ে ওঠে। সমাজের সমগ্র অংশের কাছে যে বিশেষ বৃত্তিটি গুরুত্বপূর্ণ এবং যে বৃত্তি থেকে বহু লোক জীবিকা অর্জন করে থাকে, সংবিধানের সাধারণ চরিত্রও সেই বৃত্তির বৈশিষ্ট্যগুলোর ছাপ বহন করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের বিশ্লেষণ করে এরিস্টটল সিদ্ধান্ত করেন যে, সেই গণতন্ত্রই সেরা গণতন্ত্র যার বুনিয়াদ হচ্ছে কৃষিবৃত্তি।

প্রশাসনযন্ত্রের গঠনতন্ত্র, তার কর্মকাণ্ড ও ক্ষমতাবলিতে এবং যে রাজনৈতিক শক্তি প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী তার চরিত্রেও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্দেশগুলোর প্রতিফলন ঘটে। এগুলো একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতাবলি ও অন্যদিকে রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক নিয়মপ্রণালি সংশ্লিষ্ট। এগুলোর যোগফল হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের মাধ্যমেই রাজনীতি উপযুক্ত নিয়ম-প্রণালিতে সঞ্চালিত হয়ে সেগুলোকে ক্রিয়াশীল করে তোলে। কিন্তু এরিস্টটল সতর্ক করে গেছেন যে কার্যক্ষেত্রে সংবিধানের কাঠামো এমন সব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, যার সাথে তার আদি লক্ষ্যের কোনো মিল নেই। তাঁর বক্তব্যও সুস্পষ্ট যে, সত্যের সন্ধান লাভ করতে হলে বাইরের খোলস ভেদ করে ভেতরের দিকে নজর দিতে হবে।

এরিস্টটল রাজনীতির অর্ন্তবস্তু নির্দেশ করতে গিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রথমটি হচ্ছে, রাষ্ট্রের সাংগঠনিক সত্তা বিশ্লেষণ করা হলে তিনটি উপাদান লক্ষ করা যায়। এই উপাদানগুলোর মধ্যে প্রথমটি আইন ও শাসন সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্ক করে, দ্বিতীয়টি শাসনকার্য নির্বাহ করে। তৃতীয়টি আইনের আওতায় বিচারকার্য নির্বাহ করে। বিতর্ক ও আলোচনায় নিয়ত সংস্থাটি অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন, বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ দেখার অধিকারী হলে সেটিই হয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। এসব কাজে যারা অংশগ্রহণ করেন প্রকৃতপক্ষে তারাই হচ্ছেন দেশের শাসক। দ্বিতীয় যে বিষয়টির ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটি হচ্ছে, আইনের একটি নিজস্ব, স্বয়ম্ভু ক্ষমতার ভিত্তি রয়েছে এবং তার সূত্রপাত হয় সংবিধানকে কেন্দ্র করে। সংবিধান হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন তথা আইনের আইন, রাষ্ট্রের প্রণীত অন্য সকল আইনকে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। সংবিধানকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেই অন্য সকল আইনের ন্যায়ানুগতা যাচাই করা হয়। সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে রচিত আইন, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিশেষ নির্দেশের চেয়েও অগ্রগণ্য। যারা সংবিধানের প্রতিষ্ঠালাভে ও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছেন তারা নিজেরাও সে-আইনের আওতাধীন। সরকারি পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য। এরিস্টটলের ভাষায়, "তারা হচ্ছেন একাধারে 'আইনের রক্ষক ও তার সেবক।"[৩৭]

## ৪.৮ বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধান চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এগুলোকে 'মূল স্তম্ভ' বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'চারটা স্তম্ভের ওপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো, এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকারই হচ্ছে মূল বিধি।'[৩৮] বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের মানুষের অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তি। এ সংবিধানে নিহিত

আছে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও সুদৃঢ় প্রত্যয়। বাংলাদেশের জনগণ যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছে, সেসব অধিকারকে নির্বিঘ্নে চর্চা করার জন্য ১০৭১ সালে একটি নতুন ও স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সংবিধানের 'প্রস্তাবনা', 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' এই তিনটি অধ্যায়ের অনেকাংশেই তা প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন সত্যিই ইতিহাসে বিরল। বিশেষত পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় এ অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সংবিধানটি সুলিখিতও বটে। ১১টি ভাগে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিলে বিভক্ত এ সংবিধান। রাষ্ট্রের চরিত্র যে গণপ্রজাতান্ত্রিক, সংবিধান যে দেশের সর্বোচ্চ আইন, জনগণই যে সকল ক্ষমতার মালিক, জনগণের অভিব্যক্তির প্রকাশই যে সংবিধান, প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য যে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত সংসদীয় সরকারই যে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, বিচার বিভাগ যে স্বাধীন থাকবে—এর প্রায় সবই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হরা হয়েছে এ সংবিধানে। এছাড়া নির্বাচন কমিশন, কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল ও মহা হিসাব-নিরীক্ষক ইত্যাদি যে সাংবিধানিক সংস্থা হবে, সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন যে বিচার বিভাগ বাতিল করতে পারবে—এ রকম অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্নে রাষ্ট্র তার অবস্থানের কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে এ সংবিধানে।[৩৯]

এছাড়া রাষ্ট্র তার মূলনীতি হিসেবে, "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত, ন্যায়পরায়ণ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা", "মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা", "ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা", "মেহনতী কৃষক-শ্রমিকের শোষণ মুক্তি", "অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ কর্ম বিশ্রাম ও বিনোদনের অধিকার প্রতিষ্ঠা", সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকলের জন্য সুযোগের সমতা সৃষ্টির অঙ্গীকার এই সংবিধান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির জন্য অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তির অনুপার্জিত আয় ভোগ করার সামর্থ্য থাকবে না এবং সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা হবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। এছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন দানের বিষয়কে রাষ্ট্র তার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে।[৪০]

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির পাশাপাশি সংবিধানে কতিপয় অধিকারকে নাগরিকের 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এইসব মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম হলো চিন্তা ও বিবেকের

স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ইত্যাদির কারণে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্ত থাকার স্বাধীনতা, সকলের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং সকলের সমানভাবে বিচার পাওয়ার অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি। এগুলোর উল্লেখ রয়েছে সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে। পরবর্তীকালে যেসব সংশোধনী আনা হয়েছে, যদি তা না করা হতো তাহলে বাংলাদেশের সংবিধান একটি উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারতো বলে মনে করা যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে ধরনের সংবিধান রচিত হবে বলে মানুষ বিশ্বাস করতো, উপরোক্ত ৪টি অধ্যায়ে তার অনেক কিছুরই উল্লেখ আছে এবং এজন্য এখনো এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বিশ্বাস করে '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেই মুক্তিযুদ্ধের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ অনেকখানি সুগম হবে।[৪১]

প্লেটো থেকে শুরু করে মার্কস পর্যন্ত রাষ্ট্রদার্শনিকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রত্যেকটা রাষ্ট্র গড়ে ওঠে একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর। বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও একটা দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। এই দার্শনিক ভিত্তিটা হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা, যা ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে সংবিধানের মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের ধারণায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত (ন্যায়ভিত্তিক মানবিক) রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। গত ঊনপঞ্চাশ বছরে আমাদের সে-চেতনা তথা দর্শন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বরং আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দার্শনিক অনুসন্ধান থেকে এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বার বার রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, পীড়নমূলক, শোষণমূলক ও লুণ্ঠনধর্মী চরিত্রের কারণে সংবিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন হোঁচট খেয়েছে।[৪২] স্বাধীনতার পর দ্রুততম সময়ে (মাত্র এক বছরের মধ্যে) বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মূল চেতনা (জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা) অর্থাৎ জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেতনা প্রতিফলিত হয়। সংবিধান রচনার পর থেকে এ পর্যন্ত সংবিধানের বেশকিছু কাটাছেঁড়ার (সংশোধনের) মধ্য দিয়ে এর মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই সুশীল সমাজ, বাম-গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মহলের পক্ষ থেকে বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। ক্ষমতায় আসার আগে মহাজোট সরকার তাতে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ক্ষমতায় আসার পর এক ধরনের গোঁজামিল দিয়ে তা বাস্তবায়ন করে। জিয়া সরকার কর্তৃক সংযোজিত 'বিসমিল্লাহ' এবং এরশাদ সরকার কর্তৃক সংযোজিত 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বহাল রেখেই বাহাত্তরের সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ফিরিয়ে আনা হয়। যার ফলে সংবিধান এক উদ্ভট চেহারা ধারণ করেছে, এক অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যের মধ্যে পড়েছে।[৪৩]

আধুনিক রাষ্ট্র মানেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানেই পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাহাত্তরের সংবিধানে বিধৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য। বাংলাদেশের সংবিধানে আধুনিক রাষ্ট্রের এই নীতি প্রতিফলিত হলেও, বাহাত্তরের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ফিরে আসলেও এর সঙ্গে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ও ধর্মীয় বাণী 'বিসমিল্লাহ' বহাল থাকায় একে আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংবিধান বলার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি থাকে না। বরং ধর্মকে নানাভাবে রাষ্ট্র ও রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংবিধানের এ ধরনের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য (একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতা, অন্যদিকে ধর্মকেন্দ্রিকতা অথবা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার) এ গোঁজামিলের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। উদারনৈতিক তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপকেরা ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। বাংলাদেশে তেমনটাই ঘটছে। রাষ্ট্র যদি ধর্মের ব্যাপারে পক্ষাবলম্বন করে তাহলে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে তেমন পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা।[৪৪]

বাংলাদেশের সংবিধান গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণে একটি সমন্বয়ধর্মী রূপ ধারণ করলেও এর দার্শনিক বিশ্লেষণ থেকে একে একটি পাঁচমিশালী সংবিধান বলে প্রতীয়মান হয়।[৪৫] তবে এর বিধি-বিধান ও আইনকানুন পর্যালোচনা করলে এর মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেহারাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া তথা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকে কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন। রাজনীতির ক্ষেত্রে সমতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা না থাকলে রাজনৈতিক সমতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য ব্যক্তির বিকাশের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। গণতন্ত্রে আইনের শাসনের (rule of law) কথা বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধানে যার স্বীকৃতি রয়েছে। তাত্ত্বিক বা ধারণাগত দিক থেকে কথাটার অর্থ হলো প্রতিটি নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান, অর্থাৎ আইন নাগরিকদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করবে না। আইনের শাসন লঙ্ঘিত হলে নাগরিক আদালতের সাহায্য নিতে পারবে। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনি ব্যবস্থার সুযোগ সবার জন্য সমান নয়। এ ব্যবস্থায় 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' এ সুযোগ সব নাগরিক সমানভাবে ভোগ করতে পারে না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনি ব্যবস্থা শ্রেণিশোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ব্যবস্থায় আইন-আদালত সমাজের প্রভাবশালী তথা বিত্তবানদের শাসন ও আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখে। তাত্ত্বিক (ধারণাগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) ও ব্যবহারিক (প্রায়োগিক) উভয় দিক থেকেই সর্বনিম্ন থেকে

সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইন প্রভাবশালী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। কাজেই শ্রেণি আধিপত্যমূলক সমাজে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' কথাটা কেবল অর্থহীনই নয়, বিভ্রান্তিমূলকও। 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র ধারণা তখনই অর্থপূর্ণ হবে যখন সমাজব্যবস্থা শ্রেণি-আধিপত্য থেকে মুক্ত হবে।[৪৬]

বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম ত্রুটি হলো এর অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য এবং গণতন্ত্র পরিপন্থি বিধি-বিধান। এখানে ক্ষমতার মালিক জনগণ কিন্তু প্রয়োগের মালিক এক ব্যক্তি তথা প্রধানমন্ত্রী। সংবিধানের প্রথম ভাগে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ', অন্যদিকে চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগে 'প্রধামন্ত্রীকে' ক্ষমতা প্রয়োগের একচ্ছত্র মালিকানা দেয়া হয়েছে। এই একটিমাত্র কারণে, অর্থাৎ যাবতীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তির (প্রধানমন্ত্রীর) হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় বাংলাদেশের সংবিধানে অনেক গণতান্ত্রিক উপাদান থাকলেও এর অধীনে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ ধরনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক নিরঙ্কুশতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের (political absolutism and fascism) জন্ম দিতে পারে, জনগণের ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্রায়ণের ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতাই বাংলাদেশের বিদ্যমান অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার উৎস। কোনো সংবিধান যখন এক ব্যক্তিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে রাখে তখন তাকে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংবিধান বলা যায় না।[৪৭]

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক সংবিধান দ্বারা। গণতান্ত্রিক সংবিধান মানে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান, আর গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান মানে জনগণের মঙ্গল বা কল্যাণের সাথে জড়িত নীতি বা বিধি-বিধান। জনগণের মঙ্গলকেন্দ্রিক তথা জনকল্যাণকেন্দ্রিক নীতি বা বিধি-বিধানই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সংবিধানের রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক ভিত্তি। রাষ্ট্রদার্শনিক বিশ্লেষণ থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমাদের রাষ্ট্র, সরকার, রাজনীতি, দল সব ক্ষেত্রেই অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হলো জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশকে যথার্থ অর্থে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এর রাষ্ট্রদার্শনিক ভিত্তির পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ জনগণের গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করতে হবে। বিদ্যমান সংবিধানের মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার বিষয়ক বিধিবিধানের মধ্যেই এর দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এই দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সংবিধানের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, অসংগতি এবং গণতন্ত্র পরিপন্থী বিধিবিধান এর শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাভিত্তিক শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি জনগণের গণতান্ত্রিক সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।[৪৮]

ব্যক্তিতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রের বদলে প্রকৃতপক্ষেই জনগণের একটি রাষ্ট্র এবং সংবিধানের রূপরেখা কী হতে পারে এবং জনগণের পক্ষে তা কীভাবে অর্জন করা সম্ভব সে-লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাগুলো[৪৯] আনা যেতে পারে:

১. সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির সাথে ক্ষমতা-কাঠামোকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে এমনভাবে তা সংশোধন করতে হবে যাতে কোনো 'এক ব্যক্তি' নয়, ক্ষমতার মালিকানা জনগণের কাছে থাকে, এবং রাষ্ট্রের সকল শীর্ষ পদাধিকারীরা সংবিধান অনুযায়ী জনগণের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য থাকে।

২. বিদ্যমান সাধারণ নির্বাচন-ব্যবস্থার পরিবর্তে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন-ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. গুম-খুন-নির্যাতনকারী, জনসম্পদ-জনঅধিকার ও জাতীয় সম্পদ লুটপাটকারীদের মদদ দেয়ার ঔপনিবেশিক আইন নয়, প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা এবং জনগণের সম্পদের পাহারাদারদের পৃষ্ঠপোষকতা করার গণতান্ত্রিক আইন ও বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. সংসদের কাছে প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের সকল শীর্ষ পদাধিকারীদের দায়বদ্ধ এবং সংসদকে জনগণের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, জাতীয় সম্পদ রক্ষা এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. স্থানীয় শাসন নয়, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

### ৪.৯ সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদ 'মৌলিক অধিকার' (তৃতীয় ভাগ) অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার রক্ষার বিধান। রাষ্ট্র কখনও মৌলিক অধিকার হরণ করবে না সেটাই বলা আছে সংবিধানে। মৌলিক অধিকার হলো রাষ্ট্র প্রদত্ত সে-সব সুযোগ-সুবিধা যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। এ অধিকার ব্যতীত সভ্য জীবনযাপন অসম্ভব। যে-কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে রয়েছে এ মৌলিক অধিকার। এর ফলে নাগরিক জীবনের সব ধরনের অনিশ্চয়তা হ্রাস পায় এবং সরকারের স্বৈরাচারী প্রবণতা রোধ হয়। 'রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যক্তির জন্য, ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নয়'—এ ধারণা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদানের মধ্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাছাড়া সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হবার ফলে এদের কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়। ফলে মৌলিক

অধিকারগুলো শাসনতান্ত্রিক আইনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ করি যে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আন্দোলনের নামে নাগরিকদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয় তাতে মৌলিক অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এছাড়াও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সহিংস কার্যাবলি একটি দেশের সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ বিনষ্ট করা সহ সেই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহকে নাজুক করে দেয়। তখন দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি আর স্থিতিশীল থাকে না। গণতান্ত্রিক ধারাগুলো লঙ্ঘিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে যদি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যায় তাহলে তা হবে গণতন্ত্রের জন্যে প্রাথমিক কাজ। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মূলকথা হচ্ছে সংবিধান, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের গণতান্ত্রিক রূপান্তর। জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। জনগণের স্বার্থে মৌলিক অধিকার প্রণীত হবে সেটাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক যে চিন্তা-চেতনার বিকাশ হয় তার সাথে সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বিকাশের সাথে সাথে মেহনতি মানুষের সংগ্রাম গড়ে ওঠার বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রজাতন্ত্র ভাগে বলা আছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।"[৫০] সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা বা বলবৎ করার কিছু উপায়সমূহ নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে কোনো আইন প্রণয়ন করবে না। মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যহীন কোনো আইন প্রণীত হলে তা যতটুকু সামঞ্জস্যহীন ততটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে।

২. সংবিধানের (৩২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কারো জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। তাছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী যে-কোনো পদক্ষেপকে বাতিল ঘোষণা করতে পারবে।

৩. বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করতে পারবেন। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১ দফা) অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য যে-কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারবে।

৪. মৌলিক অধিকার রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ হলো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন যদি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয় তাহলে সুপ্রীম কোর্ট তা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে বাতিল ঘোষণা করতে পারবে।

বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পর থেকেই সংসদীয় শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ শুরু হয়, যা ছিল সাংবিধানিক গণতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক ধাপ। বাংলাদেশের সংবিধানে বাক-স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা এ রকম আরও কিছু গণতান্ত্রিক ধারা রাখার ফলে জনগণ গণতন্ত্রের চর্চার সুযোগ লাভ করে। ফলে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভিত্তি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন সময়ে সংবিধান পরিবর্তন করে থাকে সংশোধনের মাধ্যমে। কিন্তু এই সংশোধনের ধারাটা যদি অযাচিতভাবে চলতে থাকে তাহলে সংবিধান তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলবে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসের ধারাকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের প্রত্যেককে আন্তরিক হতে হবে। নিছক রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য বিরোধিতা করলে দেশ তার স্বাভাবিক গতি হারাবে। বরং সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে গেলে দেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সে-পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। জনগণের কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষাকে ঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য আমাদের অবশ্যই সাংবিধানিক উপায়েই সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

## ৪.১০ গণতান্ত্রিক সংবিধানের কয়েকটি শর্ত

কোনো সংবিধান কেবল কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষেই গণতান্ত্রিক হতে পারে।[৫১] এ বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, সমাজ সংস্থানগত পরিপার্শ্ব গণতান্ত্রিক না হয়ে স্বৈরতন্ত্রী বা অভিজাততন্ত্রী হলে সংবিধান গণতান্ত্রিকভাবে কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু শুধু সমাজ-সংগঠনের নিরিখেই সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র নিরূপণ করা যায় না। প্রশাসন-পদ্ধতি যুগপৎভাবে সমাজ সংগঠনকে প্রভাবিত করে। প্রশাসন-পদ্ধতি হচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী ও দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত জনগণের দাবি-দাওয়া, সুসংগঠিত ও ক্রিয়াশীল জনসংখ্যাদি এবং সমাজ-মানসের দার্শনিক ভাবাদর্শ ও আশা আকাঙ্ক্ষার মিশ্রিত রূপ। সামাজিক গোষ্ঠীগুলার নির্মিতির মৌলিক উপাদানগুলোই সাংবিধানিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যেই রাজনীতির সৃজনশীল প্রক্রিয়াগুলো তাদের নির্দিষ্ট আকার ও উদ্দেশ্যে দিয়ে সংহত করে তোলে। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে গেলে, কোনো সংবিধানের সবচেয়ে জরুরি সমস্যা হচ্ছে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ণয় করা, প্রশাসনের জন্য একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিরূপণ করা এবং যেসব লক্ষ্য গণতন্ত্রকে বাস্তব সত্যে পরিণত করে সেসব লক্ষ্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপ নির্ধারণ করা।

গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রথম রাজনৈতিক শর্ত হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রের আওতার অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী হবে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণেও সমান ক্ষমতার অধিকারী হবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে মৌলিক অধিকার ও দায়িত্বসমূহের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংবিধানে জাতিত্ব, ধর্ম, ভাষা, শ্রেণি, বিত্ত ইত্যাদি ভিত্তিতে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না। গণতন্ত্রে নাগরিক হিসেবে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী। এই নীতির অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে এর অন্যথা করা হলে সেই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সংবিধানকে তার প্রতিনিধিত্বমূলক বলে বিবেচনা করতে পারে না। কোনো সংবিধানে যে-পরিমাণে এ ধরনের ব্যতিক্রম বিদ্যমান সেই সংবিধান সে-পরিমাণ অগণতান্ত্রিক। এই ব্যতিক্রমে নিপীড়িত কোনো শ্রেণি বা সম্প্রদায় যদি সংশ্লিষ্ট সংবিধানের প্রতি তাদের অনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তা নৈতিক ও রাজনৈতিক বিচারে সমর্থনযোগ্য হবে। কারণ সংবিধানটিই স্বয়ং তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই যেসব কাজ মানুষের সাধারণ মনুষ্যত্ব তথা মানুষ হিসেবে মানুষের সমমর্যাদায় বিশ্বাসী নয়, সেসব সমাজে সংবিধানের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে গণতন্ত্র প্রবর্তন করা যাবে না। কোনো গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রথম লক্ষ্য হতে হবে এমন একটি সংহতি বা সর্বজনগ্রাহ্যতা। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি, প্রশাসনিক কাঠামো ও আইনগত ক্ষমতার অধিকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে যথাযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানকে আরো একটি প্রধান সমস্যার সমাধান করতে হয়। এই সমস্যাটি হচ্ছে সময়োচিত পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত। সংবিধান হচ্ছে ক্ষমতার ব্যবহারকে নিয়মানুগ করার এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মপ্রণালির মাধ্যমে আইনের কাছে জবাবদিহি করার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত একটি রাজনৈতিক উপায়। সকল সরকার বা প্রশাসন-পদ্ধতিই ক্ষমতার ব্যবহারজনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়। গণতান্ত্রিক সরকার পূর্ব- সম্মতির ভিত্তিতে একটি প্রশাসনযন্ত্র নির্মাণ ও পদ্ধতির প্রবর্তন করতে প্রয়াসী, যার সুবাদে ক্ষমতা-প্রত্যাশী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। ক্ষমতা পেলে তা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং ক্ষমতা হারালেও তা শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তরিত করতে পারে। কোনো সংবিধান সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে এবং সেই সংবিধানে সবার জন্য সমান সুযোগের বিধান করা হয়েছে বলে সাধারণ ধারণার সৃষ্টি হলে, তবেই তাকে একটি সৎ সংবিধান বলা যেতে পারে। অন্যথায় সেই সংবিধানের ভিত্তিকে গণতন্ত্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। সাংবিধানিক প্রয়াস যেসব মৌলিক গণতান্ত্রিক সমস্যার সম্মুখীন হয় তার দুটি নাটকীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই শতকের গোড়ার দিকে হাউস অব লডর্সের ক্ষমতা নিয়ে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক সংকট ও কেপ প্রদেশের অশ্বেতাঙ্গদের ভোটাধিকার হরণ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

'সুতরাং বলা যায় যে, প্রত্যেক সরকারের উৎসই হলো সংবিধান, তা গণতান্ত্রিক হোক বা অগণতান্ত্রিক হোক। সংবিধান হলো মূলত মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষম ব্যবস্থা। এর মৌলিক

বিধানসমূহ মানবসমাজের ক্রমবিকাশেরই ফল। সংবিধানের মাধ্যমেই নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়। যে-কোনো গণতান্ত্রিক সংবিধানে অবশ্যই দুইটি নিশ্চয়তা থাকতে হবে: সকল নাগরিকের সমান সুযোগ এবং ক্ষমতা প্রয়োগ ও হস্তান্তরের সুশঙ্খল ব্যবস্থা। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক রীতিনীতি তার বৈশিষ্ট্য ও অনন্য জাতীয় বিবর্তনেরই প্রত্যক্ষ ফল। বাংলাদেশের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা', 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' এই তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে যেসব আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত রয়েছে সংবিধানের মৌল ক্ষমতা-কাঠামোকে যদি তা বাস্তয়নের উপযোগী করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের সংবিধান অবশ্যই পৃথিবীতে 'গণতান্ত্রিক সংবিধান'-এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

## তথ্যনির্দেশ


১. Mairi Robinson, *Chambers 21st Century Dictionary*, Allied Chambers (India) Limited, New Delhi, 1998. P. 293.

২. লেসলি লিপসন, *গণতান্ত্রিক সভ্যতা*, আবুল বাশার (অনূ.), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১৫৬।

৩. মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *রাজনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান*, জ্ঞানকোষ, প্রথম খণ্ড, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৬, ঢাকা, পৃ. ২৫৫।

৪. লেসলি *লিপসন*, *গণতান্ত্রিক সভ্যতা*, আবুল বাশার (অনূ.), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১৮৩।

৫. হারুন রশীদ, *বাংলাদেশের সংবিধান: রাষ্ট্রদার্শনিক পর্যালোচনা*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ৯।

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

৭. আমিনুল ইসলাম ভুইয়া (অনূ.), *প্লেটোর আইনকানুন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২১৫।

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০।

৯. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া (অনূ.) *প্লেটোর আইনকানুন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৮১।

১০. হারুন রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

১২. এরিস্টটল, *পলিটিক্স*, সরদার ফজলুল করিম (অনু.), মাওলা ব্রাদার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ১৬২-১৬৩।

১৩. ১৩. হারুন রশীদ, *বাংলাদেশের সংবিধান: রাষ্ট্রদার্শনিক পর্যালোচনা*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ১২।

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১৮. এরিস্টটল, ***পলিটিক্স***, সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ১৬০।

১৯. C. F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidwick and Jackson, 1972, P. 3.

২০. কে. সি. হুইয়ার, *আধুনিক শাসনতন্ত্র*, আরশাদ আজিজ (অনূ.), অবসর, ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১২।

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

২২. A. G. Gettell, *Political Science*, Revised Edition, The World Press Private Ltd. Calcutta, 2010, P. 244

২৩. *Ibid*, P. 249

২৪. *Ibid*, P. 250

২৫. *Loc, cit.*

২৬. *Loc, cit.*

২৭. Bobbit Philip, "Constitutional Law and Interpreatation" in Denis patterson (ed), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell, (1996) 2000 reprint, P. 126.

২৮. A. G. Gettell, *Political Science*, Revised Edition, The World Press Private Ltd. Calcutta, 2010, P. 245.

২৯. *Loc, cit.*

৩০. Ivor Jennigs, *Law and the Constitutions*, University of London Press, 1959. P. 8.

৩১. A. G. Gettell, *Political Science*, Revised Edition, The World Press Private Ltd. Calcutta, 2010, P. 245

৩২. *Ibid*, P. 246.

৩৩. *Loc, cit.*

৩৪. কে. সি. হইয়ার, *আধুনিক শাসনতন্ত্র*, আরশাদ আজিজ (অনূ.), অবসর, ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১০৮

৩৫. A. G. Gettell, *Political Science*, Revised Edition, The World Press Private Ltd. Calcutta, 2010, P. 246-47.

৩৬. Ibid, P. 247.

৩৭. লেসলি লিপসন, *গণতান্ত্রিক সভ্যতা*, আবুল বাশার (অনূ.), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১৫৯।

৩৮. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, (নভেম্বর ৪, ১৯৭২, বাংলাদেশের গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ), পৃ. ১৬২।

৩৯. *বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা*: গণতান্ত্রিক আইন ও সংবিধান আন্দোলন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৫।

৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬।

৪২. ড. হারুন রশীদ, *বাংলাদেশের সংবিধান, রাষ্ট্রদার্শনিক পর্যালোচনা*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৭।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।

৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

৪৯. দেখুন, *রাষ্ট্রচিন্তা*, হাবিবুর রহমান (সম্পা.), কক্ষ নং ২০৩০, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা. ১৫-২৯।

৫০. আরিফ খান, *বাংলাদেশের সংবিধান: ২০১৮ সালের সপ্তদশ সংশোধনীসহ*, প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র, অনুচ্ছেদ-১, বেঙ্গল বুকস, ২০১৮, পৃ. ৫১।

৫১. লেসলি লিপসন, *গণতান্ত্রিক সভ্যতা*, আবুল বাশার (অনু.), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১৬১।

**পঞ্চম অধ্যায়**

# বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন

## ৫.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার

তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো এক ধরনের ভিন্নধর্মী শাসনব্যবস্থা। যখন কোনো রাষ্ট্রে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তার প্রেক্ষিতে যে ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে পারে সেটিই হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। যখন ক্ষমতাসীন দল সরকারি সম্পদ এবং সুযোগ গ্রহণ করে নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করে তখন অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভব হয়। এ ব্যবস্থায় যোগ্যদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এর উদ্ভব ঘটে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের প্রতি যখন জনগণ ভরসা রাখতে পারে না, যখন আস্থার ক্ষেত্রে সংশয় তৈরি হয় তখন ক্ষমতাসীন দল জনগণের চাপে ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দেশ পরিচালনার জন্য সরকার অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যে সরকার গঠিত হয় তা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এটি অনেক সময় সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে হতে পারে। কখনও সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলীয় সরকার অনাস্থা ভোটে হেরে গেলে তখন সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে পারেন। পরবর্তী সময়ে নির্বাচন না হওয়া এবং নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব পালন করে। এ ধরনের সরকারকে বাংলাপিডিয়াতে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: "তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার"[১]

## ৫.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা

বিভিন্ন দেশের রাজনীতি ও সংবিধানে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর ধারণাটি বিভিন্ন রূপে এসেছে। যেসব দেশে গণতন্ত্রের চর্চা হয় সেসব দেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি নতুন বিষয় নয়। অনেক আগে থেকেই যেসব দেশে এ ধারণাটির চর্চা হতো, সেখানে কোনো বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এ ধরনের ব্যবস্থা কার্যকরী করা হতো। যেমন ব্রিটেনে ১৯৪৫ সালে, ভারতে ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।[২]

জনগণের প্রত্যাশা থাকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনই এমন কাজ করবে না যা জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করবে। এটি হবে পক্ষপাতহীন একটি সরকার। সকল রাজনৈতিক দলের এ সরকারের ওপর আস্থা থাকবে। নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। এখানে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে সাংবিধানিকতা বজায় থাকবে। প্রধান উপদেষ্টা আবার অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগ দেবেন, যারা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকবেন না। দলনিরপেক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিরাই এখানে স্থান পাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল লক্ষ্য হলো একটি ন্যায়সঙ্গত পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে বিদায়ী সরকার কতৃক কোনো রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়াই একটি নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।[৩]

কোনো প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদায়ী সরকারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রথা দেখা যায়। এ সরকারের কার্যাবলি নির্বাচনের ফলাফলে যাতে কোনো প্রভাব সৃষ্টি না করে সে-জন্য তারা দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে। স্বল্পস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেই লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, একটি স্বীকৃত সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অন্য একটি সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য যদি কোনো মধ্যবর্তী সময়ের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সময়ে যদি কোনো অস্থায়ী সরকার বা প্রশাসন রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করে তখন তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়। এ সরকারের মূল দায়িত্ব হলো সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করে নতুন নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকর দৃষ্টান্ত আমরা প্রথমে দেখি ইংল্যান্ডে ১৯৪৫ সালে। উইনস্টন চার্চিলের সেই সরকারকে আইভর জেনিংস তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে উল্লেখ করেন।[৪] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সরাসরি কোনো সংজ্ঞা প্রদান না করলেও তিনি মনে করেন যে, এ ধরনের সরকার-ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

১৯৭৯ সালের ২৩ আগস্ট ভারতীয় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার এক রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট রেড্ডিকে এভাবে উদ্বৃত করা হয়: "প্রেসিডেন্ট রেড্ডি চাচ্ছিলেন চরণ সিং-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার বাইরে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা নীতি নির্ধারণে বিরত থাকুন, যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার উপর বর্তাবে।"[৫] কলকাতা হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতা প্রদানের পক্ষে ছিলেন।

বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সালের ১ নং আইন) এর ২ ধারাবলে ৫৮ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়। সংবিধানের ৫৮খ এ উল্লেখ রয়েছে "সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভঙ্গ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।"[৬]

## ৫.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ

বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে ও সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে একে তিন ভাগে[৭] ভাগ করা যায়: ১. অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ২. বিশেষ অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ৩. প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

### *৫.৩.১ অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার*

আস্থা ভোটে ক্ষমতাসীন সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সরকার ক্ষমতায় থেকেই যখন নির্বাচনে অংশ নেয় তখন অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন দলই সরকারে রূপান্তরিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে এ রকমের সরকারকে অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা যায়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ ধরনের সরকার দেখা যায়। যেমন ব্রিটেন, কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় থেকেই নির্বাচন পরিচালনা করেন। নির্বাচনের পূর্বে তাকে পদত্যাগ করতে হয় না। পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান ছিল। আস্থা ভোটে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর পতন হলে ও মেয়াদ শেষে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার পর সেই সরকারই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে রূপান্তরিত হয়। নির্বাচন পূর্বকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের এরূপ রূপান্তরকে কখনও কখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়। তবে এটি প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়। কেননা ক্ষমতায় থেকেই এ সরকার নির্বাচনে অংশ নেয় এবং এর ফলে তত্ত্বাবধায়নের প্রকৃত কাজটি এর দ্বারা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না।

### *৫.৩.২ বিশেষ অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার*

কোনো রাষ্ট্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে বা সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে উইনস্টন চার্চিল যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন তাকে স্যার আইভর জেনিংস তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে অভিহিত করেছেন।[৮] কারণ চার্চিলের উক্ত সরকার গঠন করা হয়েছিল যুদ্ধোত্তর নির্বাচনকে পরিচালনা করার জন্য এবং এতে ১৬ সদস্যের মন্ত্রিসভা স্থান পেয়েছিল যাতে রক্ষণশীল, জাতীয় লিবারেশন পার্টি এবং কিছু নির্দলীয় ব্যক্তিও অংশ নিয়েছিল। এ কারণে এ সরকারটি অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চেয়ে ভিন্নতর ছিল।[৯]

আবার, পাকিস্তানের সংবিধানের ৫৮ (৫) অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান আছে। সেখানে বিধান করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর তিনি সাধারণ নির্বাচনের একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক কেবিনেট গঠন করবেন। কিন্তু এখানে তত্ত্বাবধায়ক ক্যাবিনেট গঠন সম্পর্কে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। নির্দলীয় নিরপেক্ষ লোক নিয়োগের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; যারা তত্ত্বাবধায়ক কেবিনেটে থাকবেন তাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখারও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকলেও এটা প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পর্যায়ে পড়ে না।

*৫.৩.৩ প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার*

এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এমন একটি রূপ, যেখানে ঐ সরকারের প্রত্যেক সদস্য নির্দলীয় এবং নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে, যাতে নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করা যায়। যেমন, কয়েকশত বছরের রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ১৯৯৪ সালের ২৭ এপ্রিল যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেটিও এক অর্থে প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়েছিল। যদিও সেখানে সরকার ছিল ডি ক্লার্কের ন্যাশনাল পার্টির কিন্তু সরকারকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার মূল দায়িত্ব পালন করেছে ২৬ সদস্যের ট্রানজিশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি কাউন্সিল। তাছাড়া নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করার জন্য অবাধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল ১৬ সদস্যের ইলেক্টোরাল কমিটিকে। উক্ত কমিটিতে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশের ১১ জন অবিতর্কিত ব্যক্তি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ৫ জন প্রতিনিধিকে নেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে বিধান সংযোজন করা হয়েছে তাতে প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ১৯৯৩ সালে পাকিস্তানে মঈন কোরেশীর নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল সেটিও প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সাংবিধানিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত অর্থে

তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে গণ্য করা যায় না। কারণ শাহাবুদ্দীন আহমেদ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করার পর তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে রাষ্ট্রদার্শনিক দৃষ্টিতে দেখলে শাহাবুদ্দীন আহমদের সরকারকে প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে গণ্য করা যায়।

### ৫.৪ বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের ছাত্র-জনতার অভুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনিবার্য হয়ে পড়ে। যার ফলে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। ঐ সরকার ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করলে ঐ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমাপ্তি ঘটে। তবে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় বসার পর কতকগুলো দাবি নিয়ে বিরোধী দলগুলো আন্দোলন করে। তার কয়েকটি দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. সরকারের মেয়াদ শেষে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

২. অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলসমূহের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এ প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কাজ করবেন।

৩. অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না, এমন ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।

৪. অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব হবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

৫. নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ নং অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।

৬. অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়াও জরুরি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায় নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব রাখা হয়। এতে বলা হয়, জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন, নির্বাচন কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণবিধি প্রণয়ন ও নিশ্চিত করার সাথে সাথে উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।[১০]

১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা অর্পণের জন্য বিরোধী দলগুলো এসব দাবি নিয়ে আন্দোলন করে।

রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সমঝোতার অভাব থেকেই বাংলাদেশে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একটি বিদায়ী সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আইনানুগ রীতিসিদ্ধ পদ্ধতিগুলোর কতখানি সুষ্ঠু প্রয়োগ করবে এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কতটা পক্ষপাতহীনতার পরিচয় দেবে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ সন্দেহ থেকেই মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিটি উঠে আসে। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ১৯৫৪ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বচ্ছ নির্বাচন হিসেবে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল এবং গণ-আন্দোলনে প্রভাব ফেলেছিল, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১১] স্বাধীনতার পর থেকে নির্বাচনে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বনের অভিযোগ ওঠে এবং নির্বাচন প্রভাবিত হওয়ার কারণে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। এর ফলে নির্বাচনের ফলাফল আগে থেকেই ছকে বাঁধা থাকায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তা কোনোরূপ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। আর এ ধরনের পূর্ব-নির্ধারিত নির্বাচনী ফলাফলের ওপর জনগণের অবিশ্বাস চরমে পৌঁছে প্রধানত জেনারেল এরশাদের শাসনামলে। ফলে স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর শাসনামলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল একযোগে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এভাবে ১৯৯০ সালে বিরোধী রাজনৈতিক জোটের যৌথ ঘোষণায় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট রূপ লাভ করে। ঘোষণায় বলা হয়: রাজনৈতিক দলগুলো শুধু একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে; কিন্তু তার আগে এরশাদ সরকারকে ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি গ্রহণে বাধ্য করা হবে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার

গঠন করা হবে, যে সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নতুন করে ঢেলে সাজাবে।[১২]

জেনারেল এরশাদ যখন জনগণের গণআন্দোলনের মুখে আত্মসমর্পণে বাধ্য হন তখন সম্মিলিত বিরোধী দলগুলোর মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে দেশের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর আগে উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন এবং বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের আহমদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর জেনারেল এরশাদ প্রধান বিচারপতির হাতে দেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্বভার অর্পণ করে নিজে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারে মোট সতেরো জন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। তবে উল্লেখ্য যে, কোনোরকম সাংবিধানিক সংশোধনী ছাড়াই ১৯৯০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়েছিল। কেননা সময়ের স্বল্পতার কারণে তখন সংসদ অধিবেশন আহ্বান সম্ভব ছিল না। বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল শক্তি ছিল সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন, ফলে এর কর্মতৎপরতার বৈধতা নিয়ে পরবর্তী সময়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।

১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর গণতান্ত্রিক ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে স্বচ্ছ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উচ্চারিত হয়। তবে বামপন্থী দলগুলোর পক্ষ থেকে পরবর্তী তিনটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চাওয়া হলেও বড় দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাতে কর্ণপাত করেনি। ১৯৯১ সালে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন একটি ইতিবাচক পদক্ষেপের সূচনা করে। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের মাত্র দু'বছরের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে অনৈক্য, পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও অবিশ্বাসের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। বিরোধী দল তাদের নিরবিচ্ছিন্ন সংসদ বর্জন, বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এটাকে প্রধান ইস্যুতে পরিণত করে। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবিত রূপরেখা নিয়ে মতৈক্য ছিল না। প্রধান তিনটি বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাসহ তিনটি পৃথক বিল যথাক্রমে ১৯৯১ ও ১৯৯৩-এর অক্টোবর ও নভেম্বরে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে জমা দেয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে কাকে মনোনীত করা হবে এ প্রশ্ন ছাড়া বিলগুলোর মৌলিক বিষয় প্রায় অভিন্ন ছিল। আওয়ামী লীগ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতিকে মনোনয়ন দানের পক্ষে মত দেয়। জাতীয় পার্টির প্রস্তাব ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে একজন নিরপেক্ষ

ব্যক্তিতে নির্বাচিত করা। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর দাবি ছিল একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করে এর প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ দান। অবশ্য এ তিনটি বিল বিরোধী দলগুলোর সংসদ বর্জন ও সরকারি দলের অনিচ্ছাহেতু জাতীয় সংসদের আলোচ্যসূচিতে স্থান পায়নি, ফলে তিনটি প্রধান বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভ ও হরতাল শুরু করে। সরকারি দলের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৪৭ জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখে একযোগে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।[১৩]

বিরোধী দলগুলোর প্রবল আন্দোলনের মুখে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয়। এ কারণে সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধতা দানের জন্য ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এরপর ১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠনের পর সরকারি দল বিএনপি বিরোধী দলগুলোর আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে স্বতন্ত্রভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধকরণের পদক্ষেপ নেয়। এভাবে ১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ ত্রয়োদশ সংশোধনীর[১৪] মাধ্যমে বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ২৬ মার্চ ২৬৮–০ ভোটে বিলটি পাস হয়। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮ (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

১. সংসদ বিলুপ্তির পর প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন ১১ সদস্য বিশিষ্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে;

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে;

৩. প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত হবেন, অন্যদিকে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে ১০ জন উপদেষ্টা মনোনীত হবেন;

৪. প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর অনুরূপ পদমর্যাদার অধিকারী হবেন;

৫. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে এর কার্যাবলি, বিশেষত দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকবে এবং নিতান্ত প্রয়োজন না হলে নীতি বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকবে;

৬. তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করবে;

৭. নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের দিনই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত ঘোষিত হবে।[১৫]

ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস হওয়ার পর ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেন। বিএনপি এ সংশোধনীর নাম দেয় 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান মতে, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৩০ মার্চ ১৯৯৬ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। রাষ্ট্রপতি ৩ এপ্রিল ১০ জন নির্দলীয় ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। এ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনকেও পুনর্গঠন করা হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৯৬ প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কে এম সাদেক পদত্যাগ করেন এবং ৮ এপ্রিল পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য মোঃ আবু হেনাকে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর ১৫ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে সাবেক সচিব আব্দুর রহমান ও সাবেক জেলা জজ মোস্তাক আহমেদ চৌধুরীকে নিয়োগ দেয়া হয়।[১৬]

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দু'দিন পর দশজন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অষ্টম সংসদীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে এবং ১০ অক্টোবর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে।

বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার মূলত অবাধ ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলোর প্রবল আন্দোলনের মুখেই জন্ম নিয়েছিল। ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটিকে বৈধকরণের ফলে বাংলাদেশ সংসদীয় ব্যবস্থার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ২০০৬ সালে বিএনপি সরকারের কার্যমেয়াদ শেষ হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে ব্যাপক মতানৈক্য হয় এবং রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সর্বশেষ প্রাক্তন বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এরপর রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন এবং উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। ২২ জানুয়ারি ২০০৭ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়। তবে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সংশয় অব্যাহত থাকে এবং এ সময় পরস্পর বিরোধী দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংস্কার সংক্রান্ত সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী রাজনৈতিক সহিংসতা ও সংঘাত ব্যাপক আকার ধারণ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১ জানুয়ারি ২০০৭ রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং উক্ত নির্বাচন স্থগিত করা হয়। প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে রাষ্ট্রপতি সরে যান এবং ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পুনরায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। এ সরকার ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ ঘোষণা করে এবং নির্বাচনী সংস্কারসহ বিভিন্নধর্মী সংস্কার-সাধনে তৎপরতা চালায়। ১৯ ডিসেম্বর

২০০৮ তারিখে যথারীতি নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ড. ফখরুদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালন করেন।[১৭]

### ৫.৫ বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আলোচনা থেকে এর কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেগুলো হলো:

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো একটি ক্ষণস্থায়ী সরকার যার স্থায়িত্বকাল সাধারণভাবে ছয় মাসের অধিক হয় না।

২. এটি একটি নিরপেক্ষ সরকার-ব্যবস্থা। কারণ এ সরকারে কোনো দলীয় ব্যক্তি থাকে না। দেশের বুদ্ধিজীবী ও টেকনোক্র্যাটদের মধ্য থেকে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য নিয়োগ করা হয়।

৩. এ সরকারের দলগত কোনো আদর্শিক ভিত্তি থাকে না। ফলে তারা দলগত কোনো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে না। তাদের লক্ষ্য থাকে কেবল একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা। নির্বাচন শেষে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

৪. সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য নির্বাচিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে কোনো স্বার্থ বা দলীয় বন্ধন থাকে না।

৫. স্বল্পমেয়াদী সরকার বলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা কোনো দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করে না।

৬. জনগণ যেহেতু জানে তারা স্বল্পমেয়াদী সরকার সেজন্য তারা এ সরকারের কাছে সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া বেশি কিছু আশা করে না।

৭. এ সরকার রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কোনো পরিবর্তন করে না। সরকারের কোনো আদর্শগত নির্দিষ্ট রূপরেখা না থাকার ফলে প্রবাহমান বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন না এনে বরং সকলের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

এক কথায় দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন ব্যতীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। দুটি বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আবশ্যকতা দেখা দেবে:

১. কোনো কারণে সংসদ যদি ভেঙ্গে দেয়া হয় তাহলে ভাঙার ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে।

২. সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে।

*৫.৫.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য*

বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৮ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১১ সদস্যের বেশি হবে না। সদস্যদের মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা থাকবেন। তবে তাদের যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ:

১. সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

২. তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন না।

৩. আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এই মর্মে লিখিতভাবে সম্মত থাকবেন।

৪. বয়স বাহাত্তর বছরের বেশি হবে না।

এ যোগ্যতাগুলো প্রধান উপদেষ্টাসহ সকল উপদেষ্টার থাকতে হবে।

*৫.৫.২ প্রধান উপদেষ্টার যোগ্যতাসমূহ*

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার যেসব যোগ্যতা থাকতে হবে তা নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন।

২. যদি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপ্রতি না পাওয়া যায় তবে তার অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।

৩. যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মতি জানান তবে আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে।

৪. যদি আপীল বিভাগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মতি জানান তাহলে রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শক্রমে কোনো ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দিবেন।

৫. যদি উপরোক্ত কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

## ৫.৬ নির্বাচন

রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের পর থেকে আজ পর্যন্ত শাসন-পদ্ধতি বা সরকার-পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্র সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গণতন্ত্র অর্জনের পূর্বশর্ত হলো সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। নির্বাচনবিহীন গণতন্ত্র যেমন অর্থহীন তেমনি গণতন্ত্রবিহীন নির্বাচন মূল্যহীন। গণতন্ত্র এমন এক আদর্শ যা জনগণের প্রকৃত শাসন কায়েম করে এবং যা প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো নিয়মিতভাবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন। নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হলো একটি কার্যকর সংসদ, যা আইনসভা নামেও পরিচিত। আইনসভার সভ্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। জনগণের ভোটের অধিকার হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম উপাদান। সার্ক পর্যবেক্ষক দল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গঠন প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[১৮] নির্বাচনী ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায় যে, সংসদ নির্বাচনে বেশিরভাগ প্রার্থী কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এজন্য গণতন্ত্র অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গণতন্ত্র বিকাশে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। প্রাচীনকাল থেকে আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে যে পদ্ধতি তথা সরকার-পদ্ধতি, শাসন-পদ্ধতি ও নির্বাচন-পদ্ধতি তা সবই একটি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত এবং তা হলো গণতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা না পেলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। সফল নির্বাচন না হলে সঠিক দিক-নিদের্শনার অভাবে রাষ্ট্র পঙ্গু হয়ে পড়ে। একটি সফল নির্বাচন একটি রাষ্ট্রের জন্য দিক-নির্দেশনার সুযোগ এনে দেয়।[১৯] নির্বাচন হচ্ছে প্রতিনিধিত্বশীল শাসনের হাতিয়ার বা বাহন। নির্বাচন হলো প্রতিনিধি পছন্দ ও প্রতিনিধির ওপর কিছুমাত্রায় জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার এক উপায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে যে পদ্ধতি অনুসরণে এক ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য ব্যক্তির নিকট অথবা এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নিকট থেকে অন্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নিকট হস্তান্তরিত হয় তাকেই নির্বাচন বলে।[২০] নির্বাচন সম্পর্কে উদাসীনতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক। নির্বাচনের মাধ্যমেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। নির্বাচন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের শাসকের শাসনাধিকার বৈধ হয়।

নির্বাচনের দিকে নজর দিলে দেখা যায় রাজনৈতিক দলের ভেতরের ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যবস্থা অবাধ কি না এবং সকল ব্যক্তি সমানভাবে বিবেচিত হয় কি না সেটা বিবেচনার বিষয়। কাজেই একটি দেশের জন্য রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন গণতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পূর্বশর্ত সেটা অনস্বীকার্য। কিন্তু এটা হচ্ছে একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় মাত্র। তবে নির্বাচন সঠিক সময়ে হলেই যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়। নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে ম্যাকেঞ্জি বলেন: "অবাধ নির্বাচনে প্রতিটি ভোটার তার নিজস্ব মতামত ও চিন্তার আলোকে সম্মতি প্রকাশের সমান সুযোগ লাভ করে।"[২১]

নির্বাচনী মূল্যবোধের অবক্ষয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কার্যকারিতা হারায়। যেমন মনের বিকৃতি ঘটলে দৈহিক সক্ষমতা যেমন সামাজিক কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে তেমনি নির্বাচনী মূল্যবোধের বিকৃতির ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তথা সামাজিক পরিবেশও হয়ে ওঠে স্বৈরতন্ত্রের সহযোগী, অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের দোসর। এ কারণে সমাজের ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সমুন্নত রাখতে হলে নির্বাচনী মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে। নির্বাচনকে তখনই সুষ্ঠু ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করা যাবে, যখন তা রাজনৈতিক সদিচ্ছা দ্বারা চালিত হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা হলো রাজনীতিতে যুক্তিবাদিতা ও নৈতিকতা। যুক্তিবোধ ও নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক ইচ্ছাই হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা। রাজনৈতিক ফলাফল যা-ই হোক না কেন, যার পক্ষেই যাক না কেন, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় যদি সৎ হয়, সেটিই হবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পাবে গণতান্ত্রিক সমাজ।[২২]

### ৫.৭ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশ চেষ্টা করছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনেরে মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সরকার গঠনের পর জনমনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। জনগণ মনে করেছিল যে, দেশ দ্রুত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হবে, সুরক্ষিত হবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, গড়ে ওঠবে সোনার বাংলা এবং হাসি ফুটবে বাংলাদেশের মানুষে মুখে। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় আসার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে এবং গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা কায়েমে মনোনিবেশ করেন। জাতীয় সংসদের সদস্যগণ মাত্র দশ মাসের মধ্যে দেশের একটি সংবিধান রচনা করেন, যা বাহাত্তরের সংবিধান বলে পরিচিত।

*৫.৭.১ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ঘোষিত হলে তা সমগ্র বিশ্বের সহানুভূতি লাভ ও জনমনে আশার সঞ্চার করলেও বাংলাদেশের মানুষ তত নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। কেননা শেখ মুজিবুর রহমান তখনও ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়নি। তিনি দেশে ফিরে আসার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তন করা হয় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা বৃদ্ধির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দলীয় ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সংবিধানে বলা হয় প্রজাতন্ত্র হবে গণতান্ত্রিক, যেখানে জনগণের মৌল মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা পাবে এবং জনগণ তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে।[২৩] এ সংবিধানের অধীনে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীসহ মোট ১২০৯ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। মোট ৩ কোটি ৫২ লাখ ৫ হাজার ৬৪২ জন ভোটারের মধ্যে ১ কোটি ৯৩ লাখ ২৯ হাজার ৬৮৩ জন অর্থাৎ ৫৪% ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে ২৮৯টি আসন জয়লাভ করে। ১১টি আসনে আওয়ামী লীগ বিনা প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। এ নির্বাচনে জাসদ ১টি, জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৫টি আসনে জয়লাভ করে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ৩১৫টি আসনের মধ্যে ৩০৮টি আসন পেয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচনে গৃহীত বৈধ ও অবৈধ ভোটের পরিমাণ ছিল ৫৩.৫৫% ও ১.৩৬%। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল ৭৩.১৯%।

*৫.৭.২ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার প্রধান, পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সামরিক শাসনের যাত্রা শুরু হয়।[২৪] ১৯৭৭ সালের ৩০ মে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে অনুষ্ঠিত হয় গণভোট। তারপর ১৯৭৮ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। উল্লেখ্য যে, এ দুটি নির্বাচন কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় নাই। এরপর ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে মেজর জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তথা বিএনপি ২০৭টি আসন লাভ করে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

*৫.৭.৩ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র ১২৮ দিন পর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরায় সামরিক আইন জারি এবং সংবিধান স্থগিত করা হয়। নির্বাহী ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল এরশাদ। তাঁর নেতৃত্বে সামরিক আইনের মধ্যে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।[২৫] এরপর ১৯৮৬ সালের ৭ মে সামরিক-শাসক জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে তৃতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপি এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। কাজেই এ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক বৈধতা ছিল না।

*৫.৭.৪ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনামলে ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনে মোট ১২ জন প্রার্থী থাকলেও জেনারেল এরশাদ ও মওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ব্যতীত সকলেই রাজনৈতিকভাবে অপরিচিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ৮টি দলের মোট ১১৯২ জন প্রার্থী ছিল। মোট ৪ কোটি ৯৮ লাখ ৬৩ হাজার ৮২৯ জন ভোটারের মধ্যে ২ কোটি ৫৮ লাখ ৩২ হাজার ৮৫৮ জন অর্থাৎ ৫১.৮১% ভোটার ভোটদান করেন বলে বলা হয়। তবে এই নির্বাচনে অবৈধভাবে গৃহীত ভোটের পরিমাণ বের করা সম্ভব হয়নি। এমনকি নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত এই তথ্য প্রকাশ করতে পারেনি। জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৫২ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলে বিবেচিত হয়।

*৫.৭.৫ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক গণঅভ্যুত্থান সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। বিরোধীদলসমূহের মনোনীত ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন

আহমদ এর নিকট এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পরবর্তী পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে সকল বিরোধী দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা গঠিত হয়। এ সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল জনগণের প্রকৃত নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে।

১৯৯৪ সালের ১ মার্চ ইসরাইলের হেবরন মসজিদে মুসল্লিদের হত্যার প্রতিবাদে বিরোধী দল সংসদে আলোচনার দাবি উত্থাপন করে। সাবেক তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বিরোধী দলের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বক্তব্য প্রদান করলে সকল বিরোধী দল একযোগে সংসদ থেকে ওয়াক-আউট করে এবং তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার বক্তব্য প্রত্যাহার ও তাঁকে ক্ষমতা প্রার্থনার দাবি জানায়। নাজমুল হুদা বক্তব্য প্রত্যাহার ও দুঃখ প্রকাশ করলেও ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। আওয়ামী লীগের সাংসদ আসাদুজ্জমামানের মৃত্যুজনিত কারণে ২০ মার্চ ১৯৯৪ মাগুরা-২ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি সরকার উপনির্বাচনে জয়ের জন্য ব্যাপক কারচুপি করে। সেজন্য বিরোধী দল এ নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন দাবি করে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন দাবি অগ্রাহ্য করে বিএনপি প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করে।

এরপর থেকে বিরোধী দল সরকারকে সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল আনার দাবিতে সংসদ বয়কট করা শুরু করে, কিন্তু বিরোধী দলের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমনওয়েলথ মহাসচিব চিফ এমেকা ঢাকায় এসে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করেন। উভয় নেত্রীর সম্মতিক্রমে স্যার নিনিয়ান স্টিফেনকে মধ্যস্থতার জন্য পাঠানো হয়। প্রায় ৩৮ দিন স্যার নিনিয়ান দুই নেত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করতে রাজী হননি। অবশেষে একটি ফর্মূলা দিয়ে স্যার নিনিয়ান চলে যান। বিরোধী দল সেই ফর্মূলা প্রত্যাখান করে। ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলসমূহ নতুন করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে এবং পদত্যাগপত্র জমা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক জনসভায় ঘোষণা দেন যে, নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে তিনি পদত্যাগ করবেন।

১৯৯৫ সালের ১০ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টামন্ডলী গঠন করে নির্বাচনের দাবি জানান। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী

বিরোধী দলের পদত্যাগপত্রগুলো প্রত্যাখ্যান করে এক রুলিং দেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দল স্পিকারের রুলিংকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং তা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ৪ জুলাই ১৯৯৫ তারিখে রাষ্ট্রপতি বিরোধী দলের সদস্যদের একাদিক্রমে ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকার কারণে সুপ্রীম কোর্টে রেফারেন্স পাঠান। ২৭ জুলাই ১৯৯৫ সুপ্রীম কোর্ট বিরোধী দলের সদস্যদের আসন শূন্য হয়েছে বলে পরামর্শ দেন। ৩০ জুলাই ১৯৯৫ সংসদ সচিবালয় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বিরোধী দলের আসন শূন্য ঘোষণা করে।[২৬] ৯ আগস্ট ১৯৯৫ নির্বাচন কমিশন বিরোধী দলের শূন্য আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা না দিয়ে দৈব দুর্বিপাকের কারণ প্রদর্শন করে উপনির্বাচন ৯০ দিন পিছিয়ে দেন। ৭ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রবিন র‍্যাফেল সমঝোতার জন্য বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৯ অক্টোবর দেশের পাঁচজন বিশিষ্ট নাগরিক সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যর্থ হন। দুই নেত্রীর ৪ দফা পত্রালাপ চলে ডিসেম্বরের ২ তারিখ পর্যন্ত। ইতোমধ্যে সরকার বিরোধী দলের শূন্য আসনগুলোতে ২২ নভেম্বর উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ২৪ নভেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৬ নভেম্বর ১৯৯৫ বিরোধী দলীয় নেত্রীর দাবি প্রত্যাখান করেন। এরপর শুরু হয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিলের সক্রিয় প্রচেষ্টা। ৯ ডিসেম্বর কমনওয়েলথ মহাসচিব দুই নেত্রীর নিকট ফ্যাক্স পাঠান। ১৫ ডিসেম্বর নির্বাচনী তফসিল সংশোধন করা হয়। ২৪ ডিসেম্বর মেরিলের উপস্থিতিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সকল প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এ প্রহসনমূলক নির্বাচন না করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানান। শেখ হাসিনা ১৯৮৮-এর স্টাইলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সঙ্গে সহযোগিতা না করার জন্য পুলিশ, বিডিআর প্রশাসনসহ সকল স্তরের সরকারি-বেসকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আহ্বান জানান। শুরু হয় নির্বাচনী প্রহসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আওয়ামী লীগসহ আন্দোলনরত তিন দলের বৈঠক একদলীয় প্রহসনমূলক নির্বাচন বন্ধ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচীর ও শিক্ষকদেরকে গণবিরোধী নির্বাচনে জড়িত না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ২৩ জানুয়ারির মধ্যেই প্রহসনমূলক নির্বাচন বন্ধ করার আহ্বান জানান। প্রহসনের নির্বাচনে কোনোরকম সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান না করার জন্য শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী, পুলিশ, রির্টানিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসারসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং এর পাশাপাশি জনগণকে ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রহসনের নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৩ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে যাকে পছন্দ তাকে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করার আহ্বান জানান। সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন সম্পন্ন করতে না পারলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বিরোধী দলসমূহ অভিমত ব্যক্ত করে যে, প্রধানমন্ত্রীর এই অসত্য ভাষণ দেশকে সরাসারি সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত ১৪১ জন তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন এবং ৪২ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। মূল বিরোধী দলকে বাইরে রেখে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কাজ এগিয়ে চলে। তাই শুরু হয় সারাদেশে নির্বাচন প্রতিহত করার আন্দোলন। যেখানে প্রধানমন্ত্রী সেখানেই হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে বিরোধী দল। নিরাপত্তার কারণে শিক্ষকেরা নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, সংস্কৃতিসেবী, আইনজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, চিকিৎসকসহ দেশের সকল স্তরের মানুষ ১৫ ফেব্রুয়ারির একদলীয় ও প্রহসনমূলক নির্বাচনকে প্রতিহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

### *৫.৭.৬ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কয়েকবার তারিখ নির্ধারণ করা হলেও তা কয়েকবার পরিবর্তিত হয়। সবশেষে নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। বিরোধী দলের সর্বাত্মক বয়কট ও প্রতিরোধের মুখে একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, ওয়াকার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলসহ প্রায় সব বিরোধী দল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানাতে থাকে। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন এবং নির্বাচনের দিন হরতাল ডেকে বিরোধী দলগুলো ভোটারদের ভোটদানে বিরত রাখার চেষ্টা চালায়। এর ফলে নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে তা সহিংস রূপও ধারণ করে।[২৭] ১৭ জানুয়ারি ১৯৯৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়। বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে কোনো মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়নি, নির্বাচনী তফসিলেও কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। দেশ নিশ্চিত এক সংঘাতের দিকে এগিয়ে যায়।

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক ভোটার ভোটদান করে। অধিকাংশ কেন্দ্রেই শতকরা ৫ থেকে ১৫ ভাগ ভোটার ভোট দান করে। কিছু কিছু উৎসাহী প্রার্থী এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন। তারা অনেক ভোটকেন্দ্র দখল করে নেন এবং ব্যাপক কারচুপির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে একজন প্রার্থী যে পরিমাণ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে প্রদত্ত ভোট তার থেকে অবিশ্বাস্য রকম বেশী। দেশ ও বিদেশ থেকে আগত সাংবাদিক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীগণ এ নির্বাচনকে কারচুপি ও প্রহসনের নির্বাচন বলে অভিহিত করেন। এ নির্বাচনকে সকল মহল থেকে অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করা হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই নামমাত্র যে সকল বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং যে সকল প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ অব্যাহত থাকে। নির্বাচন কমিশনেও একের পর এক অভিযোগ দায়ের করা হতে থাকে। শুধু দেশীয় সাংবাদিকেরাই নন, বিদেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের পাঠানো প্রতিবেদনেও নির্বাচনে অনিয়ম ও কারচুপির চিত্র ফুঠে ওঠে। সঙ্গত কারণে দেশে ও বিদেশে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এমতাবস্থায় দেশের সকল বিরোধী দল ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিলের জোর দাবি জানায়।[২৮] ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কূটনৈতিক ও দাতাগোষ্ঠী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে ক্ষমতাসীন সরকারকে অবৈধ বলে গণ্য করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অবৈধ সরকারকে স্বীকৃতি না দেয়া এবং কোনো প্রকার সহযোগিতা না করার জন্য দাতা দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

নির্বাচনের পর পরই খালেদা জিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদানের জন্য সাধারণ জনগণকে ধন্যবাদ জানান। সংবিধানের গতিশীলতা এবং গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য তিনি সাধারণ জনগণকে ধন্যবাদ জানান। নির্বাচনের তিন দিন পর তিনি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অভিযোগ করেন যে, নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে অথচ বিরোধী দল সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য লিপ্ত হয়েছে।[২৯] বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্তব্য করেন যে প্রায় ৯৫% জনগণই বিএনপি সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি সরকার তার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছে এবং এ সরকার দেশে বেশি দিন থাকতে পারবে না। শেখ হাসিনা ৯ দফা দাবি তুলে ধরেন এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ৯০ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পুনঃনির্বাচন দেয়ার দাবি জানান।[৩০] বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা মন্তব্য করেন যে, তাদের কেউই পেশাদারি জীবনে বিশ্বের কোথাও এমন নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেননি। তাদের মতে বিরোধী দলসমূহের নির্বাচন বর্জনের ডাক শতকরা ১০০ ভাগ সফল হয়েছে। তাদের পর্যবেক্ষণ-পরিসংখ্যান অনুযায়ী নির্বাচনে ভোট পড়েছে

শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগ। ভোট দিতে যাওয়া বা না যাওয়ার জন্য জোরজবরদস্তির ঘটনা তেমন ঘটেনি। কেন্দ্রগুলো ছিল ভোটারশূন্য, নির্বাচনী কর্মকর্তাশূন্য, এমনকি কোনো কোনো কেন্দ্র খোলাই হয়নি। কেউ কেউ এই নির্বাচনকে নির্বাচনের নামে প্রহসন বলে উল্লেখ করেন।[৩১]

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রহসনমূলক একদলীয় নির্বাচনের বিরোধিতা করে বলেন, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বৈধ সরকারের অবসান ঘটেছে। এই মুহূর্তে দেশে কোনো সরকার নেই। তিনি রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার ও ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের অর্থবহ নির্বাচনের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি অথবা আপিল বিভাগের একজন সাবেক বিচারপতি কিংবা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন বরেণ্য নাগরিকের নেতৃত্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আহ্বান জানান।[৩২]

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলাম ও বামপন্থী দলগুলো এই নির্বাচন বাতিল করে ৯০ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলো স্ব স্ব অবস্থান থেকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সারা দেশ অচল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সকল বিরোধী দলকে বাইরে রেখে একদলীয়, প্রতারণাপূর্ণ, কারচুপি ও জালিয়াতির নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিপূর্ণ নির্বাচন করতে পারেনি। তিনি আরও বলেন, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় সংবিধানের ৬৫(২) নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হয়েছে। সাংবিধানিক সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে অবিলম্বে এই প্রহসনপূর্ণ নির্বাচন বাতিল করা, অবৈধ সরকারের পদত্যাগ এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তার রেসিডুয়ারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

### *৫.৭.৭ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়া দেশের ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল মূলত অংশগ্রহণহীন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এক নির্বাচন। প্রচণ্ড গণআন্দোলনের চাপে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ৩০ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে পদত্যাগ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অনুযায়ী ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান মতে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৩ মার্চ, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২

জুন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিনটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। দ্বিতীয় বারের মত নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এ নির্বাচন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয় তা এ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশমিত হয়। এছাড়াও এ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। তা হলো এটি প্রথমবারের মত বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সাতটি নির্বাচনের মধ্যে সপ্তম সংসদ নির্বাচনেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। '৯১ এর নির্বাচনে প্রায় ৫৫.৫৪% ভাগ ভোট পড়ে। কিন্তু ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ৭৩.৬১% ভোট পড়ে।

১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট যত সংখ্যক ভোটার এবং মহিলা ভোটার তাদের ভোটাধিকারে প্রয়োগ করেন বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ নেই। এই নির্বাচনে ঋণখেলাপিরা অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ঋণখেলাপি বলে ঘোষিত যেসব ব্যক্তিকে বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন দেয়া হয় নির্বাচন কমিশন তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করে। নির্বাচনী আচরণমালায় কিছু কড়াকড়ি শর্ত আরোপ করা হয়। ব্যাপক সংখ্যক দেশি-বিদেশী পর্যবেক্ষক এ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে। এ নির্বাচন ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। সর্বোপরি বলা যায় যে, ১৯৯৬ সালের জুন মাসের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার এক মাইল ফলক।[৩৩]

*৫.৭.৮ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৯৬ সালের ১৩ জুলাই। কিন্তু সরকার-বিরোধী নানা অজুহাতে বিরোধী দল বিএনপি সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে এবং বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের পদত্যাগ দাবি করে। বিরোধী দল কর্তৃক বিভিন্ন দাবি ও আন্দোলন সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার পাঁচ বছর পূর্ণ করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ২০০১ সালের ১৫ জুলাই রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে শপথ বাক্য পাঠ করে বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

বিনির্মাণে একটি কার্যকর পদক্ষেপ। এ নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা ছিল উচ্চ এবং অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।[৩৪]

নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলই আদর্শের তোয়াক্কা করেনি। উভয় দলই শুধু বিজয়ী হওয়ার আশায় ধনী ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেয়। বিত্তবানদের মনোনয়ন দিতেয় তারা প্রতিপক্ষের দুর্গে আঘাত হানতে সচেষ্ট হয়। শুধু অর্থ ও বিত্তের জোরে জয় নিশ্চিত করতে চায়। তা করতে গিয়ে তারা নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ শুধু বিত্তের প্রতি লক্ষ রেখে ৪২টি আসনে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মনোনয়ন দান করে। অপরদিকে বিএনপি'র প্রার্থী তালিকায় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ছিলেন ৭২ জন। দলে সদ্য যোগ দিয়েই মনোনয়ন লাভ করেন ২৫ ব্যবসায়ী। এভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের প্রায় ১০০ জন কোটিপতি অর্থের বিনিময়ে নির্বাচনে জয়লাভ করার চেষ্টা করেন। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিনটি ছিল শান্তিপূর্ণ এবং ভোটাররা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে বাংলাদেশের একটি পত্রিকা *দৈনিক সংবাদ*-এ উল্লেখ করা হয়: "গতকাল বিপুল ভোটারদের অংশগ্রহণ এবং ব্যাপক উদ্যমের সাথে শান্তিপূর্ণ ৮ম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।"[৩৫]

সকল স্থানীয় ও বিদেশি দৈনিকগুলো শান্তিপূর্ণভাবে এবং ভোটারদের অধিক উপস্থিতিসহ নির্বাচন সম্পর্কে ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করে। নির্বাচনের দিন সামান্য কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও তা ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ভোটারদের অংশগ্রহণের দিক বিচার করলে ২০০১ সালের নির্বাচন অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙে ফেলে। ভোটারদের ভোট প্রদানের হার ছিল ৭৪.৫%।[৩৬] কারণ হিসেবে বলা যায় নির্বাচনের পূর্বেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনে উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা ভোটারদের উপস্থিতির পরিমাণ ছিল পূর্বের সকল নির্বাচনের চেয়ে বেশি। শুধু তাই নয়, নির্বাচনে নতুন ভোটারদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভোট প্রয়োগের হারও ছিল লক্ষণীয়।

অষ্টম জাতীয় সংসদ **নির্বাচন ও বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ:** ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপিসহ চার দলীয় জোট জয়লাভ করে। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচন নিয়ে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হয় তাতে সাধারণ মানুষের মাঝে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালের ১২ জুন এবং ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সে আশঙ্কা

দূর করে। বিশেষ করে ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি ও উদ্দীপনা দেশের গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা প্রতিষ্ঠা করে, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এক নতুন মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় যে, ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একদিকে যেমন জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে, তেমনি দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে উক্ত নির্বাচন সহায়ক হয়েছে।

*৫.৭.৯ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলের শেষ দিকে বিচারপতি কে. এম. হাসানকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং বিচারপতিদের বয়স বৃদ্ধি করার বিষয়টি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী দলই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, বিচারপতি কে. এম. হাসান অতীতে বিএনপি'র রাজনীতিতে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁকে পরবর্তী প্রধান উপদেষ্টা করার পরিকল্পনা থেকেই বিচারপতিগণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বিচারপতি মোঃ আব্দুল আজিজের নিয়োগ নিয়েও আওয়ামী লীগসহ বিরোধ দলসমূহের প্রবল আপত্তি ছিল।[৩৭]

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের আন্দোলনের ফলে প্রধান বিচারপতি কে. এম. হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এরপর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। বেগম খালেদা জিয়া ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে বিদায় গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ২৯ অক্টোবর শপথ গ্রহণ করেন।[৩৮] প্রথম থেকেই প্রধান উপদেষ্টার সাথে অন্যান্য উপদেষ্টার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এর ফলে ২০০৬ সালের ১১ ডিসেম্বর নানা কারণে ক্ষুব্ধ ৪ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। এঁরা হলেন ড. আকবর আলী খান, সি. এম. সফি সামি, সুলতানা কামাল এবং লে. জে. (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী। এ ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি পদত্যাগ করায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জনমনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩৯]

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট এ সময় নির্বাচন কমিশনার এম. এ. আজিজের পদত্যাগসহ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ত্রুটিমুক্ত নতুন ভোটার তালিকাসহ বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবি সামনে রেখে রাজপথে আন্দোলন করতে থাকে। পরে তারা মহাজোট গঠন করে।

মহাজোটের পক্ষে শেখ হাসিনা নির্বাচন বর্জন ঘোষণার পাশাপাশি ৭ ও ৮ জানুয়ারি অবরোধ ঘোষণা করেন। ৩ জানুয়ারি হাওয়া ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূইয়া ঘোষণা করেন যে, নির্দিষ্ট সময়েই নির্বাচন হতে হবে, বিকল্প কিছুই নেই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং প্রধান উপদেষ্টাও ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত প্রদান করেন। ৪ জানুয়ারি ঢাকার একটি পাঁচতারা হোটেলে অনুষ্ঠিত মহাজোটের এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান ও মহাজোটের প্রধান শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা ও প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইয়াজউদ্দিন আহমেদের পদত্যাগ ব্যতীত মহাজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।[৪০] শেখ হাসিনা ৫ জানুয়ারি সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা এবং ৭ ও ৮ জানুয়ারি পূর্ব-ঘোষিত অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এরপরও দাবি না মানা হলে এবং ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে না দাঁড়ালে বঙ্গভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচি দেয়া হবে।[৪১]

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শেখ হাসিনা বলেন যে, প্রহসনের নির্বাচন হবে দেখে মহাজোট নির্বাচন বর্জন বা প্রত্যাহার করেছে। এরপর ৬ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্বাচন হবে। জনগণের বৃহদাংশই অবরোধ কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করতে থাকে। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঢাকা প্রবেশের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। মূলত রাজধানী ঢাকা শহর সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি।[৪২]

এরূপ অবস্থার মধ্যে জনগণের দাবি, বিরোধী মহাজোটের আন্দোলনে চাপ এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ১১ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ সকাল ১০টা থেকেই বঙ্গভবনে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বৈঠক শুরু করেন। এ বৈঠক চলাকালে সেখানে সশস্ত্র বাহিনীর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানেরা প্রবেশ করেন। তাঁদের সাথে আরও ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক। তাঁরা ড. ইয়াজউদ্দিনের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। নির্বাচন অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। প্রথমে ইয়াজউদ্দিন রাজি না হলেও পরবর্তী পর্যায়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সেনাবাহিনীর তৈরীকৃত ভাষণ জাতির উদ্দেশ্যে দেন। সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রপতির ভাষণ ধারণ করে। ততক্ষণে দেশের মধ্যে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। স্বস্তি ফিরে আসে সাধারণ মানুষের মনে। আর নীতি নির্ধারকেরা পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান খুঁজতে

থাকেন। সেনাকর্মকর্তারা ড. ইউনুসকে প্রস্তাব দিলেও তিনি রাজি হননি। পরবর্তী পর্যায়ে তারা ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে রাজি করাতে সক্ষম হন।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ান। রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাতে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ বাতিল ঘোষণা করেন। ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭ টায় সংবিধানের ৫৮ (গ) ধারা মোতাবেক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারসমূহের বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা এবং আওয়ামী লীগ প্রধান তথা মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনাসহ অনেক রাজনৈতিক নেতা। তবে বিএনপি-জামায়াত জোটের কোনো নেতা এ অনুষ্ঠানে যাননি। প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্থগিত করেন। ১৩ জানুয়ারি রাত ৮টায় বঙ্গভনের দরবার হলে ৫ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান উপদেষ্টা আরও উপদেষ্টা নিয়োগ করেন এবং তাদের মধ্যে ২ জন ১৬ জানুয়ারি শপথ গ্রহণ করেন। বহুল আলোচিত ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুল আজিজকে ২১ জানুয়ারি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।[৪৩] ২৯ জানুয়ারি নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ড. ফখরুদ্দিন আহমদের সরকার ১৬ জন সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও নেতাকে গ্রেপ্তার করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ৫০ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়। ৭ মার্চ বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে গ্রেপ্তার এবং ৯ মার্চ হাওয়া ভবনে তল্লাশী চালানো হয়। ৯ এপ্রিল আওয়মী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা এবং ২৩ এপ্রিল হুলিয়া জারি করা হয়। ১৬ জুলাই শেখ হাসিনাকে ভোরবেলা তাঁর সুধাসদনের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২ সেপ্টেম্বর বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১২ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শুরু করে। ১ নভেম্বর আংশিক প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা হয়। ২৫ নভেম্বর সমগ্র প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা হয়। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হয়। ২০০৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর পুরাকীর্তি চুরির ঘটনায় মন্ত্রী হিসেবে নৈতিক দায় স্বীকার করে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী পদত্যাগ করেন। ২০০৮ সালের ৮ জানুয়ারি ৪ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। এবং ঐদিন রাতেই আবার নতুন করে ৫ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগ দেয়া হয়। এঁরা হলেন সাবেক সচিব এ. এম. এম. শওকত আলী, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ. এফ. হাসান আরিফ, জাতীয় নিরপাত্তা গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম কাদের, গণস্বাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে.

চৌধুরী এবং অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। ৯ জানুয়ারি ৫ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন। ১০ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমদ উপদেষ্টাদের দপ্তর বণ্টন করেন।

নির্বাচন সংক্রান্ত সব আশঙ্কা দূর করে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের দিনটি ছিল শান্তিপূর্ণ এবং সাধারণ ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। সকল দেশি ও বিদেশী পর্যবেক্ষক নবম সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এমন অভিমত প্রকাশ করেন। এই নির্বাচন নিয়ে যত আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে তা বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে পূর্বে আর হয়নি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার সকল প্রকার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এ নির্বাচনে নতুন ভোটারদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ ছাড়া মহিলা ভোটারদের উপস্থিতির হারও ছিল পূর্বের নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি করে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে বলা হয়। নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক হিসেবে প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।[৪৪] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সংসদের তিন-চতুথাংশ আসনে বিজয়ী হয়। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট মাত্র ৩০টি আসন পায়। নির্বাচন সুষ্ঠু হলেও এ নির্বাচন একটি দুর্বল বিরোধী দল উপহার দেয়।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ: সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনার কতকগুলো নিয়ম বা পদ্ধতি থাকে। একইসঙ্গে পদ্ধতি থাকে শাসকদের দায়বদ্ধ করার ক্ষেত্রে। বস্তুত গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে নিয়মতান্ত্রিকতা অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সম্পৃক্ততার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। আর এ সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। তাই নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের প্রথম নিয়ম বা ধাপ, বস্তুত নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয়। তবে নির্বাচন হলেই গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয় না। নির্বাচন হতে হয় সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হলে সব যোগ্য ভোটার সব ধরনের ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে বিনা দ্বিধায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নির্বাচনকে হতে হয় নিরপেক্ষ, যাতে দল-মত নির্বিশেষে সব প্রার্থীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে এবং নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে না। সেদিক থেকে বিচার করলে ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচন ছিল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। ২০০৬ সালে জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত যে জটিলতা বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করে যাতে গোটা

সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসনসহ সর্বত্র সংকটের সৃষ্টি হয় ২০০৮ সালের নির্বাচন তা দূর করে স্থিতিশীল রাজনীতি ও নির্বাচনের দিকে ধাবিত হয়।

নির্বাচনকে বিদেশী এবং দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে মন্তব্য করেন এবং তাঁরা বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে সহায়ক হবে।[৪৫]

*৫.৭.১০ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনটি ছিল একতরফা ও বিতর্কিত। এ নির্বাচনে ৪০টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে ২৮টি দল অংশ নেয়নি। বিএনপি- জামায়াতের চারদলীয় জোট নির্বাচন বর্জনসহ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ফলে নির্বাচনের পূর্বে এবং নির্বাচনের দিন ব্যাপক সহিংসতার সৃষ্টি হয়। তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোটের আগের দিন পর্যন্ত ৪১ দিনে ১২৩ জন ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। শুধু নির্বাচনের দিনেই ১৯ জন ব্যক্তি নিহত হয়। ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় এবং বহুলাংশে একটি ভোটারবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

একতরফা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনতার কারণে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বিশ্বব্যাপীও ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা এটিকে 'ফ্রড' বা ত্রুটিযুক্ত নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশও এই নির্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুলের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত নির্বাচন বিশেষজ্ঞ পিপা নারিস ও তাঁর সহকর্মীগণ এ নির্বাচনকে 'ফেইল্ড' বা ব্যর্থ নির্বাচন মন্তব্য করেন। এ ধরনের ব্যর্থ নির্বাচনের কারণে নতুন সরকারের 'লেজিটেমেসি' বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন ওঠে। একতরফা নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যহীনতার আশঙ্কায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের পূর্বে এই নির্বাচনকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষার নির্বাচন হিসেবে প্রচার করেন এবং দ্রুতই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সব দলের অংশগ্রহণে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করার ইঙ্গিত দেন। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হন।[৪৬]

নির্বাচনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কিন্তু দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই নির্বাচিত হয়। কাজেই এ নির্বাচন সাংবিধানিক মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। একতরফা নির্বাচনকে সঠিক নির্বাচন বলা যায় না। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ ও ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট (যার সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস), অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি

অনুযায়ী সঠিক নির্বাচনের শর্ত হলো: (১) ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন তারা ভোটার হতে পেরেছেন; (২) যারা প্রার্থী হতে চেয়েছেন তারা প্রার্থী হতে পেরেছেন; (৩) ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; (৪) যারা ভোট দিতে চেয়েছেন তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; (৫) সঠিক ভোট গণনা করা হয়েছে; এবং (৬) ভোট গ্রহণের পুরো প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।[৪৭] কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন এসব শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ ১৫৩ প্রার্থী জনগণের ভোট ছাড়াই 'জনপ্রতিনিধি' নির্বাচিত হয়েছেন। বাকি ১৪৭ আসনে মাত্র ৩৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বনিম্ন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও প্রার্থী সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের ৪১টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে মাত্র ১২টি দল অংশ নিয়েছে। ফলে পুরো নির্বাচনটিই ছিল ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যথেচ্ছাচার নির্বাচনে নাগরিক অধিকারও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্বল থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। সুশাসনের অভাব ঘটে। ফলে তরুণ প্রজন্ম এ নির্বাচনে হতাশা প্রকাশ করে। এরকম নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয়।

### *৫.৭.১১ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন*

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় পায়। ২০১৮ সালের ৮ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষণায় ২৩ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হলেও ১২ নভেম্বর পুনঃতফসিলে তা পিছিয়ে ৩০ ডিসেম্বর নির্ধারিত হয়। নির্বাচনে বড় দুটি দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে গঠিত যথাক্রমে মহাজোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টসহ বাংলাদেশের নিবন্ধিত সর্বমোট ৩৯টি দল অংশগ্রহণ করে। ১,৮৪৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৬টি নির্বাচনী আসনে সম্পূর্ণভাবে ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হয়।

শুরুতেই ইভিএম নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়। এ নির্বাচনেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণের কারচুপির অভিযোগ ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই 'কতৃপক্ষের সহায়তায়' জাল ভোট দেয়া ও কেন্দ্র দখল করে সিল মারার অভিযোগ উঠেছে। ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ নিয়েই নির্বাচন শেষ হয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে অন্যতম একটি মৌলিক বিষয় হলো নির্বাচন। কাজেই বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা কলুষমুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি, তা না হলে এর প্রতি মানুষের যে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে তা দূর করা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা বদলের একমাত্র পন্থা। প্রতিটি সভ্য সমাজে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা বদলের পথ রুদ্ধ হলে সেখানে গণতন্ত্র প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তাই দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অব্যাহত রাখতে সুষ্ঠু নির্বাচনের বিকল্প নেই।

সকল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন সমান গুরুত্বের অধিকারী নয়। একক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন হয়, আবার বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও নির্বাচন হয়। তবে উভয় ক্ষেত্রে নির্বাচনের ধরন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। একক নির্বাচনে কোনো প্রতিযোগিতা থাকে না। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো পূরণ করে না। অপরদিকে বহুত্ববাদী নির্বাচনে বহুসংখ্যাক রাজনৈতিক দল বা বহুসংখ্যক ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, যা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যকে পূরণ করে।[৪৮]

সাধারণভাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বহুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীর সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন করা। গণতান্ত্রিক নির্বাচন বৈশিষ্ট্যগত কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীসহ জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে, যা নির্বাচনের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, যে নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থীদের নির্বাচনী কাজে বাক-স্বাধীনতা, জনসংযোগ করার স্বাধীনতা, উন্মুক্ত সরকারের সমালোচনা করার স্বাধীনতা এবং নির্বাচনী কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে সেই নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলা যায়।[৪৯] বর্তমান বাংলাদেশের চলমান সংকটের মূলে রয়েছে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান কে হবেন সে-বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। কেননা সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীকে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধান করা হয়েছে, ফলে গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভবের আশঙ্কা রয়ে যায়, যা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে। এ ক্ষেত্রে উদারনৈতিক মূল্যবোধ ও যুক্তিবোধ প্রয়োগ ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে বলা যায় : "বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হলে, বাংলাদেশকে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে একে গণতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি তথা উদারনৈতিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক যুক্তিবাদিতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সংকটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধান, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও

রাজনৈতিক মৌলিক পরিবর্তন। কেবলমাত্র নির্বাচনকালীন সাময়িক সংকটের সমাধান দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া, না যাওয়া নির্ধারিত হবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না।"[৫০]

### ৫.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন

সামরিক-শাসক জেনারেল এরশাদের আমলে নির্বাচনকালে ক্ষমতাসীন সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। এ সময় দেশের প্রায় সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলসহ দেশের সচেতন নাগরিকগণ ক্ষমতাসীন সরকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। এ দাবির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এ নতুন দিগন্ত হলো সম্পূর্ণ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান।

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এ ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে ১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয় ২৬ মার্চ ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর ৩০ মার্চ ১৯৯৬ সালে প্রাক্তন বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। ২০০১ সালের ১৫ জুলাই বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য ১৬ জুলাই ১০ জন উপদেষ্টা নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ২০০৬ সালের ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। কিন্তু এ সরকারের ব্যর্থতার কারণে ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত এবং এটাই ছিল সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ নির্বাচন। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই দেশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দিকে দাবিত হয়। কিন্তু এর পরপরই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের দাবি ওঠে সরকারি দলের পক্ষ থেকে। এর মধ্যেই নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানসম্মত নয় বলে একে চ্যালেঞ্জ করে একটি মামলা হয়। বিরোধী দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সোচ্চার থাকে। এর মধ্যেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত এক রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে অগণতান্ত্রিক বলেছেন, আবার অন্যদিকে পরবর্তী দুটি সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এখানে আদালতের রায়ের স্ববিরোধীতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিরাজমান রাজনৈতিক বাস্তবতাই এই স্ববিরোধীতার কারণ। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দুই দল বা জোট কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, এক দল বা জোটের প্রতি অন্য দলের কোনো আস্থা নেই। রাজনৈতিক অঙ্গনে এই আস্থাহীনতার পরিবেশের কারণেই হয়তো আদালত রায়ের ঘোষণার সাথে এমন অসংগতিপূর্ণ পর্যবেক্ষণ জুড়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে আস্থার পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যও হয়তো আদালত এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন হলে তাতে কারচুপি হবে, প্রশাসন তার পক্ষে কাজ করবে, সরকারের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সরকারি দল ভোগ করবে এবং বিরোধীদল তা থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল ক্ষমতাসীন দলের পক্ষেই যাবে। এ ধরনের নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট তথা একপাক্ষিক হবে; অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে না বিধায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এটিই বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতা। অথচ এই বাস্তবতাকে আমলে নেওয়া হয়নি। ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করে সংবিধান সংশোধন করা হয়। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ বা অভিমতের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে তাকে সরকারি দল বিবেচনায় নেয়নি। এটাই সরকারি দলের আচরণের অযৌক্তিক, অনুদার ও অগণতান্ত্রিক মন-মানসিকতার পরিচয়।[৫১] তবে সরকারি দল সংবিধান সমুন্নত রেখে সংসদীয় গণতন্ত্রের দ্বারা অব্যাহত রাখার কথা বলেন। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানসম্মত নয় এবং সংসদীয় রীতি বর্হিভূত একথা ঠিক কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এ সরকারের আমলে যে নির্বাচন হয়েছে তা সবাই মেনে নিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের নির্বাচনগুলোতে মানুষের আস্থাও ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। এ নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি বেশি লক্ষ করা যায়। নবম সংসদ নির্বাচনে প্রায় ৮৪ ভাগ ভোট প্রদানকারীর রায় থেকে বোঝা যায় সাধারণ ভোটারদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও অন্য সময়ের তুলনায় ভালো থাকে। কেননা এ সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করতে পারে। নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেইং ফিল্ড) তৈরি হয়। ফলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের দলীয় সরকারগুলোর অধীনে নির্বাচনগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তাতে ভোট প্রদানের হার কম এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যাও থাকে অনেক। এ থেকে বোঝা যায় যে, দলীয় সরকার অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচনে মানুষের আস্থার অভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিককালের নির্বাচনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নির্বাচনের প্রতি ভোটারদের অীনহা ও অনাগ্রহ

তৈরি হয়েছে। ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, আগ্রহ, আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও এখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

## তথ্যনির্দেশ


১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খন্ড-৫, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪১৭।

২. শরীফ আহমেদ চৌধুরী ও মোঃ আবু সালেহ, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ১৯৯০-২০০৮ : একটি পর্যালোচনা', তারেক শামসুর রহমান (সম্পা.) *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক*, পৃ, ৩৮১।

৩. *https://en.m.wikipedia.org.*

৪. আবদুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি*, দ্য সিসিবি বুক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৭০।

৫. ড. মাহবুবুর রহমান মোরশেদ, *সুশাসন ও উন্নয়ন*, আবদুল লতিফ মাসুম (সম্পা.), একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা , ২০০১, পৃ. ১৪৪।

৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা, পৃ. ১৯।

৭. আবদুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি*, দ্য সিসিবি বুক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৭০।

৮. Sir Ivor Jennings, *Cabinet Goverment*, Cambridge University Press, 3rd ed. 1959, p. 86.

৯. *Ibid*, p. 86

১০. *দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ জুন*, ১৯৯৪।

১১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিড়িয়া*, *বাংলা পিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খন্ড-৫, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪১৮।

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৮।

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৮।

১৪. বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন ১৯৯৬ প্রণীত হয়। একটি সংসদ সমাপ্ত হলে অথবা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সৃষ্টির জন্যে এ সংশোধন আইন প্রণীত হয়। সংবিধানের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পর এ সংশোধন আইন নতুন পরিচ্ছেদ হিসেবে সন্নিবেশিত হয়। ১৯৯৬ সালের ২৫-২৬ মার্চে এ আইনটি ষষ্ঠ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

১৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খন্ড-৫, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪১৯।

১৬. মিজানুর রহমান খান, *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা , ১৯৯৫, পৃ. ৫৩।

১৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,, খন্ড-৫, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪১৯।

১৮. Free and fair election must form part of a process of building political institutions and democratic culture. (*The Bangladesh observer*, 15 June, 1996).

১৯. *দৈনিক সংবাদ*, ৫ মে, ১৯৯৬।

২০. ফেমা (FEMA), *জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য*, মে ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ৭।

২১. Free election in which each voter has the oportunity an equal opportunity to express consent in the light of his own opinions and sentiments. (W.J.M. Mackenzi, *Free Elections*, George Allen & Union Ltd, Great Britain: 1958, P.13).

২২. হারুন রশীদ, *বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক সংকট: রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ*, বিশ্বদর্শন দিবস স্মরণিকা, দর্শন বিভাগ, ২০১৪, পৃ. ৩৪।

২৩. *The Constitulion of the People's Republic of Bangladesh*, as modified untill June 30, Dhaka,1994, p. 10.

২৪. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *গণতন্ত্র*, (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৮।

২৫. *প্রাগুক্ত*।

২৬. আবদুল হান্নান ঠাকুর, *নির্বাচন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৬৯।

২৭. মোঃ মোজাম্মেল হক, *রাজনীতি-নির্বাচন*, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা , ২০০৯, পৃ. ৫৫৪।

২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।

২৯. The daily of February , 16 and 19, 1996.

৩০. *The daily of February* , 16, 1996.

৩১. এস এম আনোয়ারা বেগম, *তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন*, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা , ২০১৩, পৃ. ১১৮।

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

৩৪. M. A. Mannan, *Elections and Democracy in Bangladesh*, Academia Publishers Library, Dhaka , 2005, p. 146.

৩৫. *Bangladesh Daily Observer*, October 2, 2001.

৩৬. *Report of the Bangladesh Election Comission, 2001*.

৩৭. S.A. Maleq, *Post One-Eleven Perspectives: Stream of Thoughts*, News and Views Publications, Dhaka , 2009, p. 26.

৩৮. *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ অক্টোবর, ২০০৬।

৩৯. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৬।

৪০. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ জানুয়ারি, ২০০৭।

৪১. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৬ জানুয়ারি, ২০০৭।

৪২. দৈনিক সংবাদ, ৯ জানুয়ারি, ২০০৯।

৪৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ জানুয়ারি, ২০০৭।

৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জানুয়ারি, ২০০৯।

৪৫. মোঃ মোজাম্মেল হক, *রাজনীতি-নির্বাচন*, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা , ২০০৯, পৃ. ৫৯৭-৯৮।

৪৬. *দৈনিক যুগান্তর*, ৫ জানুয়ারি, ২০১৬।

৪৭. বদিউল আলম মজুমদার, *সমকালীন রাজনীতি ও উন্নয়ন ভাবনা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা : ২০১৮), প্রাক-কথন।

৪৮. এস এম আনোয়ারা বেগম, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা , ২০১৩, পৃ. ১৮৩।

৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩।

৫০. হারুন রশীদ, *বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক সংকট: রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ*, বিশ্বদর্শন দিবস স্মরণিকা, দর্শন বিভাগ, ২০১৪, পৃ. ৩৭।

৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা

### ৬.১ ভূমিকা

পাশ্চাত্য জগতের ধারণা থেকেই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো গণতন্ত্রের ধারণাকে নিয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রাচীনকাল থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। এ ব্যতিক্রমী রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের নামও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে শাসকদের নির্বাচিত করা হতো। যেমন, রাজা গোপাল সিংহাসনে বসেন আনুমানিক ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। দেশের জনগণ তাঁকে এ আসনে বসিয়েছিলেন। কেননা এর পূর্বে দেশে অরাজকতা বিদ্যমান ছিল যাকে বলা হতো মাৎস্যন্যায়।[১] এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য গোপালকে রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসানো হয়। বৌদ্ধ লেখক লামা তারানাথ ষোড়শ শতাব্দীতে গোপালের নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে রমেশ চন্দ্র মজুমদার উল্লেখ বলেন:

> খ্রিষ্টাব্দ প্রায় আট শতকের মাঝামাঝিতে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা পরিত্রাণের জন্য একটি সাহসী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। পরিশেষে জনগণ বুঝতে পেরেছিল যে তাদের সকল অসুবিধা একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতির কারণেই হয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন স্থানের জনপ্রিয় নেতার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সার্বভৌমত্ব অনুশীলনের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও আত্মত্যাগের চেতনা নিয়ে তারা জেগে উঠেছিল এবং ঐচ্ছিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে বাংলার একমাত্র শাসক নির্বাচন করেছিল। জনস্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে পরাধীন করার এমন মহৎ দৃষ্টান্ত প্রতিটি যুগ, প্রতিটি জাতি স্থাপন করতে পারে না। ...এ মহান রক্তক্ষয়হীন বিপ্লব একটি গৌরবান্বিত ও সমৃদ্ধ যুগের সূচনা করেছিল যা বাংলা আগে বা পরে কখনও আস্বাদন করতে পারেনি।[২]

তবে শুধু বাংলাদেশে নয়, বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আসামেও একটি পাল বংশ রাজত্ব করেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও রাজা নির্বাচনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। এ দেশে রাজতন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রও বিদ্যমান ছিল। আর গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠা, যে অর্থে পেরিক্লিস গণতান্ত্রিক সরকারকে সব নাগরিকের সরকার বলেছেন, সে ধরনের সরকার ব্যবস্থা বজায় রাখা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিদের ভূমিকা রয়েছে। ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকে এখানে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিরোধমূলক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যার মধ্যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ওয়াহাবি আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলোকে সরাসরি গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলা না

গেলেও এদের লক্ষ্য ছিল জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এরপর কৃষক বিদ্রোহ ও উপজাতীয়দের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিশ শতকের প্রথম থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, এরপর খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন চলে। এ আন্দোলনের পরিচালনায় ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৭ সালে ভারতকে দুইভাগে ভাগ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তান অঞ্চলে মুসলিম লীগের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসলেও পরে সেখান থেকে সরে আসে। ফলে বাংলাদেশ অঞ্চলে নতুন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগ। এ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। এর লক্ষ্য ছিল বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের অবস্থান ছিল এর বিরুদ্ধে। তিনি বলেন:

> এটি আমি সব সময় বলেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শুধু লীগের অস্তিত্বই নয়, এর শক্তি পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও ক্ষমতার সমান। তাই আমি প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং আজ আমি এটাকে আবারও নিশ্চিত করে বলছি যে, আমি নিজেকে সর্বদা লীগের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিবেচনা করেছি। আমি নিজেকে কখনই গণপরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিবেচনা করিনি।[৩]

এ বক্তব্যের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু লেখেন:

> তিনি জনগণের প্রধানমন্ত্রী হতে চান নাই; একটা দলের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছেন। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল যে এক হতে পারে না, এ কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকতে পারে এবং আইনে এটা থাকাই স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয়, লিয়াকত আলী খানের উদ্দেশ্য ছিল যাতে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল পাকিস্তানে সৃষ্টি হতে না পারে। 'যো আওয়ামী লীগ করেগা উসকো শের কুচাল দে গা'—এ কথা একমাত্র ডিকটেটর ছাড়া কোনো বিশ্বাসী লোক বলতে পারে না। জিন্নাহর মৃত্যুর পর সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছিলেন।[৪]

বঙ্গবন্ধু বহুদলীয় গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। যেমন তিনি বলেন: 'বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।"[৫] তিনি ছিলেন বাংলার মানুষের নেতা। তিনি ক্ষমতার শিখরে থেকেও শেকড়কে ভুলে যাননি। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল ভালোবাসা। তিনি কখনও লক্ষ্যচ্যুত হননি। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। তিনি নেতা বলতেন তাকে, যে মানুষের প্রতি অন্যায় করবে না এবং মানুষের জন্য তিনি হবেন নিবেদিত প্রাণ। যদি কোনো নেতা এর ব্যতিক্রম করে তবে জনগণই তাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। এ প্রসঙ্গে

তিনি উল্লেখ করেন: "কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। যেমন—হযরত ওমর (রা.) কে সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন করছিলেন, তিনি বড় জামা পরেছিলেন বলে।"[৬] তিনি মনে করেন জনগণের ভালোবাসা হলো শক্তি। এ শক্তির মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত নেতা হতে পারে এবং এ শক্তির বলেই বঙ্গবন্ধু মহান নেতা হয়েছিলেন। একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সুখী সমৃদ্ধশালী উন্নত বাংলাদেশ ছিল তাঁর স্বপ্ন-সাধ, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'সোনার বাংলা'।[৭]

### ৬.২ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যায়ে বাংলাদেশ গণতন্ত্র পেলেও ৭৫-এর পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী ধারার সূত্রপাত ঘটে। আর এই ধারাটির সূচনা ঘটে বঙ্গবন্ধুর হাতেই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যদিও বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল ইতিবাচক, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি এবং এ ধারা পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে যায় সামরিক শাসকদের দ্বারা। বাংলাদেশে নতুন করে ফিরে আসে পাকিস্তানি ধরনের সামরিক শাসন। জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এ ধারার নেতৃত্ব দেন। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তা মেনে নেয়নি। ফলে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন এবং একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা ফিরে আসে।

নির্বাচন তখনই সুষ্ঠু ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা রাজনৈতিক সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা হলো যুক্তিবোধ ও নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক ইচ্ছা। নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক না কেন, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় যদি সৎ হয় অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পন্থায় যদি গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে সেটা হবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা।[৮] যে-কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনীতির একটি দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। এ দার্শনিক ভিত্তিটি হলো উদারনৈতিকতা ও যুক্তিবাদিতা।[৯] কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিতে এ দার্শনিক ভিত্তির অভাব রয়েছে। একই সাথে রয়েছে সাংবিধানিক ত্রুটি। বাংলাদেশের সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ইচ্ছামাফিক কাজ করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের অন্যতম কারণ এই সাংবিধানিক ত্রুটি। কেননা এ ধরনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অনেক সময় স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দেয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হলো সংবিধান থেকে অগণতান্ত্রিক উপাদান বাদ দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করা।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার চারটি মূল স্তম্ভ হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র। এ চারটি লক্ষ্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গণতন্ত্র। কাজেই জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। অথচ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বার বার ব্যাহত হয়েছে।[১০] এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়:

> রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আরেকটি উৎস। রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মত প্রধান দলগুলো একে অপরকে সহযোগিতা করে না; ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে ও বজায় রাখতে তারা পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অবিশ্বাস, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ এবং প্রতিহিংসাপরতা তাদের মাঝে বিদ্যমান। তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও গঠনমূলক সমালোচনার অস্তিত্ব নেই।[১১]

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে থাকলেও উন্নত দেশের ন্যায় গণতন্ত্র এখানে বিকশিত হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের গণতন্ত্রের সার্বিক মূল্যায়নে বাংলাদেশের স্থান পঞ্চম। মালদ্বীপ ও পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দেশের অবস্থান বাংলাদেশের ওপরে। ভারত ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূল্যায়নের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান শ্রীলংকা, ভুটান ও নেপালের নিচে। বাংলাদেশ সার্বিক মূল্যায়নে মাত্র ৪৯ নম্বর পেয়েছে, অথচ পরিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক দেশের মূল্যায়নে ১০০ নম্বর পেয়েছে এমন দেশও রয়েছে। শুধু মূল্যায়নের দিক থেকেই বাংলাদেশের অবস্থান উদ্বেগজনক নয়, ২০১৭ সালের মূল্যায়ন থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে। দুর্নীতি, মানবাধিকার লংঘন ও জঙ্গিবাদের তৎপরতাকে এজন্য দায়ী করা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে উন্নয়নে বাংলাদেশের সজাগ হওয়ার বিকল্প নেই।

মার্কিন সংগঠন ফ্রিডম হাউস[১২] পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহকে গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে: ১. পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা স্বাধীন রাষ্ট্র, ২. আংশিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা আংশিক স্বাধীন রাষ্ট্র এবং ৩. অগণতান্ত্রিক বা স্বাধীন নয় এমন রাষ্ট্র। ২০১৭ সালের মূল্যায়নে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা অপর পৃষ্ঠায় ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:[১৩]

| রাষ্ট্রের শ্রেণি | মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা | দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের নাম | সার্বিক মূল্যায়নে দক্ষিণ এশিয়াতে অবস্থান |
|---|---|---|---|
| স্বাধীন | ৮৬ | ভারত – স্বাধীন | ১ম (সার্বিক মূল্যায়নে-৭৭) |
| আংশিকভাবে স্বাধীন | ৫১ | শ্রীলঙ্কা – আংশিকভাবে স্বাধীন<br>ভুটান – আংশিকভাবে স্বাধীন<br>নেপাল – আংশিকভাবে স্বাধীন<br>বাংলাদেশ – আংশিকভাবে স্বাধীন<br>মালদ্বীপ – আংশিকভাবে স্বাধীন<br>পাকিস্তান – আংশিকভাবে স্বাধীন | ২য় (সার্বিক মূল্যায়ন-৫৬)<br>২য় (সার্বিক মূল্যায়ন-৫৬)<br>৩য় (সার্বিক মূল্যায়ন-৫৪)<br>৪র্থ (সার্বিক মূল্যায়ন-৪৯)<br>৫ম (সার্বিক মূল্যায়ন-৪৩)<br>৬ষ্ঠ (সার্বিক মূল্যায়ন-৪১) |
| স্বাধীন নয় | ৫০ | ----- | ----- |
| মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা | ১৯৫ | ----- | ----- |

Source: Freedom house 2017. Freedom in the world 2017

## ৬.৩ স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপসমূহ

গত চার দশকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যে উত্থান-পতন সেখান থেকে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যেতে পারে:

### ৬.২.১ *অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন*

প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের ক্ষেত্রে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য এটি প্রয়োজনীয়। শুধু নির্বাচন কমিশনের সংস্কারে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে রবার্ট ১৯৬৯ সালে ১২৪টি রাষ্ট্রের ৩৫টিকে বহুমাত্রিক গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করেন।[১৪] ১৯৮১ সালে ডেভিড বাটলার ও অন্যান্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অবাধ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ২৮টি রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেন।[১৫] ১৯৫৮-৭৬ সালের মধ্যে

অন্ততপক্ষে পাঁচ বছরব্যাপী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকর ছিল এমন রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে বিংহ্যাম পাওয়েল ১৯৮২ সালে তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেন ২৯টি।[১৬]

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের পরিবেশকে ভিত্তি করে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত *Democracies* গ্রন্থে লিজফার্ট জাতিসংঘের সদস্য ১৫৯টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৫১টিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করেন।[১৭] তবে দীর্ঘকালীন পরিসরে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণইচ্ছার প্রতিফলনের প্রেক্ষিতে তিনি ২১টি রাষ্ট্রকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক বলেন। আমরা লিজফার্টের এই ২১টির সাথে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়াকে যোগ করে ২৪টি কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পর্যালোচনা করতে পারি। বহু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়া এগিয়ে চলেছে গণতন্ত্রের পথে।[১৮]

কিন্তু বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে পিছিয়ে পড়ছে। যে-দেশে নির্বাচন কমিশন ভোটার আইডি কার্ডের মতো একটি মামুলি অথচ অপরিহার্য কাজ ১৪ বছরেও সম্পন্ন করতে হিমশিম খাচ্ছে, সে দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কে জাতীয় ঐক্যমত্যের প্রয়োজন রয়েছে।

### ৬.২.২ *আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা*

বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যবস্থায় জয় শুধু একজন প্রার্থীরই হয় না, জয়ের ফলাফল আনুপাতিক হারে বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। যদি জাতীয়ভাবে অনুপাত নির্ধারণ করা হয়, তাহলে যে-দল নির্বাচনে যে-পরিমাণ ভোট পাবে, সেই হারে সে-দল সংসদে আসন পাবে। বর্তমান সংখ্যাগুরু ভোটভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। ফলে এ প্রতিনিধিরা স্থানীয় সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব প্রদান করে। বাংলাদেশে সম্পূর্ণ আনুপাতিক হারে অথবা সংখ্যাগুরুভিত্তিক নির্বাচনের মিশ্র ব্যবস্থা প্রর্বতন করা যেতে পারে। প্রথমত, যেখানে নির্বাচনী এলাকায় এক ভোট বেশি পেলে নির্বাচিত হওয়া যায়, সেখানে ভোট জালিয়াতির আশংঙ্কা বাড়ে। কারণ প্রত্যেক প্রার্থীই যত বেশি জাল ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন ততই জয়লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে ফলাফল এক ভোট বা স্বল্পসংখ্যক সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচনে একটি আসন

লাভের জন্য তিন লাখ ভোট জাল করতে হয়। কারণ, সব দল জালিয়াতি করলে ভোটের ফলাফলে জয়ের প্রভাব তেমন থাকে না। সে-কারণে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে জালিয়াতির আশঙ্কা কমে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বর্তমানে সংঘাতের রাজনীতি বিরাজ করছে। প্রধান দলগুলোর মধ্যে কোনো আলাপ-আলোচনার চর্চা নেই। আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেবে। এর ফলে সংঘাতের রাজনীতি যে অবিশ্বাসের দেয়াল গড়ে তুলেছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই ভেঙ্গে যাবে। আনুপাতিক হারে নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনরায় সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তৃতীয়ত, আনুপাতিক হারে নির্বাচনের ফলে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের প্রতিফলন ঘটবে। চতুর্থত, আনুপাতিক হারে নির্বাচনে দলগুলো বিশেষজ্ঞদের মনোনয়ন নিতে পারে। এতে সংসদে কাজের মান উন্নত হবে।[১৯]

### ৬.২.৩ *গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণ*

বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে, যেখানে জনগণ একদিনের জন্য ক্ষমতার স্বাদ নেয়, শুধু ভোটের দিন। এরপর রাষ্ট্রে নির্বাচিত দল দেশ পরিচালনা করে। রাজনৈতিক দলগুলো অধিকাংশ সময় তাদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে-কারণে বড় বড় রাজনৈতিক প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গণভোট ও প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সমন্বয় সম্ভব। তবে 'রিকল' বা নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সমন্বয় সম্ভব নয়। তাই যদি অনেক ক্ষেত্রে রিকল ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা যায়, তবুও এ মুহূর্তে তা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় হবে না।[২০] তবুও কোনো কোনো দেশে 'রিকল' ব্যবস্থা বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহারের জন্য ভোট অনুষ্ঠানের বিধান করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুফল পাওয়া সম্ভব, কিন্তু এর কুফল এত বেশি যে, কোনো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারে এ ব্যবস্থা চালু করা বেশ চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯টি অঙ্গরাজ্যে, যেমন ক্যালিফোর্নিয়াতে রিকল ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে একটি বড় বিতর্ক রয়েছে। এ বিতর্কে মূলত দুটি বৃহৎ বিরোধী রাজনৈতিক দল জড়িত রয়েছে। কিন্তু তাদের হাতে না দিয়ে যদি বিষয়টা গণভোটের মাধ্যমে জনগণের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা অনেক সহজ হতে পারে।

### ৬.২.৪ *উদারনৈতিক মূল্যবোধ*

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে উদারনৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা রয়েছে। এতে মনে করা হয় যে, সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তির কল্যাণে নিয়োজিত।[২১] বাংলাদেশে উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রসার জরুরি। এ কারণে অনুদার গণতন্ত্রকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রূপান্তর বা পরিবর্তন প্রয়োজন। গণতন্ত্রের বিকাশে উদারনীতির বিশেষ ভূমিকাকে কেবল গণতন্ত্রের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক হবে না। গণতন্ত্রের ব্যাপ্তি আরও ব্যাপক, তাকে দেখা উচিত আরও সম্প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, নাগরিক অধিকার, মানবিক অধিকারসহ আধুনিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে—মানবিক গুণাবলির প্রকৃত বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবে।[২২] গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মেধার বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় বলেও আমরা গণতন্ত্রকে সমর্থন করি। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, চারুকলা ও সংস্কৃতি এসব ক্ষেত্রে মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ না থাকলে দেশের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। আর এ অন্তর্ভুক্তি গড়ে উঠতে পারে কেবল উদারনৈতিক পরিবেশে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল, সেখানে মহান কিছু উদ্ভাবন যন্ত্রশিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল, সেই উদ্ভাবনের বেশিরভাগই এসেছিল সাধারণ ও মেহনতি মানুষের মেধা থেকে। এটা সম্ভব হয়েছিল আপামর জনগণের অন্তর্ভুক্তির কারণে। এ কারণে ইংল্যান্ড বিশ্ব অর্থনীতির চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ফলে যেসব দেশ এই উদারনৈতিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়েছে সেখানে সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর প্রসার ঘটলেও অনেক ক্ষেত্রেই এর অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি বলে গণ্য যে আইনের শাসন, ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এসব ক্ষেত্রে উদারনৈতিক মূল্যবোধ অনুপস্থিত। এর জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন।

### ৬.২.৫ *হুইসেলব্লোয়ার আইন প্রয়োগ*

হুইসেলব্লোয়ার আইন হলো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, যা ২০১১ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাশ হয়। আইনটির উদ্দেশ্য হলো জনস্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তি যদি সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কোনো কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করে তাকে সুরক্ষা প্রদান। গণতন্ত্রে সকল নাগরিক যাতে সমান সুযোগ ভোগ করতে পারে সে-লক্ষ্যে আইনটি তৈরি করা হয়। তবে এর অপপ্রয়োগ হলে শাস্তিরও বিধান রয়েছে। আইনের ২(৪) ধারায় সরকারি অর্থের অনিয়মিত ও অননুমোদিত ব্যয়; সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা; সরকারি সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ বা অপচয়; ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা; ফৌজদারি অপরাধ বা বেআইনি বা অবৈধ কার্য সম্পাদন; জনস্বার্থ,

নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ বা কোনো কার্যকলাপ; অথবা দুর্নীতি' বিষয়ক তথ্য 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[২৩]

৬.২.৬ *সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন*

সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্যতীত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব নয়। কেননা যখন দেশের গণতান্ত্রিক সরকার স্বৈরাচারী আচরণ করে এবং একক সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ মনে করে তখন প্রয়োজন তাদের কর্মকাণ্ডকে চ্যালেঞ্জ করে আন্দোলন করা। সক্রিয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয়। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহযোদ্ধা হতে পারে। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে শক্তিশালী সিভিল সমাজ প্রয়োজন, যা ছাড়া গণতন্ত্রকে সুসংহত করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। বহু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গণতন্ত্রের চর্চাই একে বাস্তব ভিত্তি দেয়। গণতন্ত্র মানুষের জীবনে স্থায়ী ভূমিকা রাখে। মানুষ রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে যেসব আদর্শকে চর্চা করে সাফল্য পায় সেসব ক্ষেত্রে আদর্শই সঠিকরূপে প্রমাণিত হয় এবং এ চর্চা ও অনুশীলন ক্রমাগত চালালে আদর্শটি বিকশিত হয়। দলগত সংগ্রাম ছাড়া গণতন্ত্র বজায় রাখা অনেক সময় কঠিন হয়। সংগ্রাম প্রসঙ্গে অ্যান্থনি গিডেন্স যথার্থই বলেছেন: "সংগ্রাম ব্যতীত কিছুই অর্জিত হয় না। কিন্তু সর্বস্তরে গণতন্ত্রের অগ্রগতি সাধনে যৌক্তিক সংগ্রামের মাধ্যমে তা অর্জন করা যেতে পারে।"[২৪] গণতন্ত্রের সংকটকালে দলগুলো সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। কাজেই এ ধরনের সঙ্কটময় মুহূর্তে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার যে বর্জন, প্রতিরোধ ও অংশগ্রহণ এর কোনটা দলের, দেশের ও রাষ্ট্রের স্বার্থে বাঞ্ছনীয়। আবেগ নয়, জেদ নয়, যুক্তি-বুদ্ধিই এক্ষেত্রে পুঁজি, পাথেয় ও দিশারী হওয়া শ্রেয়।[২৫]

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এদেশে এখনও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী পারিবারিক আইনগুলো বিদ্যমান, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সেই দিক থেকে একে যথার্থ ধনতান্ত্রিক তথা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশ বলা যায় না। সরকার অনেক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বা শ্রেণির স্বার্থে চালিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যখন যে-দল ক্ষমতায় আসে তখন সে-দলের একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হতে দেখা যায়। গোষ্ঠীতন্ত্রের আড়ালে স্বৈরতন্ত্র ক্রিয়াশীল থাকে। কাজেই বাংলাদেশে যে সঠিক গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হচ্ছে তা বললে ভুল হবে না।

প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাংলাদেশে এর বিপরীত চিত্র বিদ্যমান। এখানে জনগণ নয়, ব্যক্তি নেতাই (দলের নেতা, সংসদ নেতা, সরকার প্রধান) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাশীল নেতৃত্বের অভাবেই আমাদের সামাজিক-

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে উন্নতির সম্ভাবনা ছিল তা ব্যাহত হচ্ছে, যার প্রভাব দেখা যায় অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক এমনকি শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও। বাংলাদেশের নেতারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও গণতন্ত্রের বাস্তবায়নে তাদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। তাদের মধ্যে নেতৃত্ববিলাসী, কর্তৃত্বকামী, আধিপত্য বিস্তারের মনোভাব, আভিজাত্যবাদী জীবনযাপন, এরকম আরও অনেক শোষণমূলক প্রবৃত্তি রয়েছে। তারা বিভিন্ন আশ্বাসের আড়ালে মানুষের সাথে প্রতারণা করে। লোভের বশবর্তী হয়ে তারা চেতনা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে দ্বিধা করে না। এক দল থেকে হঠাৎ করেই স্বার্থের আশায় অন্য দলে যোগ দেয়। এছাড়াও দল ভাঙ্গার পেছনে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও লালসা জড়িত। মানবীয় এ জটিল রূপ উদ্ঘাটনে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ জরুরি। ক্ষমতা ও সম্পদ পেলে মানুষ তার অপব্যবহার  করবে না তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একই মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, সুন্দর-কুৎসিত, ভুল–শুদ্ধ, সম্ভব-অসম্ভব, কর্তব্য-অকর্তব্য, শ্রেয়-প্রেয়, ভালো-মন্দ ইত্যাদি নির্ণয়ের বিচারশক্তি আছে; স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সমবেদনা, করুণা ও বিবেক আছে এবং বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ভালো জীবনযাপনের আন্তরিক তাড়না আছে। মানুষের সত্তায় খারাপের পাশাপাশি ভালোও আছে।[২৬]

একথা সত্য যে, ভালো-মন্দের মিশ্রণে মানুষ। সুনামের জীবনের জন্য যেমন খারাপ প্রবণতাকে দমন করতে হয়, তেমনি সমাজে ইতিবাচক অর্থে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে ভালো নেতৃত্বের প্রয়োজন। কেউ কেউ হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে নেতৃত্বে আসতে চায়। আবার কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমষ্টিগত স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়। ভালো নেতৃত্ব তৈরিতে নেতা ও জনসাধারণের ভূমিকা থাকে। সম্মিলিত চেষ্টায় ভালো নেতা নির্বাচন করা সম্ভব হয়। পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, শোষণ, পীড়ন, বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মূলে আছে মানবিক তাড়না। তাড়না, কামনা, বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করে অন্যের সেবায় নিয়োজিত হতে পারলে ভালো নেতা হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভালো নেতৃত্বের অভাব লক্ষ করা যায়। নেতৃত্ব এমন এক মহৎ গুণ যা আপনা-আপনি বিকাশ হয় না। জনগণের ভূমিকা, জনগণের সতর্ক প্রয়াস ভালো নেতৃত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত ভালো নেতৃত্ব তৈরি হওয়া কঠিন। মহৎ নেতৃত্ব অর্জনে জনগণের সক্রিয়তা দরকার। জনগণের নিষ্ক্রিয়তা ভালো নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রে বাধা। নেতৃত্বের গুণাবলি, যেমন চরিত্রবল, সর্বজনীন কল্যাণপ্রয়াস, অধ্যবসায়, দূরদর্শিতা, সাহস, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধাযোগ্য ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি জন্মগতভাবে কেউ সঙ্গে নিয়ে আসে না, সাধনা ও সংগ্রাম দ্বারা অর্জন করতে হয়। একই সাথে জনসমর্থনেরও প্রয়োজন। মহৎ নেতৃত্বের সফল আত্মপ্রকাশে  জনগণেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়, জনগণ নিষ্ক্রিয় থাকলে কিছুই হয় না।[২৭]

গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রাখতে হলে আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতির চর্চা থেকে বের হতে হবে। দুর্বল গণতন্ত্র দ্বারা মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুস্থ ও উদার রাজনীতির চর্চার মাধ্যমেই একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক, তথা মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। আমরা সবাই গণতন্ত্র চাই, কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি শ্লোগান দিয়ে কিংবা মেনিফেস্টোতে লিখে অর্জন করার বিষয় নয়। এটি চর্চার বিষয়। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে মূল্যবোধ ও আদর্শ হিসেবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা এখন সময়ের দাবি।

## তথ্যনির্দেশ


১. শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রথমে গৌড়রাজ্য এবং তারপর সারা বাংলাই এক মস্তবড় বিপর্যয়ের কবলে পড়ে। শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই তাঁর প্রবল দুই শত্রু হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণ বিশাল গৌড়রাজ্য ধ্বংস করেন। এরপর প্রায় শতাব্দীকাল যাবৎ বাংলায় অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মকলহ ও পুনঃপুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ চলতে থাকে। ফলে দেশের কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙ্গে যায় এবং দেশ সামন্ত-প্রধানদের অধীনে শতধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশে তখন এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। এই অরাজকতাই 'মাৎস্যন্যায়'।

২. R.C. Majumder, *The Age of Imperial Kanauj:The History and Culture of Indian People*, Vol-4, Bomby, 1959, P.44.

৩. শেখ মুজিবর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৩৪।

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-৩৪।

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪।

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

৭. র আ ম উবায়দুর মোকতাদির চৌধুরী, *বাংলাদেশের গণতন্ত্র কোন পথে*, মত ও পথ, ঢাকা, ২০১৫ পৃ. ৫৩।

৮. হারুন রশীদ, 'বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট: রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ', *বিশ্বদর্শন দিবস স্মরণিকা ২০১৪*, দর্শন বিভাগ ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪, পৃ. ৩৪।

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

১০. আকবর আলী খান, *অবাক বাংলাদেশ: বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৫৮।

১১. J. Feroj, *Democracy in Bangladesh Conflicting Issue and Conflict Resolution,* Bangla Academy, Dhaka : 2012, P. 60.

১২. ফ্রিডম হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এবং মার্কিন সরকারের তহবিলযুক্ত বেসরকারী সংস্থা যা গণতন্ত্র, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত গবেষণা ও সমর্থন পরিচালনা করে। ফ্রিডম হাউস ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভেন্ডেল উইল্কি এবং এলানর রুজভেল্ট প্রথম চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করেন।

১৩. Freedom House 2016. Freedom in the World 2016, p. 18.

১৪. R. Dahl, *Polyarchy*, *Participation and Oppsoition*, Yale University Press, New Haven, 1971, pp. 231-249.

১৫. D. Butler, Howard Penniman and Austin Ranney (ed.), *Democracy at the National Elections*, American Enterprise Institute, Washington, 1981, pp 2-5.

১৬. B. Powell, *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*, Harvard University Press, Cambridge, 1982, p. 1-7.

১৭. A. Lijphart, *Democracies*, Yale University Press, New Haven, 1984, p.68.

১৮. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (সম্পা.), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৫।

১৯. আকবর আলী খান, *অবাক বাংলাদেশ: বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৬০।

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।

২১. V.D. Mohajan, *Recent political Thought*, S. Chand and Company Ltd., New Delhi, 1990, P. 605.

২২. বদরুল আলম খান, *গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১১৩।

২৩. বদিউল আলম মজুমদার, *রাজনীতি, দুর্নীতি ও নির্বাচন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৬।

২৪. A. Giddens, *Runway World, How Globalization Is Reshaping Our World*, Profile Books, London, 1999, P. 82.

২৫. আহমেদ শরীফ, *রাজনীতির সঙ্কট: অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য রচনা*, মহাকাল, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৮।

২৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *অবক্ষয় ও উত্তরণ*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৪।

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

সপ্তম অধ্যায়

# গণতন্ত্রের সংকট ও ভবিষ্যৎ

## ৭.১ ভূমিকা

গণতন্ত্রের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের এক ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি রয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যে-তিনটি দেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ভারতের শাসনপদ্ধতিকে ভালো হিসেবে মনে করা। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন বিকশিত হয়েছে, যা তাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অনেক সাফল্য এনে দিয়েছে। এছাড়াও ইউরোপের উন্নত দেশের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাও এদেশের মানুষকে প্রভাবিত করেছে। যেমন, ব্রিটেনের একসময়ের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল গণতন্ত্রকে উচ্চমার্গে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর শাসনামলে দেখা যায় যে, অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের ঠিক সমকক্ষ নয়। চার্চিলের শাসনপদ্ধতি ও বিভিন্ন বক্তব্য গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জোরদার করতে সাহায্য করেছে। শাসনের মাধ্যম হিসেবে বর্তমানে গণতন্ত্রের বিকল্প কল্পনা করা বেশ কঠিন, তবে এটাকে নিখাঁদ শাসনব্যস্থা বলা ঠিক হবে না।

গণতন্ত্র সভ্য সমাজের নিদর্শন এবং আধুনিক জীবন-পদ্ধতির অন্যতম দিকদর্শন। সার্বজনীন স্বাধীনতায় প্রগতিশীল ও আলোকিত জনগণের অভিমত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব। ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে গণতন্ত্র যেমন সম্মান করে, তেমনিভাবে সমগ্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই পৃথিবীব্যাপী মানুষ শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই উন্নয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যথার্থ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। গণতন্ত্রকে বিবেচনা করা হয় প্রগতিশীল সরকারের প্রতিচ্ছবি হিসেবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, গণতন্ত্র হচ্ছে রাজনৈতিক চর্চার স্বাধীনতা, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে নিশ্চয়তা দেয়ার সুযোগ।[১] খোলা মনে গণতন্ত্রের চর্চা, সংরক্ষণ ও শিক্ষার স্বার্থে নিয়মিতভাবে নির্বাচন, জনপ্রিয় পদ্ধতিতে ভোট দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার, যেখানে বলপ্রয়োগ অথবা দমননীতির কোনো অবকাশ থাকবে না। বাস্তবে গণতন্ত্রে যে-বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দান। তত্ত্বগতভাবেই গণতন্ত্রে জনগণের মতামত ও সংগঠনের অবাধ অধিকারকে স্বীকার করা হয়।

গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের[২] মতে, জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ শাসনের নামই হলো গণতন্ত্র।[৩] পরিবার, পাড়া, ক্লাব, কর্মক্ষেত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র যাই হোক, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কোনো না কোনোভাবে

এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব সংঘ সবসময় সামগ্রিক স্বার্থে কিছু না কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এগুলো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তগুলো মানুষ গ্রহণ করে থাকে পুরোপুরি নিজের স্বার্থে, গণতন্ত্র সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে পড়ে।[৪] সমগ্রের খাতিরে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা যেন সব সদস্য মিলে নেন এবং তাদের প্রত্যেকের যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে ভাগ নেওয়ার সমান অধিকার থাকে। গণতন্ত্রে তাই দুটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে জনগণের নিয়ন্ত্রণ এবং সে-নিয়ন্ত্রণে সবার সমান অধিকার।[৫] যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ বিষয়গুলো বহাল থাকলে তাকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলা যায়। এ কারণে পৃথিবীব্যাপী মানুষ শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই উন্নয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

একটি নীতিদার্শনিক প্রত্যয় হিসেবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উদ্ভব প্রাচীন গ্রিসে হলেও পৃথিবীব্যাপী এর বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। প্রাচীন গ্রিসের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছিল এক ধরনের জীবনদর্শন, যে-জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল জনগণ ও জনগণের সার্বিক বিকাশ। তারা গণতন্ত্রের মূল্যবোধগুলোর ওপর বিশ্বাসের সাথে সাথে বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তারা মনে করতেন, এ মূল্যবোধ থেকে যে-কোনো বিচ্যুতি দেশ ও জাতির জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে। গ্রিসবাসী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকে রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থা হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। এ কারণে তাদের রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও জীবনযাত্রায় জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব বাড়ানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়; তেমনি সমাজের সকল মানুষের অংশগ্রহণের কারণে তাদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নতি হয়েছিল চোখে পড়ার মতো।

গ্রিক সভ্যতার পতনের দু'হাজার বছরের মধ্যে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণের কথা ইতিহাসে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রিক সভ্যতার পতনের পর রেনেসাঁর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশেই সত্যিকার অর্থে আদর্শ ও মূল্যবোধের ওপর রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, তথা মানবীয় অধিকার, যুক্তিবাদিতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি মূল্যবোধগুলো পুনর্জাগরণের সুযোগ লাভ করে।[৬] গ্রিসের পর রোমান সভ্যতা, আধুনিক ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশে আজ পর্যন্ত যে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা লক্ষ করা গেছে তা সবসময়ই কিছু না কিছু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক হয়েছে। এসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সব সময়ই ব্যক্তির বাক-স্বাধীনতা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশগ্রহণ এবং আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সাম্যের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র বারবার হোঁচট খেয়েছে, আর ব্যবস্থা হিসেবে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনে অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলও

ভাবনাগুলোকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। আজকের গণতান্ত্রিক দেশগুলো শাসিত হয়েছে স্বৈরাচারী কায়দায়, কখনো সরাসরি সামরিক কর্তৃত্বে, কখনো বেসামরিক ছদ্মবেশে। এখন মূল প্রশ্ন হলো ব্যবস্থার ন্যায্যতার কী মূল্য থাকে, যদি আদর্শ ও মূল্যবোধের ন্যায্যতা না থাকে? আদর্শের অনুপস্থিতি কার্যত মূল্যবোধের ক্ষয় পাওয়া অর্থাৎ মনুষ্যত্বের গভীর সংকট সৃষ্টি হওয়া। বিশ্বব্যাপী এ সংকট নানাভাবে ফুটে উঠেছে। কাজেই বিশ্ববাসীকে বিশেষভাবে ভাবতে হচ্ছে, গণতন্ত্রের পরিণতি নিয়ে, গণতন্ত্রে মনুষ্যত্বের সংকট নিয়ে। এই রাজনৈতিক আদর্শ দেশ ও মানুষের সেবার অধিকারের সঙ্গে কর্তৃত্বের চাবিকাঠিও হাতে তুলে দেয়। সেবা একটি মূল্যবোধ, তাই এর একটি কেতাবি কিংবা অলঙ্কারিক মূল্য আছে, কিন্তু প্রকৃত মূল্য হলো ক্ষমতার। তাই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সব বিজয়ীই চান প্রশ্নাতীত ক্ষমতা ও অবস্থান অর্থাৎ জবাবদিহিমুক্ত স্বাধীন অধিকার।

## ৭.২ গণতন্ত্রের চর্চায় নির্বাচন ও সুশাসন

আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উপায় হিসেবে নির্বাচনের সার্বজনীন ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। সতেরো শতক থেকে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্টেস্কু তাঁর *দ্যা স্পিরিট অব দ্যা লজ* [৭] গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রজাতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র যে-কোনো ক্ষেত্রের ভোটেই হয় দেশের প্রশাসক হও অথবা প্রশাসনের অধীনে থাক-এই দুই অবস্থার মধ্যেই পর্যায়ক্রমে ভোটারদের থাকতে হয়। নিজেদের দেশে কোন সরকার ক্ষমতায় আসবে তা বাছাই করার 'মালিক' বা 'মাস্টার' হিসেবে কাজ করে ভোটাররাই। ভোট দিয়ে একটি সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থাকে চালু রাখে জনসাধারণই।

নির্বাচনী ব্যবস্থা হলো একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংবিধানিক বন্দোবস্ত এবং ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা, যা ভোটকে বদলে দেয় একটি নির্ধারণকারী ব্যবস্থায়, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার জন্য নির্বাচিত হয়। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতাকে গনতন্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং তারাই আদৌ ক্ষমতায় থাকবে কি না তা নিয়ে ভোটারদের রায় জানতে নির্ধারিত সময়ে আবার ভোটারদের মুখোমুখি হবে। নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র হয় না, আবার গণতন্ত্র ছাড়া নির্বাচন অর্থহীন। তাই দেশে-দেশে গণতন্ত্র পাওয়ার আশায় শত শত বছর ধরে নির্বাচন-ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচন সাধারণ নাগরিকদের মতামত প্রতিফলনের উপায় হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রের নাগরিকদের দাবি সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের জবাবদিহির ব্যবস্থাকে শক্তিশালী

করার অন্যতম উপায় হলো নির্বাচন। এতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকদের চাহিদাগুলোকে তাদের নীতির সঙ্গে সমন্বয় করতে পারে।

নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র চর্চা হয়, বিশ্বে এমন দেশের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন দেশের সংখ্যা কমছে। বিশ্বব্যাংকের ২০১৭ সালের 'সুশাসন ও আইন' শীর্ষক বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে[৮] এ কথা বলা হয়েছে। গত তিন দশকে বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক চর্চার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলেছে, ১৯৮৫ সালে ৪০টির বেশি দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চর্চা হয়েছিল। ২০১৫ সালে এসে এমন দেশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০টির বেশি। অন্যদিকে ১৯৮৫ সালে ৯০ শতাংশের বেশি নির্বাচনই সুষ্ঠু ও অবাধ হতো। এখন তা ৬০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। 'বনেদিরাই ক্ষমতার বিভিন্ন পর্যায়ে থাকে'—বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে এমনটাই উঠে এসেছে। বিশ্বের ছয়টি অঞ্চলের ১২টি দেশের গত ১০০ বছরের রাজনৈতিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছে বিশ্বব্যাংক। দেশগুলো হলো বলিভিয়া, ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, কোরিয়া, রাশিয়া, রুয়ান্ডা, স্পেন, শ্রীলংকা, তিউনেসিয়া ও তুরস্ক। এসব দেশে বনেদি শ্রেণিই নীতি-নির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বনেদি শ্রেণির অন্যতম হলো সরকার-প্রধান, আইন-প্রণেতা, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, স্থানীয় সরকার, আমলা, গণমাধ্যম, অর্থনীতিবিদ ও সুশীল সমাজ।

প্রতিবেদনে আরও দেখানো হয়েছে যে, সব কটি দেশের সরকার-প্রধানই নীতিনির্ধারকের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। রাশিয়া, রুয়ান্ডা ও তুরস্কে নীতি-নির্ধারণে সরকার-প্রধানের একক আধিপত্য থাকে। বাকি সব দেশেই সরকার-প্রধানের পাশাপাশি আইন-প্রণেতার অংশগ্রহণ আছে। ব্রাজিলেই শুধু নীতি-নির্ধারণে গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ রয়েছে। আর একমাত্র বলিভিয়ায় সুশীল সমাজ ও স্থানীয় সরকার নীতি-নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বে এখন গণতন্ত্রের অভিন্ন মডেল নেই। একেক অঞ্চলে ও একেক দেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নানা অবস্থা বিরাজ করছে। যেমন, ভারতের গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায়, সেখানে রাজনীতিতে বনেদি শ্রেণির পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রবেশ করেছে। আবার শ্রীলংকায় বনেদি শ্রেণির হাতে রাজনীতি রয়ে গেছে। রাশিয়ায় গণতন্ত্রের কথা বলা হলেও সেটি আন্তজার্তিক মানের নয়। আফ্রিকার গণতন্ত্রের ধরন আবার ভিন্ন। এভাবে একেক দেশে একেক অবস্থা বিরাজ করছে। বিশেষ করে আইনের মারপ্যাঁচে ও গায়ের জোরে নির্বাচন-প্রক্রিয়া কুক্ষিগত করার নানা চেষ্টা ও নির্বাচনী কারচুপি অনেক দেশেই লক্ষ্যণীয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের চর্চা বাড়লেও তার মান বাড়েনি এবং গ্রহণযোগ্যতা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

সুশাসন একটি অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন কথাটি ব্যাপকভাবে আলোচিত এবং এটা জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনই সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। শাসন কাজে দুর্বলতা থেকে উত্তরণের ভাবনা থেকেই সুশাসনের ধারণার সৃষ্টি। প্লেটোর *রিপাবলিক*[৯] গ্রন্থে সর্বপ্রথম সুশাসনের ধারণা লক্ষ করা যায়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সুশাসনের অনুপস্থিতির কারণে সব অর্জন ম্লান হয়ে যায়। টেকসই উন্নয়ন ও গণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার তাগিদ বেশ জোরালো। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয় নিয়ে সাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্নের। বিভিন্নভাবে ব্যাহত হচ্ছে সুশাসন। সুশাসনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বিচ্যুতি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় একটি দেশকে পেছনে ফেলে দেয়।

সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। সুশাসন মূলত একটি ত্রিমুখী প্রত্যয়। এখানে একপক্ষে জনগণ ও অন্যপক্ষে সরকার, আর এ দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে নির্বাচন-ব্যবস্থা। নির্বাচনী স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজন সুশাসন। সুশাসন নাগরিকদের অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা দেয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে রাষ্ট্রাচারও গতিশীল ও সুশৃঙ্খল হয়। আইনের শাসন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা, সব ক্ষেত্রে সমতা, সবার প্রতি ন্যায়পরায়ণতা, জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও জাতীয় শুদ্ধাচার সুশাসনের চালিকাশক্তি। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ। আবার প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি অপরিহার্য বাস্তবতা। মানবাধিকারের অন্যতম চেতনা হলো উদার গণতন্ত্র এবং সব ক্ষেত্রেই সুশাসন নিশ্চিতকরণ। রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী ও গণমুখী করতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। কেননা গণতন্ত্র হলো সুশাসনের প্রাণ। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিতে পারে। গণতন্ত্র মানেই জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং নির্বাচন-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। গণতন্ত্রকে গুরুত্ব দেওয়ার সাথে সাথে আইনের শাসনেরও গুরুত্ব থাকতে হবে। গণতন্ত্রের চর্চা প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মধ্যে সব ধরনের স্বাভাবিক অধিকার, জীবনের নিশ্চয়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা—এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা জরুরি। মানুষের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তাও যেহেতু উন্নয়নের মধ্যে পড়ে, তাই গণতন্ত্রকে টেকসই করতে হলে যথাযথ নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

## ৭.৩ বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের অবস্থান

প্রতিবছর যুক্তরাজ্যের ইকোনমিস্ট গ্রুপের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) সূচকে এক নজরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়। তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত বিশ্বের বড় বড় কিছু গণতান্ত্রিক দেশ এখন আর পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক দেশ নয়। তাদের গণতন্ত্র এখন ত্রুটিপূর্ণ। বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচক ২০১৬ অনুযায়ী, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো এখন আছে হাইব্রিড বা মিশ্রণ গণতান্ত্রিক দেশের কাতারে।

গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি তাদের ২০১৬ সালের নবম প্রতিবেদনটিতে ১৬৫টি সার্বভৌম দেশ ও দুটি অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঁচটি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে আলাদা স্কোরিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হয় সার্বিক স্কোর ও সূচক। সেগুলো হলো নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তি, নাগরিক স্বাধীনতা, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি। বিভিন্ন মানদণ্ডে প্রাপ্ত স্কোর নিয়ে দেশগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে চার শ্রেণির দেশে। এগুলো হলো পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক দেশ, ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ, মিশ্র ধারার গণতান্ত্রিক দেশ এবং স্বৈরতান্ত্রিক দেশ।

এক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয় ওই সব দেশগুলোকে, যেখানে নির্বাচন-ব্যবস্থা অবাধ নয়; পাশাপাশি রয়েছে দুর্বল শাসনব্যবস্থা, অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি, কম রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। ইআইইউ-এর নবম প্রতিবেদনে এই শ্রেণির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বীকৃতি পাওয়া অন্যান্য দেশের কয়েকটি হলো জাপান, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত। এসব দেশগুলোতে সরকার, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর জনগণের আস্থা কমে যাওয়া এর জন্য দায়ী। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সুষ্ঠুভাবে কাজ করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মানুষের আস্থা। পিউ, গ্যালাপ ও অন্যান্য জরিপ প্রতিষ্ঠানগুলোও নিশ্চিত করেছে, এসব দেশে সরকারের ওপর থেকে মানুষের আস্থা ঐতিহাসিক পর্যায়ে নেমে এসেছে। গণতন্ত্রের মানের ক্ষেত্রে এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা প্রভাব ফেলেছে।

ইআইইউ বলেছে, বিশ্বের অন্য উন্নত দেশও জনগণের আস্থা নিয়ে একই রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। যাতে বোঝা যাচ্ছে, সমসাময়িককালে গণতন্ত্র এক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় রয়েছে নরওয়ে। এর পরের অবস্থান যথাক্রমে আইসল্যান্ড, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড ও ডেনমার্কের। যৌভথাবে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে কানাডা ও আয়ারল্যান্ড। ইতিমধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক দেশের মর্যাদা পেয়েছে উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, চাদ ও মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের কয়েকটি দেশ। হাইব্রিড গণতন্ত্রের[১০] দেশগুলোর নির্বাচন-ব্যবস্থা বেশ কিছু অনিয়ম ও ত্রুটিতে ভরা। হাইব্রিড দেশের তালিকায়

বাংলাদেশের সঙ্গে আছে থাইল্যান্ড, মায়ানমার, তুরস্ক ও মরক্কোর মতো কিছু দেশ। এ দেশগুলোর নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি, যা গণতন্ত্রের পথচলাকে নির্বিঘ্ন করতে পারে।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ নারীস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু কমায়। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রে উন্নীত হয়েছে এমন ৬০টি দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা এই মত দিয়েছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু দেশে নারীস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ও শিশুমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশের সঙ্গে শিশুমৃত্যু হারের সম্পর্ক নিয়ে বেলজিয়ামের লিকস সেন্টার ফর ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড ইকোনমিক পারফরমেন্স, ইটালির মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনোমিকস, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ মেথডস এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড দ্যা এনভায়রনমেন্টের চার জন গবেষক এই গবেষণা করেছেন। তাঁদের এই গবেষণা রিপোর্ট প্রভাবশালী চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেট-এ ছাপা হয়েছে।[১১] স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে আসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ দেশসমূহে সব সরকারের আমলেই নারীস্বাস্থ্য ও শিশুদের কল্যাণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে সহজে সচেতন করা যায়। সবাই স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে বলে ভালো কর্মসূচি তৈরি করা সম্ভব হয়।

গবেষণায় আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার ৬০টি দেশের শিশুমৃত্যু পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে দেশগুলো স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে। গবেষণাপত্রের শুরুতে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যের ওপর রাজনৈতিক সরকার পদ্ধতির প্রভাব কী, তা পরিষ্কার নয়। তবে সাধারণভাবে যুক্তি দেখানো হয়, গণতন্ত্র স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এর ফলে ভালো জনস্বাস্থ্য-নীতি পাওয়ার সুযোগ থাকে। অন্য কারণ হচ্ছে, গণতন্ত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে, যা উপার্জন ও স্বাস্থ্যে অবদান রাখে।

বিশ্বব্যাপী জনমত সংগঠনে প্রযুক্তি এখন কার্যকর ভূমিকা রাখছে। গত শতাব্দীতে কোনো দাবির পক্ষে গণসমর্থন পেতে রাজনৈতিক কর্মী বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের দিনের পর দিন কাঠখড় পোহাতে হতো। কিন্তু এখন অনলাইনে কেউ একটি আবেদন করার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টায় হাজার হাজার, কখনো কখনো লাখ লাখ মানুষ তাতে নাম লিখিয়ে ফেলে। বৈশ্বিক কয়েকটি নাগরিক সংগঠন এখন প্রায় প্রতিদিনই এ ধরণের অনলাইন আবেদন চালু করে থাকে এবং যেসব আবেদনে সুফল মেলে তা স্বাক্ষরদাতাদের ই-মেইলে জানিয়ে দেয়। 'চেঞ্জ ডট অর্গ' এবং 'ওয়ান অন ওয়ান্ট' এক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে

আছে। অনলাইন ব্যবস্থার ফলে পাশ্চাত্যে অনেক বৈশ্বিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নাগরিক বা ভোক্তা অধিকার বিষয়ক প্রতিবাদ সফল হওয়ার নজির আছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেখা যায় গণজাগরণ মঞ্চ, কোটা সংস্কার আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মতো বিষয়গুলো ব্যাপকতা লাভ করেছিল অনলাইন ব্যবস্থার কারণে। নাগরিকসমাজের এই সক্রিয়তা এবং অধিকার-চেতনা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাকে আরও স্পষ্ট করেছে। অনলাইন-ব্যবস্থার প্রসার নাগরিকদের এই ক্ষমতায়নকে ভবিষ্যতে কোথায় নিয়ে যাবে, তা রীতিমতো রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে কর্তৃত্ববাদী ও নিয়ন্ত্রণমূলক সমাজে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠনে অনলাইনের ব্যবহার নানা কালাকানুন দ্বারা সীমিত করা হচ্ছে। যেমন, বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যা ২০১৮ সালের অক্টোবরে জারি হয়। এ আইনে যে-কেউ কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে যে, তিনি তৃতীয় কারও সম্মানহানিতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই আইনের বিশেষ ধারা, বিশেষ করে ২১ ধারা যেভাবে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি চর্চা ও স্বাধীন গবেষণার ক্ষেত্রে বাধানিষেধ তৈরি করেছে তা ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। এ আইনে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মত-প্রকাশের অধিকার খর্ব হচ্ছে, যা গণতন্ত্রের জন্য শুভফল বয়ে আনবে না।[১২]

বিশ্ব গণতন্ত্র দিবস (১৫ সেপ্টেম্বর) ২০১৬ উপলক্ষে আইপিইউ (ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন) তাদের বিবৃতিতে বলেছে, একটি ন্যায্যতর বিশ্ব প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য জাতিসংঘের ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা বিশ্বব্যাপী কেবলমাত্র অধিকতর গণতন্ত্রের[১৩] মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। বিশ্বনেতারা ২০১৫ সালে যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসজিডি) নির্ধারণ করেছেন তার সঙ্গে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাগরিক-সমাজের অংশগ্রহণের দাবিকে সম্পৃক্ত করার জন্য আইপিইউ ঐ বিবৃতিতে বিশ্ব রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আইপিইউ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে রাজনীতিতে সরলভাবে বহুমতের জায়গা করে দেওয়া এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে পার্লামেন্টগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসডিজির লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ও সূচকসমূহ ঠিক করায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করার জন্যও পার্লামেন্টগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে টেকসই উন্নয়নসূচি বাস্তবায়নের নিরিখে সব পার্লামেন্টের প্রতি গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সৃজনশীল চিন্তারও আহ্বান জানানো হয়। আইপিইউ তাদের বিবৃতিতে দাবি করে, অধিকতর গণতন্ত্র টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক বাস্তব অগ্রগতি এনে দিতে পারে। এসব ধারণা নিয়ে অনেক দিন ধরেই নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে ধীরে ধীরে হলেও ইতোমধ্যেই অনেক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ রকম একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের চর্চা। এই ব্যবস্থায় এক লাখ ভোটারের স্বাক্ষরে কোনো বিষয়ে আলোচনার দাবি উঠলে পার্লামেন্ট সেই বিষয়ে বিতর্ক আয়োজন করে থাকে। এ ধরনের নাগরিক দাবির

মুখেই একুশ শতকের প্রথম দিকে বিবিসি রেডিওর একটি মিউজিক্যাল চ্যানেল রেডিও সিক্স বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছিল।[১৪] তবে এই ব্যবস্থায় যে সবসময় কাজ হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সে-কারণেই ইউরোপ থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত প্রশ্নে অনুষ্ঠিত গণভোটের রায় বিভ্রান্তির দাবি করে দ্বিতীয় দফা গণভোট দাবি করার আবেদনে ৪০ লাখেরও বেশি সই পড়ার পরও গণরায় নাকচ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক দিবস পালনে নানা দেশের পার্লামেন্ট নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকে। এ ধরনের দিবস পালনে কোনো দেশে গণতন্ত্রের যে খুব একটা উপকার হয়েছে তেমন দাবি করা যায় না। এই দিবস পালনকে কেন্দ্র করেই থাইল্যান্ড তার জনসাধারণের জন্য এক সপ্তাহ পার্লামেন্ট ভবন খুলে দিয়েছিল। অথচ সেই থাইল্যান্ডেই কয়েক বছর ধরে চেপে আছে সামরিক শাসন। রাজনীতিবিদেরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে অধিকতর গণতন্ত্রের কথা বললেই নাগরিকেরা যে সব স্বাধীনতা পেয়ে যাবেন, এমন প্রত্যাশা না করাই ভালো। কাজেই দিবস উদযাপনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নাগরিকদের ক্ষমতায়নের প্রশ্ন বা তাদেরকে ক্ষমতায় সম্পৃক্ত করার বিষয়টি।

বিশ্ব গণতন্ত্র দিবসে জাতিসংঘের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, নাগরিক-সমাজের স্বাধীনতাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রে প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক নাগরিকত্ব, স্বচ্ছতা, বহুত্ববাদ এবং অন্তর্ভুক্তি।[১৫] ইইউর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নাগরিকদের সাথে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ এবং আস্থার সম্পর্ক প্রায়ই টানাপোড়নের মুখে পড়ে, যাতে সামাজিক উত্তেজনা ও রাজনৈতিক বিভাজনের সৃষ্টি হয়। ইইউ তাই বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র সংহত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার কথা বলেছেন।[১৬] বিশ্ব গণতন্ত্র দিবসে সবাই গণতন্ত্রের গুণগান করবেন, সেটাই স্বাভাবিক; পাশপাশি গণতন্ত্র থেকে অধিকতর বা উচ্চতর গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে গণতন্ত্রের ধারণায় ঘাটতি, সেখানে অধিকতর গণতন্ত্রের বাণী অনেকটা পরিহাসের মতো শোনায়। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র কার্যকর থাকলেই তবে অধিকতর গণতন্ত্রের প্রশ্ন আসে।

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের সমস্যা, ত্রুটি ও ঘাটতি ঘটছে কেন তার সঠিক কার্য-কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে জনগণের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, সরকার, প্রচার-মাধ্যম ও সুশীল সমাজকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের সূচকসমূহকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, জনগণের স্বাধীনতা, সরকারের কার্যক্রম, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রভৃতি সূচকের মাধ্যমে বিবেচনা করা যায় গণতন্ত্রের প্রকৃত

পরিস্থিতি ও অবস্থা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা-পরিস্থিতি এসব সূচকের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পর্যবেক্ষণ ও অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। গণতন্ত্রের সূচক বিবেচনায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্ণয় করা হয়েছে সূচকের ভিত্তিতে। সমগ্র পৃথিবীর গণতান্ত্রিক অবস্থা-পরিস্থিতি উঠে এসেছে এ প্রক্রিয়ায়। বিশ্বের কোথাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোথাও গণতন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ, কোথাও গণতন্ত্র আংশিক প্রতিফলিত, কোথাও গণতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদের মিশ্রণ ঘটেছে, আবার কোথাও চলেছে কর্তৃত্বমূলক শাসন। এসবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ গণতন্ত্রের সূচকের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। বিশ্বের যেসব রাষ্ট্রে জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে, সেখানে জনগণের ভোটের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা রয়েছে এটা বুঝতে হবে। রাষ্ট্রের সরকারের ওপর বিদেশী প্রভাব ও হস্তক্ষেপ কতটা এবং সঠিক নীতিমালা প্রয়োগে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কতখানি সক্ষম ভূমিকা পালন করতে পারে প্রভৃতি বিবেচনা গুরুত্ব পেয়েছে গণতন্ত্রের সূচক বিশ্লেষণে। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্রের এসব সূচক ক্রমাগত উন্নত করা হচ্ছে। সরকারের ধরন, গণতন্ত্রের ধরন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের সূচক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালে গণতন্ত্রের একটি বৈশ্বিক তথ্যচিত্র প্রকাশিত হয়। এতে ২৬টি রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র লক্ষ্যণীয় হয়েছিল। রাষ্ট্রগুলোর নাম: নরওয়ে, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, মাল্টা, চেক প্রজাতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, উরুগুয়ে, জাপান, বেলজিয়াম, মউরিটাস, কোস্টারিকা ও পর্তুগাল। ত্রুটিপূর্ণ ও আংশিক গণতন্ত্র রয়েছে বিশ্বের বহু দেশে। সেসব দেশ হলো: কেপ ভারদে, গ্রিস, ইটালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, স্লোভেনিয়া, ইস্তোনিয়া, চিলি, বতসোয়ানা, তাইওয়ান, ইসরাইল, স্লোভাক, সাইপ্রাস, ভারত, লিথুয়ানিয়া, তিমুরলেস্তি, হাঙ্গেরী, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাকো, পানামা, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, লাটভিয়া, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সুরিনাম, শ্রীলংকা, রোমানিয়া, কলম্বিয়া, থাইল্যান্ড, পাপুয়ানিউগিনি, ইন্দোনেশিয়া, এলসালভাদর, প্যারাগুয়ে, পেরু, সোমালিয়া, সার্বিয়া, মালডোভা, ইউক্রেন, মন্টেনেগ্রো, নামিবিয়া, ডেমিনিকান রিপাবলিক, মালয়েশিয়া, বেনিন, মেসিডোনিয়া, ফিলিপিন্স, গায়েনা, গুয়েতেমালা, লেসেথো ও ঘানা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় হাইব্রিড (মিশ্রণ) রয়েছে যেসব রাষ্ট্রে সে-রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে: হংকং, বলিভিয়া, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ, আলবেনিয়া, মালাই, লেবানন, ইকুয়েডর, হন্ডুরাস, তুর্কি, নিকারাগুয়া, জাম্বিয়া, তানজানিয়া, প্যালেস্টাইন, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, সেনেগাল, ভেনিজুয়েলা, লিবিয়া, উগান্ডা, মোজাম্বিক, কম্বোডিয়া, কেনিয়া, ভুটান, জর্জিয়া, পাকিস্তান, সিয়েরা লিওন, কাজাকিস্তান, রাশিয়া, নেপাল, আর্মেনিয়া , বুরুন্ডি, হাইতি ও ইরাক। বিশ্বের যেসব রাষ্ট্রে কর্তৃত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো হলো: মাদাগস্কর, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, জর্দান, ইথিওপিয়া, ফিজি, বারকিনা ফাসো, কিউবা, বাহরাইন নাইজেরিয়া,

টোগো, আলজেরিয়া, ক্যামেরুন, কোমোয়োম, নাইজার, গাম্বিয়া, বেলারুশ, এঙ্গোলা, কাজাকিস্তান, গ্যাবন, রুয়ান্ডা, আজারবাইজান, গণচীন, কাতার, মিশর, আইভরিকোস্ট, ভিয়েতনাম, সোয়াজিল্যান্ড, রিপাবলিক অব দি কঙ্গো, ওমান, তিউনেসিয়া, জিম্বাবুয়ে, ইয়েমেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তাজাকিস্তান, আফগানিস্তান, সুদান, এরিত্রিয়া, সিরিয়া, জিবুতি, লাওস, গিনি বিসাউ, লিবিয়া, ইরান, ইকুয়াটারিয়াল গিনি, সৌদি আরব, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, মায়ানমার, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিয়া, চাদ ও নর্থ কোরিয়া। এভাবে বিশ্বের ১৬৭ রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অবস্থা-পরিস্থিতির চিত্র উঠে এসেছে ২০১০ সালের গণতান্ত্রিক সূচকের বিবেচনায়।[১৭]

উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেমন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রধান পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গিয়েছে, জনগণের ৯০%-এর ওপর জানিয়েছে যে তারা গণতান্ত্রিক সরকারপদ্ধতিকেই সমর্থন করে, যদিও তাদের রাজনীতিবিদ এবং গোড়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস অনেকখানিই কমে গেছে। তার মানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এমন নয় যে, বেশিরভাগ মানুষ আসলে রাজনীতির ব্যাপারে নিরুৎসাহী হয়ে উঠেছে। বরং দেখা গিয়েছে সেখানে বিপরীতটাই ঘটেছে, এতে তরুণ প্রজন্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারা অনেকেই আসলে রাজনীতিবিদগণ যেসব দাবি উত্থাপন করে তার ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে এবং তারা সেই সব ব্যাপারে সম্পৃক্ততাবোধ করে, যেখানে তারা মনে করে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কমই আছে। রাজনীতি বর্তমান সময়ে এক অসৎ ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সে-কারণেই তরুণ জনগোষ্ঠী পরিবেশের ভারসাম্য, মানবাধিকার, পরিবারের পদ্ধতি এবং যৌন স্বাধীনতা এ ধরনের বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলোর যা দরকার তা হলো সেখানে গণতন্ত্রকেই গভীরভাবে প্রবিষ্ট করানো। কারণ এটিই হলো গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিকায়ণ। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতি পরিবারকেন্দ্রিক। পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় এসব দেশের রাজনীতি পরিচালিত হয়। কাগজে-কলমে গণতান্ত্রিক হলেও এসব দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। যে-কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা ও তার পরিবারবর্গের বাইরের কাউকে দলীয়-প্রধান বা নেতা হিসেবে বিবেচনা করার সংস্কৃতি এখনও গড়ে ওঠেনি। স্বাভাবিকভাবেই এসব দেশের নির্বাচনে যখন এই ধরনের রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচিত হয় তখন সেই পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী নেতাই সরকার-প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। হাতে গোনা দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গেছে সরকার-প্রধান হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তিকে একইসাথে দলীয়-প্রধানের দায়িত্বও পালন করতে। এর প্রধান অসুবিধা হলো সরকার সবকিছুর উর্দ্ধে দলীয় স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করেন। দলীয় স্বার্থের বিষয় তাদের কাছে এত বেশি গুরুত্ব পায় যে, ক্ষমতা হাতে পাওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তায় একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দলীয় স্বার্থের প্রাধান্যের লক্ষ্যে সরকারের ক্ষমতাকে

তারা ব্যবহার করেন পার্টির স্বার্থে, এমনকি সরকারি শক্তিকে কাজে লাগান বিরোধীদের দমন-পীড়নের লক্ষ্যে, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থে লক্ষ রাখতে হবে যাতে দলীয়-প্রধান ও সরকার-প্রধানের পদ একইসাথে কেউ অলঙ্কৃত করতে না পারেন।

রাষ্ট্র হলো সমাজের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের সাথে কোনো জমিদারি, সামন্ত বা জোতদারের তালুকের বিরাট পার্থক্য। রাষ্ট্র জয়েন্ট স্টক কোম্পানিও নয়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয় তার সংবিধান দ্বারা। অল্প কিছু মানুষ তাদের খুশিমতো রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করলে তাকে বলে ফ্যাসিবাদ। যেখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত, তা হলো গণতন্ত্র। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান অনুসারে সে-রাষ্ট্রটি হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যেখানে সব ক্ষমতার মালিক জনগণ। যে-কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জনগণই ত্যাগ স্বীকার করে, নির্যাতন সহ্য করে এবং প্রয়োজনবোধে রক্ত দেয়। তারপর তারা পায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ও মালিকানা। কোনো কিছুর মালিকানা কারও থাকলে, তাকে ভালোভাবে গড়ে তোলার দায়িত্বও তার। যে-কোনো দেশকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব সে-দেশের জনগণেরই, অন্য কারও নয়।

সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সরকার দেশে নাগরিকদের তাদের যার যার প্রতিভা অনুযায়ী দেশ গঠনের সুযোগ দিলে বা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলেই তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। প্রত্যেকেই যদি তার খেয়ালখুশিমতো দেশের জন্য কাজ করতে চায়, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেজন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা সরকারের। সরকার জনগণের আবেগ-অনুভূতিকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, তা বাস্তবায়নে কাজ করবে সবাই। আর্থ-সামাজিক মৌল রূপান্তরের প্রধান শক্তি জনগণ। তাদের মিলিত প্রয়াস গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। প্রতিটি দায়িত্বশীল সরকারের কর্তব্য সব বিষয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ও বিষয়নিষ্ঠভাবে ফয়সালা করা। কোনো দেশের সরকার যদি কিছু মানুষকে অনৈতিক সুবিধা দেয় বা দেয়ার মানসিকতা পোষণ করে তাহলে সরকারকে জনগণের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, অন্তত ইতিহাস সে-সাক্ষ্যই বহন করে।

### ৭.৪ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতি

একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা বা তার পরিবারবর্গ ছাড়া অন্য কেউ দলের বা সরকারের প্রধান হতে পারবে না, এটা গণতান্ত্রিক রীতি-বিরুদ্ধ। নতুন দলপতি মনোনয়ন ও নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হওয়া জরুরি। তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহে দলীয় সভাপতি বা দলীয় প্রধান দলের প্রতিষ্ঠাতা বা তার

পরিবারবর্গ ছাড়া সর্বসম্মতিক্রমে অন্য কেউ অনুমোদিত হবে, এটা কল্পনা করা যায় না। সাধারণত মনে করা হয় এটা সম্ভব নয়, এটা অচিন্ত্যনীয়। দেখা গেছে, এসব দেশে ছোট-বড় সব দল, এমনকি এদের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনসমূহ পরিচালনায়ও গণতন্ত্রের চর্চার অভাব। তৃণমূল থেকে শীর্ষ পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে দলনেতা মনোনয়ন প্রায়ই অনুপস্থিত। দলীয় প্রধান বা দলের সভাপতি হিসেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলের সংহতির জন্য জনপ্রিয় এবং বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দরকার হয়। কিন্তু এর স্থায়িত্ব দীর্ঘদিন হলে দলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে সংকটের আশঙ্কা থাকে। এজন্য দরকার প্রতিটি রাজনৈতিক দলে তৃণমূল থেকে গণতন্ত্র পরিচর্যা, প্রতিটি স্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নিযুক্ত করা এবং প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নিশ্চিত করা। এই নিশ্চয়তা আসা উচিত দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে। দলের প্রতিটি পর্যায়ে নেতা-কর্মী মনোনয়নে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার অনুশীলন যাতে হয়, তা নিশ্চিত করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি দেশের সরকারকে নানা ধরনের প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই সরকার এসব চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশসমূহে বিরোধী দলগুলো সরকারি সিদ্ধান্ত, নির্বাচন বর্জন এবং নির্বাচন বাতিল করতে নানা ধরনের সহিংস কার্যক্রম চালায়। এ প্রেক্ষিতে সেসব দেশে সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে সবসময় আশঙ্কা থেকেই যায়। বিদেশীদের কাছে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তবে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশ ভালোভাবেই সরকারের মেয়াদ পূর্ণ করে এবং সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থার ওপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এ অবস্থায় বিদেশীদের কাছে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন বা দ্বিধা থাকে না। এটা গণতন্ত্রের সাফল্য বলা যায়। গণতান্ত্রিক এসব দেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো দ্রব্যমূল্যের সহনশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্যের হার কমানো এবং ব্যাপক পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে এসব দেশ ঊর্ধ্বগামী।

গণতন্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত বিরোধী দল। কোনো দেশের বিরোধী দল যদি রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়, তারা যদি কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তারা যদি অপরিচ্ছন্ন ও দিক-নির্দেশনাহীন হয়, যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যেতে চায়, তাহলে দলটি নিজেও যেমন খাদের কিনারে চলে যায়, দেশকেও ঠেলে দেয় অনিশ্চয়তার পথে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অবস্থানও সম্মানজনক। বিরোধী দলে থেকেও মানুষের জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব। তাদেরকে অবশ্যই জনগণকে আস্থায় নিতে হবে এবং আস্থার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তা তাদেরকে পরিহার করতে হবে। কোনো দেশের সব দলের সহযোগিতা থাকলে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব এবং দেশের সব মানুষের আস্থার ভিত্তিতে সরকার গঠন সম্ভব।

গণতন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য হলো গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও বাসনা সকল নাগরিকেরই থাকে। সাম্য, স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপ্ন প্রতিটি দেশের প্রতিটি নাগরিক দেখলেও, বাস্তবে দেখা যায় অনেক দেশেই গণতন্ত্র সুসংহত হয়নি, সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং বৈষম্য তীব্রতর হয়েছে, মানবিক মর্যাদাও ভুলুণ্ঠিত। জনপ্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক পূর্বশর্ত। কিন্তু অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের সমস্যা একটি স্থায়ী সংকটে পরিণত হয়েছে। কোনো দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ, তা সরকার হোক বা বিরোধী দলই হোক, তাদের সদিচ্ছার অভাবেই মূলত গণতন্ত্রের সংকটের উদ্ভব হয়।

গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষমতাসীন দলকে মনে রাখতে হবে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বিরোধী পক্ষের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এটাই নিয়ম, এটাই রীতি। কোনো দেশের বিরোধী দলসমূহ বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকলে সেটা শাসক দলের জন্যও কল্যাণ বয়ে আনে না। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তা সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সরকার ও বিরোধী দল কঠিন রাজনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সংলাপের পথ বেছে না নিয়ে যদি সংঘাতের পথে যায়, তবে তা সাধারণ নাগরিকদের হতাশ করে এবং রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন হতে বাধ্য করে। এর ফলে আন্তর্জাতিকভাবে বিরাজনীতিকরণের সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। কোনো স্বাধীন দেশে সাংঘর্ষিক রাজনীতি জনগণের প্রত্যাশিত নয়। সব নাগরিকই চায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলসমূহ জটিল রাজনৈতিক সমস্যাগুলো কীভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সে-ব্যাপারে আন্তরিক হবে ও সিদ্ধান্ত নেবে, বৃহত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কল্যাণের পথ বেছে নেবে।

## ৭.৫ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনী প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনী প্রশাসনের ওপর দেশের নাগরিক-সমাজ ও বিজ্ঞজনদের মতামত সহযোগী ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হলো দেশটির রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদেরা। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে প্রত্যেক রাজনীতিবিদ ও সরকার নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের মতো শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ ইতোমধ্যেই তার স্বাক্ষর রেখেছে। এসব দেশে নির্বাচন কমিশন এতটাই শক্তিশালী যে তা নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমিকা পালন করে। এসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে

উত্তরোত্তর শক্তিশালী করা হয়েছে এবং সব সরকার এসব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে বলেই আজ তারা গণতন্ত্রের উদাহরণ হতে পেরেছে।

নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের ওপর রাজনৈতিক দল ও সাধারণ ভোটারদের আস্থার সংকট হলে নির্বাচনের ফলাফল জনসাধারণ মেনে নেয় না। তখনই গণতন্ত্রের ভীত দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনের আস্থার সংকট শুরু হয়, বিশেষ করে দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশে তাদের নিয়োগের পর থেকেই। এসব দেশে সব সময়ে নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ নিয়ে বির্তকের কারণে কমিশন প্রথম থেকেই আস্থার সংকটে পড়ে। তাই নিয়োগ-পদ্ধতি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে তাই বিশ্বব্যাপী নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো বিভিন্ন দেশের সংবিধানে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের কথা থাকলেও অধিকাংশ দেশেই আজও সংবিধান মোতাবেক কোনো আইন তৈরি হয়নি। এসব দেশে ক্ষমতাসীন সরকারের সুপারিশেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত শক্ত রয়েছে, সেসব দেশে নির্বাচন কমিশন আস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন যদি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে তাহলে গণতন্ত্রের ভিত রচিত হয়।

যে-কোনো দেশেই দলীয় সরকারের অধীনে নিয়োজিত নির্বাচন কমিশন সব সময়ই আস্থার সংকটে পড়ে। শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য এ সমস্যার সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যে কমিটি তৈরি হবে, তাতে নির্বাচনের শরিক বলে আখ্যায়িত রাজনৈতিক দল ও নাগরিক-সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি থাকলে হয়তো এই আস্থার সংকটের অবসান হতে পারে। কমিটির গঠন নিয়ে যদি কোনো বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তা নিরসন করার দায়িত্ব বিদ্যমান সরকারের। সেক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের বিকল্প হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তাতে হয়তো বিতর্কের অবসান হবে, তেমনি নির্বাচন কমিশনের ওপর সবার আস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইউরোপ-আমেরিকা এবং এশিয়ার কিছু দেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তাই এসব দেশে উত্থাপিত হয় না, কালেভদ্রে হলেও তা সংসদ অকার্যকর করে না। সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে তুরস্কে এরদোগান, ভারতে নরেন্দ্র মোদি, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হতে পেরেছেন। এসব নির্বাচন নিয়ে জনগোষ্ঠীর একটি বিপুল অংশের গভীর আক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের ফলাফল সব রাজনৈতিক দল মেনে নিয়েছে। এর কারণ নির্বাচন-ব্যবস্থার সততা নিয়ে মানুষের আস্থা। এই আস্থা বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, উজবেকিস্তান ও উগান্ডার মানুষের নেই। নির্বাচন-ব্যবস্থা

সম্পর্কে মানুষের আস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাই প্রতিটি দেশে স্বীকৃত। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেই তাই নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয়, এসব প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও স্বাধীন করার জন্য সহায়ক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, কিছু কিছু দেশের নির্বাচন কমিশন জনগণের আস্থা বহুলাংশে অর্জন করতে পারলেও বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই তা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই আবার দেখা যায়, একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে মানুষের আস্থা আরও বিনষ্ট হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে এসব দেশের বিরোধী দলসমূহ তাই সবসময় কিছু দাবি ও প্রস্তাব পেশ করে থাকে।

বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনকেন্দ্রিক যেসব দাবি ও প্রস্তাব উত্থাপন করে, সেগুলোর কিছু নীতিগত, কিছু পদ্ধতিগত। তারা নীতিগতভাবে সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলেন এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের কমিশনে রাখার কথা বলেন। নীতিগত এসব প্রস্তাবের অন্যতম দিক হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনে এবং কমিশন গঠন করার জন্য বাছাই কমিটিতে নিয়োগ। এসব জায়গায় নিরপেক্ষ, সৎ, অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পদ্ধতিগত দিকে রাজনৈতিক দলগুলো কমিশন গঠনের জন্য সরাসরি কিছু নাম প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন দলের প্রস্তাবিত নামসমূহ হতে বাছাই কমিটি সর্বসম্মতভাবে কমিশন গঠন করবে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো কিছু আইন সংস্কারমূলক প্রস্তাবও দিয়ে থাকে, যা বাস্তবসম্মত। আইন সংস্কারের প্রস্তাবে নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা এবং তাদের সহায়তায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে নির্বাচনকালে সেনাবাহিনী ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো ইউনিটের প্রধান বা নীতি-নির্ধারক যাতে সরাসরি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তা জরুরি।

নির্বাচন-ব্যবস্থার সততার অন্যতম বিষয় হলো নির্বাচিত সরকারের অধীনেই সব থাকবে ও পরিচালিত হবে। অনুন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিরোধ সমাধানের চেষ্টা করছে। তাদেরকে আরও বাহ্যিক নানান অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ফলে দেশগুলো আরও অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। অভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টিকারী প্রধান বিষয়টি হচ্ছে সম্মিলিত বিরোধী দলের সাথে শাসক দলের চলমান দ্বন্দ্ব। বিবাদমান এ পক্ষগুলো যা চায় তার মূল কথা হলো, প্রতিপক্ষকে একদম রাজনীতি থেকে দূরে রাখা, যাতে পরবর্তী নির্বাচনে নিজেরা জয়ী হতে পারে। এ কারণে দেশগুলোর প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, এমনকি আদালত পর্যন্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে দেশগুলোতে চরম অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশে তিন মডেলের অর্থাৎ স্বাধীন, মিশ্র ও সরকার নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সংবিধান দ্বারা গঠিত স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণ তথা ভোটারদের আস্থা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে নব্য গণতান্ত্রিক দেশগুলো সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনই বেছে নেয়। এক গবেষণা জরিপের ফল অনুযায়ী, বিশ্বের যে ১৮৭টি দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে ১৩১টি দেশে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। বাকি দেশগুলোর ৩৩টিতে সরকারি এবং ২৩টি দেশে মিশ্র মডেলের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা রয়েছে। অবশ্য এ ৫৬টি দেশের সিংহভাগই পশ্চিমা ও জাপানের মতো প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশ[১৮] একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু সাংবিধানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারাই পূর্ণভাবে স্বাধীন হয় না। তবে কাঠামোগত স্বাধীনতা নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধারণাকে স্পষ্ট করে। কাঠামোগত ছাড়াও আরও যে ধরনের স্বাধীনতা আবশ্যক তার মধ্যে রয়েছে আর্থিক দিক, কমিশনের সদস্য-কর্মচারীদের নৈতিক অবস্থান ও স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা। কাঠামোগত স্বাধীন নির্বাচন কমিশন তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা এবং কমিশনের সদস্যরা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আর এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো কী পদ্ধতিতে এবং কী ধরনের ব্যক্তি দ্বারা নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। কাজেই নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার মনোবৃত্তি ও দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ কারণে প্রতিটি দেশের সংবিধানে নির্বাচন কমিশনকে বিশেষভাবে ক্ষমতায়ন করা হয়ে থাকে। আর এ কারণেই নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে যেসব দেশের গণতান্ত্রিক ভিত দুর্বল, গণতন্ত্রের সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী নয়, সেখানে এসব প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া উচিত সরকার এবং অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলের। সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় এ যাবৎ বাংলাদেশের ন্যায় বিভিন্ন দেশে যেসব কমিশন গঠিত হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এখন যা প্রয়োজন তা হলো, এই বিতর্ক হ্রাস করতে সংবিধানে উল্লেখিত আইন তৈরি না করা পর্যন্ত সর্বদলীয় অথবা ন্যূনতম রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে কমিশন গঠিত হওয়া। বিভিন্ন দেশের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতটা সফল হয়েছে, উন্নয়নশীল অথবা অনুন্নত দেশসমূহে ততটা সফল হয়নি। যেসব দেশে সফল হয়েছে সেখানে একটি উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি আছে; যেমন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা, জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া, শাসনের সময় শেষ হলে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। উন্নত দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমাজের দিকে তাকালে সামাজিক স্তরবিন্যাসে সমাজ-জীবন অতিষ্ঠ নয়। সামাজিক ক্ষেত্রে এক ধরনের সাম্য সবার চোখে পড়ে। ফলে একজন অন্যজনকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করে। একজন অন্যের কাজকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।[১৯] কিন্তু বাংলাদেশের মতো

উন্নয়নশীল অথবা অনুন্নত দেশে উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাবে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়নি। ফলে যথার্থ গণতন্ত্রের চর্চা অনুপস্থিত।

### ৭.৬ গণতন্ত্রের সংকট

সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্র সারাবিশ্বব্যাপী সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র নিজের স্বকীয়তা রক্ষা করতে সংকটগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৬ সালে ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)[২০] গণতন্ত্রের যে সূচক প্রকাশ করেছে সেখানে দেখা যায় বিশ্বের ৪ দশমিক ৫ শতাংশ জনগণ পূর্ণ গণতন্ত্রের মধ্যে বাস করে। অর্ধেকের বেশি মানুষ বাস করে পুরো অগণতান্ত্রিক অবস্থায়। আর বাকি অর্ধেক মানুষ যেসব দেশে বাস করে, সেখানে গণতন্ত্রের সাথে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। ইআইইউ ২০০৬ সাল থেকে বিশ্বের গণতন্ত্রের মান অবস্থা ধরে যে সূচক বের করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্রের অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ইআইইউ-এর আঞ্চলিক পরিচালক (ইউরোপ) জোয়ান হোয়ে[২১] এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলছেন, "সবাই গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলেছেন, কিন্তু গণতন্ত্রকে কার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে?"[২২] তিনি গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক দশা, নানা পর্ব এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়াসহ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা এখন সবচেয়ে নিচে নেমে এসেছে। ইউরোপসহ বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের রূপান্তর ঘটেছে। মধ্যপ্রাচ্যে আবার কর্তৃত্ববাদী শাসন ফিরে আসছে। নাগরিক অধিকার ছেঁটে ফেলবেন এমন জনতুষ্টিবাদী নেতারা নির্বাচনে জিতে চলেছেন। উন্নত দেশগুলোতে কয়েক প্রজন্ম ধরে যে মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল, তা ধসে পড়তে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে জোয়ান হোয়ের আক্ষেপ হচ্ছে—রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও চীনের মতো দেশগুলোর গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিয়ে মাতামাতি হয়। কিন্তু আসল সমস্যা পশ্চিমে, সবচেয়ে পরিপক্ক গণতন্ত্রের কেন্দ্রে। ব্রিটেনে বেক্সিট হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প জিতেছেন। এই জনতুষ্টিবাদী উত্থানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেক গণমাধ্যমসহ রাজনৈতিক এলিটদের পক্ষ থেকে আওয়াজ উঠেছে, 'গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে'। জোয়ান হোয়ে এ কারণেই প্রশ্নটা করেছেন। কারণ ব্রেক্সিট হয়েছে জনগণের ভোটে, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পও জিতেছেন জনগণের ভোটে। হোয়ে মনে করেন, ব্রেক্সিটের ঘটনা গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক আলোচনা ও তর্ক-বির্তকের বিষয়। এটা এক যুগান্তকারী ঘটনা।[২৩] হোয়ের এই ধারণার সঙ্গে অনেকেই একমত। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক ও গণতন্ত্র অধ্যয়ন বিষয়ক পণ্ডিত ল্যারি ডায়মন্ড বলেছেন, "এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা গণতন্ত্রের এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত মন্দাভাব দেখে আসছিলাম। আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে,

আমরা কোন দিকে যাচ্ছি। কিন্তু ব্রেক্সিট ও মার্কিন নির্বাচন সব ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে পরিপক্ক দেশগুলোতেই এখন গণতন্ত্র বিপদের মধ্যে রয়েছে।"[২৪]

সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্ব গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নিয়ে এত উদ্বেগের মধ্যে পড়েছে। ইআইইউ গণতন্ত্রের যে সূচক তৈরি করেছে তাতে ২০১৬ সালের সূচকে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণ গণতন্ত্র থেকে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রের কাতারে নেমে এসেছে।[২৫] অবশ্য এ সূচক করা হয়েছিল ২০১৫ সালের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে। দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসার আগেই গণতন্ত্রের মান কমতে শুরু করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্রের এ ধারাবাহিক পতনের কারণ কী? এর কারণ হিসেবে সাধারণভাবে আর্থিক খাতের সংকট এবং এর ফলে আর্থিক কাটছাঁটের নীতির প্রভাবের কথা বলা হয়। বিশ্ব এখনও সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। *বিবিসি*তে প্রকাশিত ডগলাস হেভেনের নিবন্ধে বলা হয়েছে, আর্থিক খাতের সংকট গণতন্ত্রের ওপর বড় প্রভাব ফেলেছে। রাজনৈতিক নেতাদের জনগণ যেভাবে দেখত ও বিবেচনা করত, সেখানে পরিবর্তন হয়েছে।[২৬] এই ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়, তবে গণতন্ত্রের এ সংকট স্বল্পস্থায়ী হওয়ার কথা। কিন্তু হোয়ে মনে করেন, গণতন্ত্রের এ সংকট স্বল্পস্থায়ী বিষয় নয়। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার বেশ আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণ গণতন্ত্রের দেশ থেকে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রের দেশে নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে ছিল এবং ২০১৫ সালে দেশটি নিচে নেমে গেছে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, দীর্ঘস্থায়ী যে সংকট গণতন্ত্রের গভীরে চেপে বসেছে, তার সুবিধাভোগী হচ্ছেন ডোনাল ট্রাম্পের মতো লোকজন।[২৭]

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও এশীয় গণতন্ত্রের মূল এক নয়। কেননা পাশ্চাত্য থেকে আমাদের পরিবার, সমাজ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি, মানসিকতা ভিন্নতর। এ কারণে পাশ্চাত্য নীতিতে এদেশে গণতন্ত্রকে সফল করা কষ্টকর। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেমন রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত রাখা হয় তেমনি আমাদের এখানে হয় না। এখানে নির্বাচনের পরেই নির্বাচিত দল তাদের প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পেছনে বাংলাদেশের অন্যতম কারণ হলো 'মেজোরিটেরিয়ান অ্যারোগেন্স' (সংখ্যাগরিষ্ঠের ঔদ্ধত্য)। যারা নির্বাচনে জয় লাভ করে তারা মনে করে বিজয়ের ফলে শাসকের পদে উন্নীত হয়ে তারা যে-কোনো কাজই করতে পারেন। ফলে অনেক সময় তারা আইনের ঊর্ধ্বে উঠে আইন ভঙ্গ করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক নিয়ম চর্চায় অভ্যস্ত থাকে না। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি করেছে। নিম্নে এগুলো তুলে ধরা হলো:

**অজ্ঞ ও অযোগ্যের শাসন:** গণতন্ত্রকে অজ্ঞ ও অক্ষমদের শাসন বলা হয়। যেমন, গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর সময় থেকেই গণতন্ত্র সম্পর্কে এ অভিযোগ চলে আসছে। এ কারণে প্লেটোর কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে নীতিহীন সংখ্যার শাসন। প্লেটো এথেন্সের প্রচলিত গণতন্ত্রের তীব্র বিরোধী ছিলেন। গণতন্ত্রের নীতিহীনতা, ব্যক্তিচরিত্রের দায়িত্বহীনতা, বল্গাহীন বাগাড়ম্বর ইত্যাদির কারণে তিনি গণতন্ত্রের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "এ হচ্ছে এক অদ্ভুত রকমের অরাজক ব্যবস্থা, যেখানে বৈচিত্র্যের অভাব নেই আর যেখানে সমান অসমান—সকলেই সমান।"[২৮] গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যেহেতু জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে ফলে সেখানে অনেক অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকও অংশগ্রহণ করে, যাদের পক্ষে সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা অসম্ভব। ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এরিস্টটল গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণহীন শাসন বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, এ শাসনব্যবস্থায় যার যেমন ইচ্ছা তার তেমন জীবনযাপনের স্বাধীনতা রয়েছে। গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতাকেই অধিকতর আনন্দদায়ক বলে গণ্য করে।[২৯]

**রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব:** রাজনৈতিক সচেতনতা ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সুশিক্ষা, সুন্দর পরিবেশ ছাড়া রাজনীতির সুষ্ঠু বিকাশ হয় না। শিক্ষার বিস্তারে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ না থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন স্বেচ্ছাতন্ত্রে পরিণত হয়। জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবোধের অভাব বর্তমান গণতন্ত্রের সংকটের অন্যতম কারণ। রাজনৈতিক সচেতনতা ছাড়া নাগরিকগণ দেশপ্রেম, বুদ্ধিমত্তা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ নিতে পারে না। চেতনাবোধ থেকে তৈরি হয় একতাবোধ। একতাবোধ না থাকলে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হতে পারে না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মন্ত্রী, আমলা, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতি, কৃষিবিদ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরশীলতা তাদের কাজের গতি কমিয়ে দেয়। এছাড়া বিশেষজ্ঞদের সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে গণতান্ত্রিক নীতিতে দায়িত্বশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে মানুষ গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে পারে না।

**সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ:** গণতন্ত্রের অন্যতম সংকট হলো সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ। বর্তমান শতাব্দীর রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামরিক বাহিনী সামান্য অজুহাতে অহেতুক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে। সামরিক বাহিনী ক্ষমতাসীন হয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে, ফলে গণতন্ত্র সংকটে পতিত হয়। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে আইন-বহির্ভূত কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর

শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাজনৈতিক দমনপীড়ন ও সাধারণ মানুষকে দমিয়ে রাখার কাজে তাদের ব্যবহার করে। তারা রাষ্ট্রে মানুষের বাক-স্বাধীনতা ও গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ফলে গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের সঠিক চর্চার অভাবে শাসক একনায়ক হয়ে ওঠে। ফলে তার ক্ষমতার অবসান নিয়ে তিনি ভীতিতে থাকেন। কেননা ক্ষমতা হারানোর পর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ প্রতিশোধের জন্য তাকে আঘাত করতে পারে।[৩০]

**মুক্ত বাজার অর্থনীতি:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর থেকে, গণতন্ত্র বাজার-অর্থনীতির সাথে কিছুটা সমর্থক হয়ে পড়ে। বাজার-অর্থনীতির অনেক শুভ ফল থাকলেও এর মধ্যে রয়েছে লোভ, প্রতিহিংসা আর অসহিষ্ণুতা। ফলে বলা যায় বাজার-অর্থনীতি গণতন্ত্রের সাথে অবস্থান করলেও তা গণতন্ত্রের সুদৃঢ় বিকাশে তেমন সহায়ক হয়নি। বরং মাঝে মাঝে বাজার-অর্থনীতি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যার ফলে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদেরা[৩১] মানুষকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন এবং এ ব্যক্তি-মানুষের আকাঙ্ক্ষা থেকে বাজার-অর্থনীতির উদ্ভব বলে ব্যাখ্যা করেন। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষের এ দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকেই যুক্তিসিদ্ধ করে। পুঁজিবাদী সমাজে স্বভাবগত কারণেই মানুষ ক্ষমতা ও সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। মানব-প্রকৃতির এ জাতীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমেই রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদেরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধারণাকে যুক্তিসিদ্ধ করে থাকেন। বাজার-অর্থনীতির মুক্ত প্রতিযোগিতায় ধনী-গরিবের বৈষম্য আরও বাড়ে।[৩২] গণতান্ত্রিক রাজনীতি নির্ভর করে জনগণের কার্যক্রমের ওপর, নাগরিকদের সক্রিয় পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর। কিন্তু বাজারে বিদ্যমান থাকে এক ধরনের গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত দরকষাকষির ভাব। সামাজিক কল্যাণ ও জনগণের কল্যাণ গণতন্ত্রের মূলনীতি। অপরদিকে বাজার উৎসাহ দেয় এক ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মূল্যবোধকে। কিন্তু গণতন্ত্রের মূলে থাকে সামষ্টিক চেতনা। বাজার ব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে আমি ও আমিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি (আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক), যা গণতন্ত্রের জন্য প্রতিবন্ধক। বাজার নীতি যেখানে চুক্তিভিত্তিক সেখানে গণতন্ত্র বেড়ে ওঠে সমগ্র সমাজকে ঘিরে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভেতর গণতান্ত্রিক সরকারের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে অনিশ্চিত। কারণ পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষকে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ভাবনা ও শোষণ থেকে মুক্ত রাখতে ব্যর্থ হয়।[৩৩]

**ব্যক্তিস্বার্থ:** বর্তমানে গণতন্ত্রের অন্যতম সংকট হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আত্মস্বার্থের প্রাধান্য, যা সমষ্টির স্বার্থকে ব্যাহত করে। এতে জনকল্যাণের পরিবর্তে বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণির স্বার্থ সাধন করাই লক্ষ্য হয়ে

দাঁড়ায়। একে স্বার্থপরতা বলা যায়। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বার্থপরতা বিরাজমান, বিশেষ করে দলীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেয় যা ব্যক্তির মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তি লোভী হয়ে ওঠে। ব্যক্তি তখন রাষ্ট্রের স্বার্থকে উপেক্ষা করে। এরূপ পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে না।

**দলীয় স্বার্থ:** দলীয় স্বার্থের কারণে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনো প্রকার মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি দেয় না। এ ব্যবস্থায় দলাদলির কারণে শক্তি ও অর্থের অপচয় ঘটে। পরস্পরের প্রতি হিংসা, কাদা ছোড়াছুড়ি, অসহিষ্ণু মনোভাব দলীয় রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে যে-কোনো ধরনের কুৎসা ও অপপ্রচার চালাতে দ্বিধা করে না। এসব কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। সার্বিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। কঠোর দলীয় রাজনীতির কারণে রাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলো সরকারি দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে অনেক সময় প্রকৃত সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রাখে। চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে যখন দলীয়করণের অবাধ প্রসার ঘটে তখন যোগ্য ও ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিরা উপেক্ষিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিজ দলকে বার বার ক্ষমতাসীন করার লক্ষ্যে শাসকগণ তাদের দলীয় নেতাকর্মীকে অবৈধ পারমিট, লাইসেন্স, চাকুরির সুবিধা প্রদান করে সমাজে চরম অরাজকতা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি করে। দলীয়করণের ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়ে দলীয় রাজনীতির লেজুড়ে পরিণত হয়।

**নেতৃত্বের সংকট:** রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট গণতন্ত্রের একটি কেন্দ্রীয় সংকট। একজন ব্যক্তি তখনই ভালো নেতা হতে পারে যখন সে তার জীবনের আদর্শকে ধরে রেখে অধিক সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রে প্রায়ই লক্ষ করা যায় নেতারা আদর্শবাদিতার সাথে আপোস করে সফলতা অর্জনে ঝুঁকে পড়ে এবং তখন নেতা বিভিন্ন কূটনীতি, কূটকৌশল এবং কূটবুদ্ধির আশ্রয় নেয়, যার ফলে সত্যের বিকৃতি ঘটে। ফলে ভালো নেতৃত্ব আমরা পাই না। এ ধরনের নেতারা দলীয় স্বার্থ নির্ধারণ করতে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ করে এবং কখনও কখনও আংশিক সত্যকে প্রকৃত সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে, যা গণতন্ত্রের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বে প্রজ্ঞা, সততা, জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষের অভাবই গণতন্ত্রকে সংকটে ফেলে। নৈতিক উৎকর্ষের মাধ্যমে মানুষের শ্রদ্ধা ও সামাজিক নেতৃত্ব লাভ করা সম্ভব না হলে তা দেশের জন্য ভীষণ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

**কর্তৃত্ববাদ:** সাম্প্রতিক ধ্রুপদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যেভাবে অতিমাত্রায় কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে চলেছে, তাতে বৈশ্বিক গণতন্ত্র ও শান্তি মারাত্মক সংকটে পড়েছে। ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি তাঁর *দ্য প্রিন্স* গ্রন্থে[৩৪] শাসকদের কিছু পরামর্শ রেখেছিলেন। শাসক তার জনগণের কাছে কী বেশি চাইতে পারে, ভালোবাসা নাকি ভয়মিশ্রিত সমীহ? ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন, ভালোবাসার চেয়ে ভয় বেশি নিরাপদ। ভালোবাসার মধ্যে যে দায় থাকে, স্বভাবসুলভ আপন সুবিধার খাতিরে মানুষ তা এড়ায়। কিন্তু শাস্তির আতঙ্ক জনগণকে ঠিক রাখবে। আতঙ্কের শাসন বিপুল সমারোহে ফিরে এসেছে পৃথিবীতে। যেমন, ট্রাম্পের কথা বিবেচনা করা যায়, পুতিনের কথা ভাবা যায়, নেতানিয়াহু বা এরদোগানের কথাও চিন্তা করা যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে চান, জনগণকে উত্তেজিত করে তোলেন জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে দারুণ জনপ্রিয়। তাঁদের উত্থানের ঘটনাকে বলা হচ্ছে জনতুষ্টিবাদ। জনতুষ্টিবাদী শাসনকে বলা যায় ফ্যাসিবাদ। তার আগে তা দেখা দেয় কর্তৃত্ববাদের চেহারায়। দেশে দেশে এখন কর্তৃত্ববাদের জয়জয়কার। বিরাট নেতা আর খুদে জনগণ হলো জনতুষ্টিবাদের লক্ষণ। কখনো তারা নির্বাচিত, কখনোবা নির্বাচন ছাড়াই তারা পেয়ে যান ক্ষমতার সিঁড়ি। কাজেই কর্তৃত্ববাদ, জনতুষ্টিবাদ, ডানপন্থা এরা প্রত্যেকেই গণতন্ত্রের জন্য হুমকি।

**সাংবিধানিক ত্রুটি:** সব ধরনের সরকারের ভিত্তি হলো সংবিধান। সরকারের রূপ সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটিকে মৌলিক আইনের দলিলও বলা হয়। সংবিধানে যেমন অধিকারের উল্লেখ থাকে তেমন কর্তব্যেরও উল্লেখ থাকে। সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধান প্রণয়নের সময় এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা এবং সরকার ও আইনসভাকে নিয়ন্ত্রিত রাখার চিন্তা থেকে সাংবিধানিক প্রাধান্যের বিষয়টি সংবিধানে স্পষ্ট করে প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার প্রথম নমুনাটি আমরা দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে, যেখানে বলা হয়েছে সংবিধান হবে সর্বোচ্চ আইন।[৩৫] সাংবিধানিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে আইনসভা ইচ্ছাধীন আইন প্রণয়ন বা সংশোধনে সক্ষম নয়। কোনো আইন বা সংশোধনী যদি সংবিধানের বিরোধী হয়, তবে সে-আইন বা সংশোধনী বাতিলযোগ্য। সংবিধানের এই যে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এটি সাংবিধানিক প্রাধান্য। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে এমন কিছু বিধান রয়েছে যা পূর্বেই সংবিধান অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ইচ্ছামাফিক কাজ করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছে, যা সংবিধানের অন্তর্নিহিত ত্রুটি। কাজেই এ সংবিধানের অন্য অনেক গণতান্ত্রিক ধারা থাকা সত্ত্বেও

সংবিধানের সকল ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ ধরনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দিতে পারে।[৩৬]

**রাজনৈতিক গণতন্ত্র:** গণতন্ত্রের অন্যতম সংকট হচ্ছে গণতন্ত্রকে কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখা। গণতন্ত্র কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থবহ হতে পারে না। গণতন্ত্রে সবসময় মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক অধিকার (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) ছাড়া রাজনৈতিক অধিকার (ভোটাধিকার, মত-প্রকাশের অধিকার) অর্থপূর্ণ হতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা না থাকলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তির বিকাশ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার সমতা ছাড়া ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আর্থিক দিক থেকে প্রভাবশালী শ্রেণিই রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যারা লুণ্ঠনমূলক অর্থনীতির ধারক-বাহক তারাই রাজনীতিতে আধিপত্য করেছে, রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ লুণ্ঠনমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ।[৩৭]

### ৭.৭ সংকট উত্তরণের পথ

সংকট থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলো গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রয়েছে। তবে ব্রেক্সিট ও ট্রাম্পের বিজয় যে ইঙ্গিত দিয়েছে, তাকে যদি গণতন্ত্রের একটি সতর্কবার্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে গণতন্ত্রের সামনের দিনগুলোর জন্য তা ভালো হতে পারে। জোয়ান হোয়ে বলেছেন, "গত এক দশকের বেশি সময় ধরে গণতন্ত্রের অবস্থা যে খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাকে এতদিন কেউ পাত্তা দেয়নি। এখন সবাই যখন এ ব্যাপারে সোচ্চার হচ্ছে, তখন ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ নতুন বাস্তবতায় গণতন্ত্রের যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো স্পষ্ট হয়েছে, তাকে অবহেলা করা যাবে না।"[৩৮] 'সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র' যে বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বা দাঁড়াচ্ছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা যেন প্রকৃত গণতন্ত্রকে বিপদে ফেলতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যের দিকটি এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৩৯] এটি একটি বড় আশার দিক। যথেষ্ট শক্তিশালী ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে। ব্রেক্সিট ও ট্রাম্পের বিজয় পশ্চিমা বিশ্ব, তথা

সেখানকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও সচেতন নাগরিকদের যেভাবে আতঙ্কিত করেছে, তা সেসব দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় ভূমিকা করতে পারে। একই সঙ্গে সেখানকার ব্যবস্থার মধ্যে যে ভারসাম্যমূলক কাঠামো রয়েছে, তাও গণতন্ত্রের পতন ঠেকাতে ভূমিকা পালন করতে পারে। গণতন্ত্রের সংকট এড়াতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

**বাক-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা:** গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাক-স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বিদ্যমান সরকারের নীতি ও কাজের সমালোচনা করা হয়। গণতন্ত্রের প্রাণ হলো মতদ্বৈততা। গণতন্ত্রে বিরোধী দল ও সাংবাদিকদের কাজ হচ্ছে সরকারের নীতি, কাজ ও সংস্থার গঠনমূলক সমালোচনা করা। সমালোচনার সুযোগ না থাকলে রাষ্ট্র জনগণের মতামত জানতে সক্ষম হবে না। জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি না জানলে তা সরকারের জন্য রাজনৈতিকভাবে শুভ নাও হতে পারে। উদারনৈতিক সমাজেও বাক-স্বাধীনতার বিষয়টি একটি বাদানুবাদপূর্ণ বিষয়। যদি বাক-স্বাধীনতার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা না হয় তবে এর সাথে সাথে অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধও সংকুচিত হয়ে পড়ে। বাক-স্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধ আরোপ করার বিষয়টি সব সমাজে, সব রাষ্ট্রে, সবসময়ই বিতর্কিত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাক-স্বাধীনতা বিষয়ক যে-কোনো ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় এর ওপর সবসময় সীমাবদ্ধতা আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। সব সমাজই বাক-স্বাধীনতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে, কেননা এটা সবসময়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মূল্যবোধের ধারক হয়ে থাকে।

নীতিদার্শনিক মিল[৪০] সর্বপ্রথম বাক-স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। মিল মনে করেন, বিষয়টির যদি ন্যূনতম কোনো বৈধতা থাকে তাহলে নৈতিক বিচারে নৈতিক-অনৈতিক সব ধরনের মত ও মতবাদ প্রকাশ করা এবং সেগুলোর বিষয়ে আলোচনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। বাক-স্বাধীনতার সমর্থনে এটিকে শক্তিশালী ও অলঙ্ঘনীয় যুক্তি বলা যায়। মিল-এর মতে, কোনো মতবাদ তা যতই অনৈতিক হোক না কেন, তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। পূর্ণ বাক-স্বাধীনতার একটা যৌক্তিক সীমা থাকা উচিত। তা কখনোই সমাজে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী হিসেবে উপনীত হওয়া কাম্য নয়। ব্যক্তিমর্যাদা রক্ষার জন্যই এরূপ স্বাধীনতা থাকা উচিত। একই সাথে মিল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ব্যক্তির আচরণ ও বাক-স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আচরণবিধি প্রণয়নের কথা বলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর 'অনিষ্ট নীতি' উত্থাপন করেন। এ নীতির মূল কথা হলো সভ্য সমাজের যে-কোনো সদস্যের ওপর তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে কেবল সমাজের অন্যদেরকে অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, তাদের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য। তবে 'অনিষ্ট নীতি' বাক-স্বাধীনতার ওপর কিছুটা

সীমাবদ্ধতা আরোপ করার কথা বলে। যেসব উক্তি অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করে, অধিকার বিনষ্ট করে এবং জীবননাশের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সেগুলোকে মিল তাঁর নীতির মাধ্যমে সীমিত করার কথা বলেন। তিনি মনে করেন, যেসব উক্তি স্পষ্টত ও প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘন করে সেগুলো রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক আইনের মাধ্যমে সীমিত রাখা উচিত।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি। সত্য প্রকাশ করে বলেই গণমাধ্যম সরকারকে বা ক্ষমতাবানকে জনগণের কথা শুনতে বাধ্য করে। তবে সত্য সংবাদ প্রকাশের দায়ে অনেক সময় গণমাধ্যমকে বিশ্বব্যাপী চাপে পড়তে হয়। এছাড়া রাজনৈতিক দলেরও চাপ সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। আবার অনেক সময় সরকারের ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশিত না হলে সাংবাদিকদের প্রকাশ্যে কটাক্ষ ও হয়রানি করা হয়। গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, বিশেষ করে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। সন্ত্রাস-বিরোধীর মতো আইন দিয়ে সাংবাদিকদের চাপের মুখে রাখা হয়। আজারবাইজান, তুরস্ক ও জাম্বিয়ায় এ আইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে সরকারের সমালোচনাকারী সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয়েছে; যেমন, সাইবার অপরাধ বিষয়ক আইন। যদিও বলা হয় এ আইন সাংবাদিকদের জন্য নয়, যারা অনলাইনে অপরাধ করে তাদের জন্য, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এ আইন ব্যবহার করে সমালোচনামূলক সাংবাদিকতার রেশ টেনে ধরা হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মুক্ত ও স্বাধীন সাংবাদিকতার সাথে গণতন্ত্রের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গণমাধ্যমের মূল কাজ হলো মানুষকে তথ্য জানানো, তাদের শিক্ষিত করে তোলা ও বিনোদন দেওয়া। তাদের মূল উদ্দেশ্য কোনো না কোনোভাবে সমাজের উন্নয়ন। গণমাধ্যমের প্রধান কাজ হলো তথ্যের মধ্যে থাকা, এর নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ এবং সত্যটা কী তার নিরন্তর অনুসন্ধান। সুতরাং বলা যায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিরোধী দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম পূর্বশর্ত। কোনো দেশে বিরোধী দল না থাকলে পূর্ণ গণতন্ত্র থাকে না। এ কারণেই বিরোধী দলকে নিজেদের মতো করে কাজ করতে দেয়া উচিত। সরকারের নিজের স্বার্থেই সমালোচনার পরিবেশ উন্মুক্ত ও বাধাহীন রাখা উচিত। কার্যকর বিরোধী দল না থাকলেও বাক-স্বাধীনতা, সমাবেশ করার স্বাধীনতা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করার স্বাধীনতা সরকারের নিশ্চিত করা উচিত। মানবাধিকার রক্ষা করা, স্বেচ্ছাচারিতা দূর করে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য।

**রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন:** প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে: আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগ। রাষ্ট্রদার্শনিকেরা মনে করেন, এগুলো একটি অন্যটির সম্পূরক হিসেবেই কাজ করে। যদিও বিভিন্ন দেশের সংবিধানে এ তিন অঙ্গের সম্পর্ক লিখিত থাকলেও এখনও এটি সম্পূর্ণ মীমাংসিত বিষয় নয়। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ সম্পর্কিত ধারণার সূচনা হয়েছিল এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায়। পরবর্তীকালে এটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ মন্টেস্কু। *দ্য স্পিরিট অব ল*[৪১] গ্রন্থে তিনি এ তিন বিভাগের ধারণা উল্লেখ করেন। তবে সংবিধানতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে এই তিন প্রতিষ্ঠানের ধারণা বিকাশলাভ করেছে। আধুনিক রাষ্ট্র যতই ব্যক্তির ইচ্ছা (যেমন রাজা/সম্রাট) বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (যেমন চার্চের) আনুগত্যের বাইরে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব তৈরি করেছে, ততই এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হয়েছে। ইউরোপে যখন রাষ্ট্র চার্চের অধীনে ছিল তখন চার্চের বিচার করার এক ধরনের প্রক্রিয়াও বহাল ছিল। কিন্তু এগুলো স্বাধীনভাবে সবাইকে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়নি, অন্যদিকে ক্ষমতা একই গোষ্ঠীর হাতে থেকেছে। অর্থাৎ আইন-প্রণেতা, আইনের প্রয়োগকারী এবং বিচারক একই মানুষ বা একই গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র তথা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই ক্ষমতাগুলোকে আলাদা করা অত্যাবশ্যকীয় মনে করে।

গণতন্ত্রের রূপ ও কাঠামো বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও গত এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে উদার গণতান্ত্রিক যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত সেগুলো হলো: ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তি হিসেবে নাগরিকের স্বাধীনতা, জনগণের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের স্বাধীন উপস্থিতি ও ক্ষমতার বিভাজন। যে-কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণায়ই এ বিষয়গুলোর কথা সবার আগে চলে আসে। যদিও শেষোক্ত বিষয়টি অনেক ধরনের বিতর্কের মধ্যে দিয়ে গেছে, তথাপি এর মর্মবস্তু অর্থাৎ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরস্পর থেকে আলাদা থাকবে এবং তাদের নির্ধারিত ভূমিকা স্বাধীনভাবে পালন করবে, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। নির্বাহী বিভাগ যেন ইচ্ছামতো চলতে না পারে তা একইসাথে আইনসভা এবং বিচারবিভাগ দেখবে। আইন-প্রণেতারা যেন এমন আইন তৈরি করতে না পারেন, যা নাগরিকদের অধিকারকে সীমিত করে, তা দেখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। একেই ভারসাম্য নীতি বলে অভিহিত করা যায়। স্বাধীনভাবে এগুলো চলার অর্থ হলো কেউ কারও মুখাপেক্ষী হবে না, কেউ কারও সাথে আলাপ-আলোচনা করে পদক্ষেপ নেবে না। মন্টেস্কু এই তিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ করতে বলেছিলেন। কেননা এর অন্যথা হলে নাগরিক স্বাধীনতা থাকবে না। যদি একের পদক্ষেপ অন্যের বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়, একে অন্যের সাথে সমন্বয় করে পদক্ষেপ নেয়, তাহলে নজরদারির সুযোগ থাকবে না এবং এক অর্থে সব প্রতিষ্ঠানই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ফলে নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হবে। ক্ষমতার বিভাজন যে উদারনৈতিক রাষ্ট্রে কতটা দরকার এবং তা কীভাবে কাজ করে তা সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রে

সংঘটিত ঘটনাবলি থেকে সহজেই ধারণা করা যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগে ট্রাম্প যেসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার এক বছর পরেও সেগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমে সাতটি এবং পরে ছয়টি মুসলিমপ্রধান দেশ থেকে যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। অন্যটি হলো সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার করা স্বাস্থ্য বীমাব্যবস্থা, যা ওবামাকেয়ার নামে পরিচিত তা বাতিল করা। এখানে ট্রাম্পের জারি করা প্রথম নির্বাহী আদেশের বাস্তবায়ন দেশের একটি আদালত স্থগিত করে দেন, পরে তা সংশোধিত আকারে আবার জারি করা হলেও আরেক আদালত তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছেন। একটি আদালতের তিনজন বিচারক তাদের দেয়া রুলিংয়ে বলেছিলেন যে, অভিবাসন ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বে প্রশ্ন করা যাবে না বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে ধারণা দেয়া হয়েছে, তা অগণতান্ত্রিক। এ ক্ষেত্রে আদালত নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার রেশ টেনে ধরেছেন। ওবামাকেয়ার বাতিলের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রীতিমতো হুমকি দিলেও দেশের আইন-প্রণেতাদের বড় অংশ তার সাথে একমত হননি এবং তার কাঙ্ক্ষিত বিল পাস হয়নি। উল্লেখ্য, যে আইনসভা প্রেসিডেন্টের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করল না তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তাঁর নিজের দলেরই। নির্বাহী বিভাগের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন যে আইন বিভাগের কাজ নয়, সেটা এ থেকে প্রমাণিত।

নির্বাহী বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে যখন বিভাজন স্পষ্ট (যেমন প্রেসিডেন্ট শাসিত মার্কিন ব্যবস্থা, যেখানে আইনসভা অনেক শক্তিশালী) সেখানে এই ধরনের ভারসাম্য ব্যবস্থা যতটা সহজ, সংসদীয় ব্যবস্থায় ততটা সহজ নয়। ক্ষমতার এই ভারসাম্য ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে তা শুধু গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিরই ইঙ্গিত করে না, রাষ্ট্রের লিবারেল চরিত্রকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। এ কারণে যেসব দেশে শক্তিশালী সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর, সেখানে এমনকি ক্ষমতাসীন দলের সাংসদেরাও তাদের সরকারের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন। যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ওই দলের সাংসদদের ভোট দেওয়ার ঘটনা সবসময় ঘটে। এটিই হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের সাথে আইনসভার বিভাজন। কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের আগেই আদালতের বিচারকেরা আইন-প্রণেতাদের বলতে পারেন না যে তারা কী আইন তৈরি করবেন, তেমনি আইনসভার সদস্যরা অনেক পরিশ্রম করে আইন তৈরি করেছেন বলেই আদালত তাতে সম্মতি দিলে আদালত তার দায়িত্ব পালন করেছেন তা বলা যায় না। কাজেই তিন বিভাগের মধ্যে কাজে সমন্বয়ের সাথে সাথে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে একে অপরের কাজের ওপর নজর রাখা ও স্বাধীনভাবে কাজ করা।

**কার্যকরী স্থানীয় শাসনব্যবস্থা:** তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহলে স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়। একটি শক্তিশালী তথা কার্যকরী স্থানীয় শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা (জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির চর্চা, সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণের অভাব ইত্যাদি) দূর করে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারে। তৃণমূলের গণতন্ত্র শক্তিশালী করার মাধ্যমে সত্যিকারের গণতন্ত্রায়ণ সম্ভব, কারণ তৃণমূল-গণতন্ত্র গণতন্ত্রকে গভীরতা প্রদান করে যার সুফল সাধারণ জনগণ ভোগ করতে পারে। সে-কারণেই বিভিন্ন দেশের সংবিধানে প্রশাসনের সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে একটি স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশনা দেওয়া আছে। এভাবেই তৃণমূলের শাসন কার্যকর করার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যা বিভিন্ন দেশে বিরাজমান প্রতিনিধিত্বশীল বিকল্প থেকে নিঃসন্দেহে উন্নততর। অর্থাৎ নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ছাড়া গণতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা জড়ো হতে না দিয়ে এ ব্যবস্থা সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতার পৃথকীকরণে সহায়তা করে।[৪২]

একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শুধু গণতন্ত্রকে সুসংহত করে না, উন্নয়ন কার্যক্রমকেও ত্বরান্বিত করে। গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ওপর স্থানীয় শাসনের ভার অর্পণ করার কথা বলা হয়, যার মধ্যে জনকল্যাণমূলক সরকারি সেবা প্রদান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব পালন অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বনেতারা যে যুগান্তকারী ও সার্বজনীন 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা'[৪৩] (এসডিজি) অনুমোদন করেছেন, যে লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে ও টেকসইভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করা, সেগুলো স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন হবে সত্যিকারের বিকেন্দ্রীকৃত ও স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, যা জনগণের অধিকার সচেতনতা, তার সংগঠন করার ক্ষমতা, স্থানীয় পর্যায়ে স্ব-শাসিত সরকারের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়াতে পারে। কাজেই অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের জীবনমানে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী এমডিজি ও এসডিজির গৃহীত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কৌশল অত্যন্ত কার্যকর।

সর্বোপরি, যেহেতু দলমত নির্বিশেষে সমাজের সব ক্ষেত্রের মানুষ এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত এবং তারা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে, ফলে দেখা যায় চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বা যে-কোনো ধরনের আপদকালীন সময়েও এ কাজের সাথে যুক্ত স্থানীয় সরকারগুলো থাকে সংঘাতমুক্ত। তৃণমূলের নাগরিক-সমাজ যেখানে যত বেশি সক্রিয়, সেখানেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তত

বেশি কার্যকরী। ফলে জনগণও বেশি উদ্যোগী থাকে এবং মানুষের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন তত বেশি হয়। এ কারণেই বিশ্বব্যাপী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যক্রমে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে তা কাজে লাগাতে প্রতিটি দেশের সরকারের উচিত এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

**কর্তৃত্ববাদের অবসান:** প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জায়গাতেই কর্তৃত্ববাদের অবসান গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে। আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়নের (আইপিইউ) ১৩৬ তম সম্মেলনে[৪৪] গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রস্তাব নেয়া হয়েছে সেগুলো হলো: কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, বৈষম্য কমিয়ে আনা, নারীর ক্ষমতায়ন, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ ইত্যাদি। এসব প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দেশের নীতিনির্ধারকেরা কতটা মেনে চলবেন তার ওপর নির্ভর করবে গণতন্ত্রের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ। আইপিইউ সম্মেলনে কোনো দেশের ওপর অন্য দেশের হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার ছোট গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে অনেক দেশের ভঙ্গুর গণতন্ত্র কিছুটা হলেও সবল হবে। গণতন্ত্র একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ও নিরন্তর অনুশীলনের বিষয়। একে নিছক আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে পরিপুষ্ট করা যায় না। বর্তমান বিশ্বে সামরিক শক্তি ছাড়াও নানা অস্ত্র বা মাধ্যম প্রয়োগ করে বড় রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে হস্তক্ষেপ করে থাকে, যা দুর্বল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও দুর্বল ও ভঙ্গুর করে তোলে। কাজেই বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে হলে কর্তৃত্ববাদেরও অবসান জরুরি। মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রেম[৪৫] ফ্যাসিবাদী নেতা ও তার অনুসারীদের ওপর গবেষণা করে সিদ্ধান্ত এসেছিলেন, নিজের ওপর ভরসার অভাবে, স্বাধীনতার যোগ্য না হওয়ায় আমরা পরাক্রমশালী নেতার দ্বারা চালিত হই বা হতে চাই। আমরা যখন প্রকৃত স্বাধীনতা সহ্য করতে পারি না, তখনই আমরা অধীন হওয়ার পথে বসি। কাজেই স্বাধীন চেতনাবোধ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কাঠামো শক্তিশালী করে আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদকে রুখকে পারলেই গণতন্ত্র সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

সংলাপ: গণতান্ত্রিক সংকট উত্তরণে সংলাপ অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সংকট যখন দেখা দেয় তখন সরকারি দলের সাথে বিরোধী দলের সংলাপই এ সংকট উত্তরণের অন্যতম পথ। প্লেটো 'সংলাপ' শব্দটি ব্যবহার করেন তাঁর *Republic* গ্রন্থে। এর দ্বারা তিনি বিভিন্ন মতের মধ্যে পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব থেকে সত্য উদ্ঘাটনের কথা বলেন। সংলাপের মাধ্যমে প্লেটো যে দার্শনিক সত্য খুঁজে পান তা হলো ন্যায়পরতা। এ সত্য অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ন্যায়পরতা। অথাৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে নৈতিকতার ভিত্তিতে। প্লেটোর সংলাপতত্ত্ব চলমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের দার্শনিক দিক-নির্দেশনায় পরিণত হয়েছে, রাজনৈতিক সত্য উদ্ঘাটনে দার্শনিক মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত

হচ্ছে। রাজনৈতিক সংকটের মূলে রয়েছে নির্বাচনকালীন সরকার পদ্ধতির বিষয়ে রাজনৈতিক দল বা জোটের পরস্পর বিরোধী অবস্থান। আর রাজনৈতিক সত্যটি হলো নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন নিশ্চিতকরণ।[৪৬]

**যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন:** পেরিক্লিস দাবি করেন যে এথেনীয় গণতন্ত্রে যারা যে-কাজের উপযুক্ত, তাদের সে-কাজে নির্বাচিত করা হতো। নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেরিক্লিসের মতে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ পদে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। তবে এতে সবসময় যে সমস্যা হয় তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এত বেশিসংখ্যক উপযুক্ত প্রার্থী থাকেন যে তাঁদের যে-কেউ সরকারের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ। বর্তমান বিশ্বে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতা বনাম রাজনৈতিক বিবেচনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে।[৪৭] এক্ষেত্রে সঠিক প্রার্থী নির্বাচন একটি কঠিন বিষয়। সাংবিধানিক পদসমূহে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করতে পারলে গণতন্ত্র কিছুটা হলেও সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

**গণতান্ত্রিক সমতা:** একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে, যা সমঅধিকারের ধারণা বলে পরিচিত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সবাইকে সমান মনে করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবারই সমান ভোটাধিকার থাকে, সবার ভোটেরই সমান গুরুত্ব। সমতার এ দিকটি গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি।[৪৮] এই সমঅধিকারের সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। একজন ব্যক্তি কোনো নির্বাচনে একাধিক পদপ্রার্থীর মধ্যে কাকে ভোট দিবেন তা ব্যক্তির নিজের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এমন স্বাধীনতাকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বলা যায়। মানুষকে ধর্ম, বর্ণ বা গোত্রের আলোকে বিবেচনা না করে সব মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে পারলেই আমরা সমতার বিশ্বজনীনতায় পৌঁছাতে সক্ষম হবো। এক্ষেত্রে সার্জেন্ট-এর মত, মানুষের প্রতি যে সম্মান দেখানো যায়, সেই সম্মানকে সবার ক্ষেত্রে সমান করে দেখলে সেটাই হবে অন্য সকল প্রকার সমতার মূল ভিত্তি।[৪৯]

**নৈতিক ব্যক্তি, আদর্শ ও মূল্যবোধের ভূমিকা:** সমকালীন সমাজব্যবস্থা প্রধানত রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক। কিন্তু বিশ্বব্যাপী রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের সংকট আমরা দেখতে পাই। এ সংকটকে মোকাবেলা করতে সারাবিশ্ব হিমশিম খাচ্ছে। এ সংকট মোকাবেলায় নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে

পারে তা  কিছু দার্শনিকের মতামত তুলে ধরে তার আলোকে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনায়ককে পরিচালিত করতে পারলে পৃথিবী সবার জন্য হয়ে উঠতে পারে মঙ্গলময়। কনফুসিয়াস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Analects*-এ নৈতিক আদর্শ বা 'লি'-কেই মানব-সভ্যতার মূল ভিত্তি বলেছেন। তিনি মনে করেন, নৈতিক আদর্শ আমাদের উন্নত ও সংস্কৃতিবান সামাজিক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের জন্য অপরিহার্য। লির দ্বারাই মানুষ তাঁর মধ্যকার পশুত্বভাব দমন করে সমাজের ভালো ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হতে পারে। এর ফলে দূর হয় সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। এরপর 'তাও' বা সৎ পন্থার মাধ্যমে কনফুসিয়াস সমাজ ও সরকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেন।[৫০] প্লেটো তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থে নৈতিকতা ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি উৎকৃষ্ট সরকার-ব্যবস্থায় প্রজ্ঞা ও স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেন। তিনি বলার চেষ্টা করেন যে, স্বাধীনতা, ঐক্য ও সমঝোতা নিশ্চিত করার জন্য জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের নিমিত্ত; এবং এ সবই সম্পাদিত হবে মঙ্গলময় দেবতাদের প্রতি অনুগত হয়ে, তাঁদেরকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে। তবে কোনো ক্ষেত্রেই শাসক আইনের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হবেন না, আইন হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান।[৫১] তিনি তাঁর *Republic* গ্রন্থে ন্যায়পরতাকেই মুখ্য বলেছেন। তাঁর মতে, অভিভাবক শ্রেণি, সৈনিক শ্রেণি, এবং উৎপাদক শ্রেণি কেউ একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করে স্ব স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আদর্শ রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি, নিয়ন্ত্রিত প্রজনন, সঠিক নির্বাচন ও উৎকৃষ্ট শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি করতে হবে। এ রাষ্ট্রে সমাজ-ব্যবস্থাকে করতে হবে যৌথ ও সাম্যবাদী, ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিলুপ্ত হবে। ব্যক্তি-মানুষের জৈবিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় করতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থেই। তিনি আরও অভিমত দেন যে, রাষ্ট্রের অভিভাবক বা শাসক হবেন প্রজ্ঞাশীল জ্ঞানী দার্শনিকবৃন্দ।[৫২]

এরিস্টটল তাঁর *Politics* গ্রন্থে সমাজ, রাজনীতি ও নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরিস্টটলের মতে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রও একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শপূর্ণ নৈতিক প্রতিষ্ঠান। তিনি মনে করেন, রাজনীতি ও রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা সমাজের সদস্যদের নৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একটি সুসংবদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। তাঁর মতে, ভাল রাষ্ট্র হচ্ছে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সাংবিধানিক রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র। বিপরীতে মন্দ রাষ্ট্র হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র এবং র‍্যাডিকেল গণতন্ত্র। তাঁর মত হলো, সাংবিধানিক রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক প্রকৃতি সম্পন্ন রাষ্ট্র; এ ধরনের রাষ্ট্রেই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সম্ভব এবং এরূপ রাষ্ট্রেই বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। নৈতিক গুণাবলিবিশিষ্ট ব্যক্তির মতো রাষ্ট্র বা সরকার চরম ও দুর্বলের মধ্যবর্তী একটি যুক্তিধর্মী বা যৌক্তিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এরিস্টটলের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজের সাফল্য ও প্রগতি এবং নাগরিকদের সুশিক্ষা ও নৈতিকতার ওপর নির্ভরশীল। সুশিক্ষা

মানুষের অভ্যাস ও বুদ্ধিকে সংশোধন করতে সক্ষম। মানুষকে লক্ষ্য বা পরিণতির দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম। তত্ত্বের চেয়ে সৎকর্মই মানুষকে সততা ও নৈতিকতার শীর্ষদেশে পৌঁছাতে অধিকতর সহায়তাকারী শক্তি। এরিস্টটলের মতে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র হচ্ছে সেটি, যা সকল নাগরিকের মৌলিক ও সাধারণ স্বার্থসমূহ চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম। এছাড়াও আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের প্রচুর পণ্যদ্রব্য ও সুবিধা প্রদান করা যাতে তারা সততা অনুশীলন ও সুখ লাভ করতে সমর্থ হয়।[৫৩] প্লেটো ও এরিস্টটল উভয়েই নীতিবান ও প্রজ্ঞাশীল শাসক তৈরীর পন্থা নির্দেশ করেছেন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিপূর্ণ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আজও সম্ভব হয়নি।

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আল ফারাবি ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংগীতশাস্ত্র সহ আরও বহুশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। নৈতিক রাষ্ট্র ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়। প্লেটো ও এরিস্টটলের ন্যায় তিনিও মনে করেন জ্ঞান বা প্রজ্ঞাই মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। নৈতিক নিয়মাবলি অনুসরণ করে যে ব্যক্তি কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই উত্তম ব্যক্তি। নিম্ন প্রাণীদের মতো মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, ক্রোধ-হিংসা থাকলেও যারা বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় তারা উৎকৃষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্রীয় নীতির ওপর রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *সিয়াসাত ও আরা*। তাঁর মতে, নিজেদের জীবন নিরাপদ, শক্তিশালী, ঐশ্বর্যময় ও সুখকর করে গড়ে তোলার জন্য বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে গ্রাস করতে চায়। এসব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের ওপর ভূখণ্ডগত অধিকার অর্জন করতে ব্যর্থ তখন তাদের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। এসব রাষ্ট্র সর্বদাই অন্যসব রাষ্ট্রকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে নিজেরা সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি বলেন, এ রাষ্ট্রের শাসক হবেন নৈতিক ও আদর্শ গুণাবলির অধিকারী। শুধু খলিফার মধ্যে এসব গুণাবলির সমাহার না ঘটলে একাধিক প্রাজ্ঞ নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন দার্শনিক শাসকগণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রে দর্শনের স্থান না থাকলে আদর্শ শাসকের অভাব দেখা দেবে এবং একসময় তার পতন ঘটবে। তিনি আরও মনে করেন যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেই নৈতিকতার প্রকাশ ও রূপায়ন ঘটে; রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু ঐহিক উন্নতি সাধনই নয়, আত্মিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন সাধনও এর কর্তব্য।[৫৪]

মুসলিম পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে ইবনে রুশদও নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর মতে, সামাজিক জীবন নিঃসঙ্গ জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সৃষ্টিধর্মী। সমাজে বাস করেই মানুষকে সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকতে হবে। পুরুষদের মতো

নারীদেরও যোগ্যতা রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে নারীদের এ যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ করে দিতে হবে। তিনি নারীদের জন্য সমঅধিকারের বৈপ্লবিক ধারণা ও মত প্রকাশ করেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতনের কোনো স্থান নেই। তাঁর মতে, প্লেটোর আদর্শ গণরাষ্ট্রের সামাজিক রূপায়ণ খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করলেও আমীর মুয়াবিয়া কর্তৃক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে তার বিলুপ্তি ঘটে এবং মানুষের ভাগ্যে নেমে আসে বিপর্যয়। তিনি আরও মনে করেন, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ প্রজ্ঞার ফসল। ধর্ম বা ফিক্‌হ নয়, প্রজ্ঞাই ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের চূড়ান্ত মানদণ্ড। ধর্মের উদ্দেশ্য জ্ঞান নয়, আইন। আর আইন হচ্ছে বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা কর্তৃক রচিত এবং সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত।[৫৫]

কার্ল মার্কসের বস্তুবাদ সমাজ পরিবর্তনের দর্শন, সমাজ বিপ্লবের দার্শনিক ভিত্তি। এ দর্শনে তিনি মানুষের মুক্তির দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন সামাজিক সংকটের মূলে রয়েছে সামাজিক বৈষম্য। এ বৈষম্য থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তিনি সমাজের গুণগত পরিবর্তনের কথা বলেছেন। *Thesis On Feuerbach*-এর ১১ নং থিসিসে তিনি এ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। তিনি মনে করেন, মানুষের মুক্তির প্রথম পর্যায় হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তি। তিনি ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমতা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন। তিনি সামাজিক সমতা ও অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বণ্টনের নীতি প্রণয়ন করেন। এ নীতির চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পত্তিতে সামাজিক মালিকানা থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন হবে। তিনি পুঁজিবাদী সমাজের বিপরীতে কমিউনিজমের কথা বলেন। যেখানে ব্যক্তি-স্বার্থের সাথে যৌথ-স্বার্থের সমন্বয় সম্ভব। এখানে প্রত্যেকটি মানুষ বিকাশের সমান সুযোগ পাবে।[৫৬]

বর্তমান শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেন সুন্দর ও সত্য মানুষকে জীবনের অমানিশার মধ্যে পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। তিনি লক প্রভাবিত উদারনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ও নৈতিক স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এ ধরনের নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সহসা গড়ে ওঠে না; আধুনিক শিক্ষার আলোকে পরিচালিত হয়ে ক্রমশ সর্বপ্রকার পুরাতন কুসংস্কার হতে মানুষ মুক্তি লাভ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।[৫৭]

## ৭.৮ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ও সমাধান

এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মানুষ চেয়েছিল অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন সাম্যবাদী ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে। তবে সে সুযোগ তিনি পাননি। সে-ব্যবস্থা কায়েম করার পূর্বেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটে। জেনারেল জিয়াউর রহমান শীর্ষ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মোশতাক আহমদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সামরিক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক আদর্শসমূহ সংবিধান থেকে অপসারিত করে পাকিস্তানিদের মতো তিনিও ধর্মব্যবসা ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে জেনারেল এরশাদও একইভাবে সামরিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ও রাজনীতি চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যাত্রাকে ব্যাহত করে। পরবর্তী পর্যায়ে সামরিক স্বৈরাচারের অবসান ঘটলেও গণতন্ত্রের পোশাকে স্বৈরতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও ধর্মের রাজনীতিকরণ অব্যাহত রয়েছে। জিয়া ও এরশাদের আমলের মতো ধর্মের মেকি প্রতিযোগিতা এখনও বাংলাদেশে অব্যাহত রয়েছে। ফলে নীতি, ন্যায়পরতা ও সঠিক মূল্যবোধের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে জীবন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে।[৫৮]

গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে একটি 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের' প্রসঙ্গ (যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার পূর্বশর্ত)। বাংলাদেশের রাজনীতি বারবার এই একই সংকটের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ সংকট থেকে মুক্তির জন্য প্লেটোর *Republic*-এর সংলাপ তত্ত্বের প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাঁর দার্শনিক সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ বা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। আড়াই হাজার বছর পর প্লেটোর সংলাপের ধারণা বাংলাদেশে প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্লেটোর সংলাপের কেন্দ্রীয় অবস্থানে ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের ধারণা, সেখানে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে সংলাপের কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে একটি 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সতেরো শতকের ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক তাঁর *Two Treaties of Civil Goverment* নামক গ্রন্থে যে সম্মতির ধারণা (সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকার) দেন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে তা প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় সুষ্ঠু নির্বাচন এবং সে-লক্ষ্যে নির্বাচনকালীন সরকার। অর্থাৎ নির্বাচনে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সকলের সম্মতির ভিত্তিতে একটি নির্বাচনকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা লকের সম্মতিতত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি।[৫৯]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে জাতীয় ঐক্যের অভাব রয়েছে সেখানে হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রয়োগ করা যায়। নির্বাচনকালীন সরকার প্রসঙ্গে সরকারি দলের প্রস্তাব, বিরোধী দলের পাল্টা প্রস্তাব এবং নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন মহলের এই দুই পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাবের মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয়ের প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে যেমন জার্মানির জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিলো, বর্তমান বাংলাদেশেও তেমন দেশ ও জাতির স্বার্থে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানসম্মত না হলেও এর অধীনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা অনেকাংশেই মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের দোহাই দিয়ে তা বাতিল করে দেয়া হয়। ফলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংকট তৈরি হয়। এ সংকট উত্তরণের জন্য প্লেটোর সংলাপের ধারণা থেকে লকের সম্মতিতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর মতপার্থক্য দূর করে একটি অভিন্ন মতে পৌঁছানো যায়, যাতে সকলের সম্মতি থাকবে। এখানেই লকের সম্মতিতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ও ব্যবহারিক তাৎপর্য। সম্মতির ধারণাই লকের উদারনীতিক গণতন্ত্রের ভিত্তি। লকের 'সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকার' বর্তমান বাংলাদেশের 'নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৬০]

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হলো সাংবিধানিক ত্রুটি। যখন কোনো দেশের জনগণের আশা-অকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার প্রতিফলন সংবিধানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় তখন তাকে একটি নৈতিক সংবিধান বলা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধামন্ত্রীকে যেভাবে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে তাতে সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। সে-কারণেই গণতন্ত্রকে কার্যকরী করতে হলে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক অনুচ্ছেদগুলো সংশোধন করে পূর্ণাঙ্গ একটি সংবিধান রচনা করা গেলে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক শাসনে এগিয়ে যাবে। শুধু নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া নয়, রাষ্ট্র ও সংবিধানের কাঠামোগত বা মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতির স্বরূপ, নির্বাচন-ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপের রাষ্ট্রদার্শনিক বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। এখানে গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ সমষ্টির স্বার্থবিবর্জিত ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক। ফলে তা নীতিদার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়নি। এ কারণে এখানে সরকার, সংসদ, প্রশাসন, বিচার-ব্যবস্থা, নির্বাচন-ব্যবস্থা কোনো ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেনি। গণতান্ত্রিকতার পরিবর্তে সব ক্ষেত্রে দলীয়করণ হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়ে লেজুড়বৃত্তির চরিত্রে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি দ্বারা। কাজেই অর্থনেতিক নির্ভরশীলতা ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহের প্রতি সচেতনার

অভাবে এদেশের অধিকাংশ জনগণ রাজনৈতিক অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারছে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে হলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার অধিকারের সফল রূপায়ণ একান্ত প্রয়োজন।[৬১]

কোনো জাতির উন্নতির পেছনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কাজ করে সেটি হলো সফল নেতৃত্ব। নেতৃত্ব ও নেতা দেশকাল নিরপেক্ষ হবে না। সফল নেতৃত্ব স্বজাতিকে তৈরি করেন। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনির্মাণ করেন। আবার নেতারও শিক্ষা, প্রস্তুতি ও বিকাশ পর্ব থাকে। অনেক দিনের লড়াই-সংগ্রাম, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেমন উত্তম নেতা তৈরি হয়, তেমনি নেতাও অনেক চেষ্টার মধ্য দিয়ে দেশের জন্য আকাঙ্ক্ষিত জনগণ তৈরি করেন। এক্ষেত্রে নেতা ও জনগণ পরস্পর পরস্পরকে তৈরি করে। তবে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব তৈরির জন্য জনগণের ভূমিকা অপরিহার্য। আমরা যদি আমাদের জাতির ভেতরে ভালো নেতৃত্বের উদ্ভব আশার করি, তাহলে অবশ্যই ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও অতীতের নেতৃত্বের ভালোমন্দ বিচার করে উন্নত ভবিষ্যতের প্রয়োজনে তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোনো জাতির ভালো নেতৃত্বের জন্য শুধু নেতাদের নয়, কর্মীদেরকে এবং জনসাধারণকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। নেতৃত্ব নিয়ে যখন প্রতিযোগিতা ও বিরোধ দেখা দেয় তখন তার মীমাংসা করা কর্মীদের ও জনসাধারণের কর্তব্য। কর্তব্য এড়িয়ে গেলে কিংবা অনৈক্যে লিপ্ত হলে পরিণতি খারাপ হতে বাধ্য। হেগেলের উক্তি স্মরণযোগ্য, যে জনসাধারণ যখন যেমন নেতৃত্বের যোগ্য হয় সেই জনসাধারণ নিজেরা নিজেদের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে তখন ঠিক সেরকম নেতৃত্বই সৃষ্টি করে। 'মহান নেতা মহান জাতি সৃষ্টি করেন' এ কথা যতটা সত্য, ঠিক ততটাই সত্য 'মহান জাতি মহান নেতা সৃষ্টি করে'।[৬২]

ভালো নেতৃত্ব ব্যতীত ভালো সরকার সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে নেতাকে হতে হবে সব্যসাচী। যে নেতা একই সাথে নেতৃত্ব ও লেখালেখির গুণ অর্জন করেছেন তারা তত দ্রুত সুযোগ্য নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। যেমন : লেলিন, স্ট্যালিন, মাও-সেতুং, ফিদেল ক্যাস্ত্রো, চে গুয়েভারাসহ সকলেই যেমন জননেতা ছিলেন তেমনি লেখকও ছিলেন। কাজেই মহান নেতাকে হতে হবে তাত্ত্বিক, মেধাবী ও সৃষ্টিশীল লেখক, যিনি নিজ দেশে জনগণ এবং পরিবেশের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রকে বিকশিত করবেন।

এছাড়াও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। সিদ্ধান্ত বলতে বোঝায় এমন এক কর্মপন্থাকে, যা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং কিছু সংখ্যক বিকল্প কর্মপন্থার মধ্য থেকে স্থির করা হয়। এ প্রসঙ্গে ডহার্টি ও ফলজ্‌গ্রাফ উল্লেখ করেন, "সিদ্ধান্ত হলো এমন এক প্রকার পছন্দ, যা বিভিন্ন বিকল্প পছন্দের মধ্য থেকে বাছাই করা হয় এবং বাছাইকালে বিভিন্ন পছন্দের সম্ভাব্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও যৌক্তিকতা বিচার করা হয়।"[৬৩] ডাইজিং বলেন, "রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হলো এমন এক সিদ্ধান্ত যা সিদ্ধান্ত

কাঠামোর সংরক্ষণ ও অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত।"[৬৪] রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, ভোট, প্রভাব প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উপাদান ধারণে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও ভিন্ন ভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, সরকারের শাসন বিভাগই বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে থাকে। অন্যদিকে তেমনি সাংগঠনিক পর্যায়ে রয়েছে ঐক্য, গোপনীয়তা রক্ষা করার দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় কৃতিত্ব। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সীমিত যুক্তিবাদের প্রয়োগ হয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সমাধান, সমাধানের বাস্তবায়ন, কর্ম ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। মূলত সীমিত সুযোগ থেকে কাম্য ফল পাওয়ার জন্যই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। সদ্‌গুণ ও বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টির ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। সদ্‌গুণ ও বুদ্ধিই হচ্ছে উত্তম সরকারের অন্যতম উপাদান। যে-কোনো সরকারের উৎকর্ষের মাপকাঠি হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে তার সদ্‌গুণ ও বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টির ক্ষমতা।[৬৫] এক কথায় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে উদারনৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চাই গণতন্ত্রের সংকটকে কিছুটা হলেও দূর করতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে আইন-শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হচ্ছে। নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধ পদদলিত হচ্ছে প্রায়ই সর্বত্র। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাষ্ট্রের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিনিধি, সন্ত্রাসী ও ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য হুমকি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বাংলাদেশে এখন অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। এ অবস্থায় আমাদের উচিত প্লেটো-এরিস্টটল, ফারাবি-ইবনে রুশদ, মার্কস-রাসেল প্রদর্শিত ন্যায়, সাম্য ও মানবতাবাদী দর্শনের আলোকে ও আদর্শে একটি নৈতিক, কল্যাণধর্মী ও সুন্দর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

### ৭.৯ সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা

মানুষ সবসময় একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের অংশ হতে চায়। মানুষ আশা করে এমন একটি সমাজ যেখানে মানবিক বোধ ও নৈতিক বোধ ক্রিয়াশীল থাকবে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ উপহার দিতে পারবে না, ফলে এ ব্যবস্থা হয়তো চূড়ান্ত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে না। সামাজিক বৈষম্য ও অসমতাই সামাজিক সংকটের মূল কারণ। মানুষ স্বাধীনতা চায়, চায় মানবিকতা ও মানবিক মুক্তির ধারণা নিয়ে এগিয়ে যেতে। আর এজন্যই মনে হয় একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শই হলো যথার্থ আদর্শ, যার ভিত্তিতে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যেখানে ব্যক্তির মানবিক স্বাধীনতা থাকবে।

এ যাবত রাষ্ট্রদর্শনে যত মতবাদের চর্চা হয়েছে তার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে গ্রহণযোগ্যতার সাথে চর্চা হয়েছে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব। এ সাফল্যের পিছনে রয়েছে উদারনৈতিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাগুলির জীবনীশক্তি, যা তিনশো বছরের অধিককাল সময় বিভিন্ন পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে এ রাষ্ট্রতত্ত্বটিকে তার গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। সমাজ ও অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য উদারনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলোর সামাজিক-নৈতিক-রাজনৈতিক যুক্তিসমাবেশ করাই হলো উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের কাজ।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে স্পেনে 'লিবারালেস'[৬৬] নামে রাজনৈতিক দলটি 'সাংবিধানিক' শাসনের অর্থাৎ সীমিত রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবিতে আন্দোলন করত। সুতরাং উনিশ শতকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সীমিত রাষ্ট্রের দাবি যে রাষ্ট্রদর্শনের মুখ্য বক্তব্য হয়ে ওঠে তা ইংল্যান্ডে উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব নামে পরিচিত হয়।[৬৭] আধুনিক যুগের এই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধরনটি ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত সহ বহু দেশে বিদ্যমান। 'উদারনীতিবাদ' ও 'গণতন্ত্রের' সংযুক্তির ফল হলো উদারনৈতিক গণতন্ত্র, যার উদ্ভব উনিশ শতকে। তবে উদারনীতিবাদ ও গণতন্ত্র সমার্থক নয়। একসময় এমন অনেক রাষ্ট্র ছিল যেগুলোকে উদারনীতিবাদী রাষ্ট্র বলা হতো, কিন্তু সেগুলোর সব গণতান্ত্রিক ছিল না। বিকাশের এক বিশেষ পর্বে উদারনৈতিক রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গণতান্ত্রিক নীতিসমূহকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে উদারনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের যে সংযুক্তিকরণ ঘটে তারই ফল হিসেবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার মতে, ১৮৪৮ সালের মধ্যেই গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য অনেক দেশে উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৬৮] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন এবং অন্য কয়েকটি দেশকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'উদার বিশ্বব্যবস্থা' ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করে। ৩০ বছরে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বকে যে ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেটাই ছিল এর লক্ষ্য। এর ধারাবাহিকতার বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশও আইনের শাসনভিত্তিক এমন একটি আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আসার জন্য আগ্রহী হলো, যার মাধ্যমে প্রতিটি দেশ পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সীমারেখার ওপর শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারবে। তারা ভেবেছিল, সেই উদার বিশ্বব্যবস্থায় মানবাধিকার সংরক্ষিত থাকবে। পৃথিবী নামক এই গ্রহের কল্যাণের জন্য এই ব্যবস্থা চালু হবে এবং এই ব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের বিষয়ে সবার জন্য সুযোগ থাকবে। উদার বিশ্বব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি জোরেশোরে আবির্ভূত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রাথমিক পর্বের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জন লক, মন্টেস্কু থেকে শুরু করে জন স্টুয়ার্ট মিল পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। এঁদের রচনায় উদার গণতন্ত্রের মূল ধ্যান-ধারণা

পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জন লক তাঁর *The Second Treatise of Government* গ্রন্থে স্বৈরাচারী শাসনকে প্রতিরোধ করার অধিকার সমর্থন করেছেন। লকীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্তর্নিহিত বক্তব্য হলো, ব্যক্তির মৌলিক অধিকারকে সম্মান জানানো এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার সবরকম দুর্বলতা ও ত্রুটির মহৌষধ হিসেবে উদারনৈতিক রাজনীতি সমর্থন করা। ব্যক্তির মৌলিক অধিকার বলতে তিনি তিনটি অধিকারকে বুঝিয়েছেন: জীবনধারণের অধিকার, স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার এবং সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করার অধিকার। এর মধ্যে সম্পত্তির অধিকারকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হলেই জনকল্যাণ সম্ভব এবং তখনই জনস্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো জনগণের নৈতিক মান রক্ষা করা। ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করেই লক সমাজ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা গড়ে তোলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'প্রাকৃতিক আইন'-এর ব্যাখ্যা দেন এবং বলেন, প্রতিটি ব্যক্তির সহজাত ও অকাট্য অধিকার যা জন্মগত, তা হলো 'প্রাকৃতিক আইন'। নৈতিকতাই হলো আইনের ভিত্তি, আইন থেকে নৈতিকতা সৃষ্ট নয়। রাষ্ট্র ও সমাজের নৈতিক কর্তব্য হলো ব্যক্তির 'প্রাকৃতিক' অধিকারগুলো (জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার) রক্ষা করা। লক যে ধরনের উদারনৈতিক নাগরিক সমাজকে বৌদ্ধিক সমর্থন দেন তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীন নাগরিকদের সংঘবদ্ধ সামাজিক গোষ্ঠী, আইনের অনুশাসন মেনে সকলের মধ্যে সাম্য এবং নিজ নিজ অধিকারের প্রতি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন। তিনি মনে করেন, মানুষ যখন অনেকে মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সমাজ গঠন করে এবং প্রকৃতির বাস্তবতা থেকে প্রাপ্ত তাদের ক্ষমতাকে বর্জন করে এবং এ ক্ষমতা জনগণের নিকট অর্পণ করে, কেবলমাত্র তখনই রাজনৈতিক বা সুশীল সমাজকে পাওয়া যায়। এটি তৈরি হয় মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয় একটি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি জনসমষ্টি ও একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। এমন সরকারকে লক বলেছেন কমনওয়েলথ, যার উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ। কমনওয়েলথ ও সরকার বিষয়ে লকের এই মতাদর্শ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই একটি প্রতিফলন, কারণ লক একে বলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত। একটি সরকারের অধীনে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি মানুষ অন্যদের সাথে ঐকমত্যে আসে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে নিজেকে সমাজের অপর সকলের নিকট দায়বদ্ধতার অধীন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া, এটা হলো গণতান্ত্রিক বিষয় এবং একজন মানুষকে অপরের নিকট দায়বদ্ধ থাকা, এটা হলো নৈতিক দায়বদ্ধতা।[৬৯] এভাবে তিনি দেখান উদারনৈতিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবে সীমিত, আর এই সীমারেখা টানার ক্ষমতা থাকবে নির্বাচিত সংসদের সদস্যদের হাতে।

মন্টেস্কু *The Spirit of Laws* গ্রন্থে রাষ্ট্রপ্রধান রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার নয়, নৈরাজ্য নয়; আইনের সঠিক, স্থায়ী এবং বাস্তব নিয়ন্ত্রণ। স্বাধীনতা হলো সেই আইনের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, যা জনগণের

পক্ষে কাম্য। তিনি প্রায় লকের মতোই বলেছেন, উদারতাই যথেষ্ট নয়, সংযমী শাসনের মধ্যেই আছে মানবতার মুক্তি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ এই সংযমী শাসনেরই এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তাঁর মতে, শাসনযন্ত্রের প্রধান তিনটি বিভাগের (শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ) মধ্যে শাসনক্ষমতা এমনভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত, যার ফলে এক বিভাগ অন্য বিভাগকে ক্ষমতা ব্যবহারে সংযত রাখবে এবং তার ফলে সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে। তিনি দেখিয়েছেন "ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ যাতে না থাকে, তার জন্য এমন অবস্থা দরকার যাতে বিভিন্ন ক্ষমতা পরস্পরকে সংযত রাখে।"[৭০]

জার্মানিতে উদারনৈতিক চিন্তার দার্শনিক রূপ আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে দেখতে পাই ইমানুয়েল কান্টের বক্তব্যে। তাঁর মতে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মর্যাদাকে সম্মান করাটাই উদারনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে উদারনীতিকে দেখা উচিত নয়। তাঁর মতে, ব্যক্তি হলো একটি নৈতিক সত্তা, এবং স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার তার ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত উপাদান। ব্যক্তিসত্তার নৈতিক জীবন বিকাশের জন্যই এগুলি প্রয়োজন। কান্টের বিবেচনায় ব্যক্তিমানুষ আত্মস্বতন্ত্র এবং যুক্তিবাদী। সে-কারণেই একমাত্র উদারনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে কান্ট অপরিহার্য বলে মনে করতেন। আইনের অনুশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের ধারণা তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যে খুবই স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। আইন-নিয়ন্ত্রিত সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষেই তাঁর সমর্থন ছিল। কান্টের নৈতিক নীতি অনুসারে স্বাধীনতার ধারণাকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে যে কেবল নৈতিকতাই অসম্ভব হয়ে পড়ে তাই নয়, মনুষ্যত্বকেও অস্বীকৃতি জানানো হয়। বুদ্ধির অধিকারে মানুষ স্ব-মূল্যে মূল্যবান সত্তা। বৌদ্ধিক প্রকৃতি স্বাধীন, তাই মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বুদ্ধি অন্যান্য বৃত্তির ঊর্ধ্বে থেকে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে। স্বাধীনসত্তার মাঝে সব ধরনের মূল্যের জ্ঞান রয়েছে এবং নিজেকে সে উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করে। আপেক্ষিক মূল্য সম্বলিত বস্তুর বিপরীতে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা হলো ব্যক্তি। কারণ তাদের প্রকৃতিই তাদেরকে নিজস্বভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিসেবে নির্দেশ করে, অর্থাৎ এমন কিছু হিসেবে যাকে কখনো কোনো অবস্থায় নেহাত উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এভাবে ব্যক্তি তার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিশেষে সম্মানজনক পাত্রে পরিণত হয়।[৭১] এছাড়াও কান্ট মনে করেন, ন্যায়পরতা কর্তব্যের অংশবিশেষ। একজন ক্ষুধার্ত বা দুস্থ ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করা যেহেতু খুব সহজ তাই এমনটা করার প্রবণতা পরিত্যাজ্য। কান্ট অন্যের প্রতি প্রশংসনীয় কর্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে, আত্মসুখ বিধান করা প্রত্যেকের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্যের সুখের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো, কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত না করা। মানুষ প্রবঞ্চিত না হলে সে কারো সরাসরি সাহায্য ছাড়াও টিকে থাকতে পারে। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতার ওপরই নৈতিকতার

আদর্শগত ও বস্তুগত উভয় দিকের ভিত্তিমূল স্থাপিত। আবার স্বাধীনতার ধারণার পশ্চাতে রয়েছে যুক্তির দৃঢ় সমর্থন।[৭২] এভাবে স্বাধীনতার ধারণা দ্বারা কান্ট মানব প্রকৃতিকে মহিমান্বিত করেন।

জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনায় ব্যক্তির আচরণ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব লাভ করেছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে শুধু ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন তা নয়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষিত না হলে সমাজেরও ক্ষতি একথা তিনিই স্পষ্ট করে বলেন। তাঁর উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রয়োজনমতো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির সামনে অনেক সুযোগ সৃষ্টি করা যায় এবং উদারনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া যায় না। তাঁর মূল কথা হলো, সব সময় দেখতে হবে কীভাবে চিন্তাভাবনা করে মানুষের সামাজিক জীবনে সম্পর্কগুলোকে প্রয়োজন মাফিক নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির ও সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন করা যায়। তিনি উল্লেখ করেন, গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে সংখ্যালঘুকে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দান করা। তা না হলে গণতন্ত্র হবে মিথ্যা ও অসার; তাছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না।[৭৩] কাজেই সফল গণতন্ত্র বলতে তিনি সচেতন, সংযত, কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক; মার্জিত, দায়িত্বশীল ও সুঠাম শাসন; সরকার ও নাগরিকের পারস্পরিক সহিষ্ণুতা এবং সুস্থ ও শক্তিশালী জনমতকে বুঝিয়েছেন। স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ও দায়িত্বশীল বিচারকার্যও গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি। ব্যক্তির মতো জাতিরও নিজের বিকাশ হওয়া উচিত, জাতির নিজস্ব স্বাধীনতা ও ভূমিকা কার্যকর হওয়া উচিত বলে মিল মনে করেন। মিলের উদারনীতিবাদ অহংবাদকে ত্যাগ করে, সমাজকল্যাণকে গ্রহণ করে, সুখের চেয়ে স্বাধীনতাকে কাম্যবস্তু মনে করে, মানুষের সদিচ্ছা ও সদাচারের ওপর গুরুত্ব দেয়, নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তিত্বের সমস্যার পাশাপাশি তিনি সামাজিক সমস্যাকে বিচার করেন। উদারনৈতিক সরকারের পেছনে উদারনৈতিক সমাজের সহনশীল জনমত, নৈতিক ও মানবিক ভাবনার সমর্থন থাকা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

১৯৫০ এর দশকে উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বে এক বিশেষ সংযোজন হলো ইয়াশা বার্লিনের 'Two Concepts of Liberty' সম্বন্ধে আলোচনা। যুদ্ধোত্তর সমাজের ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক প্রবণতার প্রেক্ষিতে 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' সমস্যাটি তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। দার্শনিক চিন্তার দিক থেকে তিনি উদারনৈতিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করেছে। তিনি স্বাধীনতার 'নেতিবাচক' এবং 'ইতিবাচক' দিক দুটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। রাষ্ট্র কর্তৃক অত্যাচারিত বা নিষ্পেষিত না হওয়ার অবস্থাকে তিনি 'নেতিবাচক' স্বাধীনতা বলেছেন। স্বাধীনতার এই ধারণা যান্ত্রিক এবং নঞর্থক, যার সূত্র খুঁজতে গিয়ে তিনি স্পেন্সার, বেন্থাম, হবস পার হয়ে গ্যালিলিওর জাড্য গতির ধারণায় পৌঁছে গেছেন; অর্থাৎ নঞর্থক স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করে

যতক্ষণ না তার চিন্তা বা কর্মের স্বাধীনতা রাষ্ট্র খর্ব করেছে। আর ইতিবাচক বা সদর্থক স্বাধীনতা বলতে তিনি ব্যক্তির সেই স্বাধীনতা ও সামর্থ্যকে বোঝাতে চেয়েছেন যা ব্যবহার করে ব্যক্তি 'পরিপূর্ণ মানুষ' হয়ে উঠতে পারে। বার্লিনের মতে, সদর্থক স্বাধীনতা ভোগ করার প্রকৃত চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয় যখন নৈতিক বলে বলীয়ান ব্যক্তিকে সমাজ ও রাষ্ট্র-নির্দেশিত মঙ্গল বা কল্যাণের পথ বেছে নিতে বলা হয়। তাঁর কাছে স্বাধীনতার গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হলো গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ধারণা, যার অর্থ হলো সমাজে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজের বিবেক অনুযায়ী অংশগ্রহণের স্বাধীনতা ও সুযোগ। সুতরাং সদর্থক স্বাধীনতার এমন কোনো একটি নির্দিষ্ট রূপ বা সংজ্ঞা হতে পারে না, যা প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বে বার্লিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দান হলো মূল্যবোধের বহুমাত্রিকতার ধারণা। ব্যক্তিমানুষের জীবনে ব্যক্তিগত পছন্দের অধিকার কত গভীরভাবে প্রয়োজন তা সমসাময়িক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তিনি মূল্যবোধের র‍্যাডিকাল বহুমাত্রিকতার ওপর জোর দিয়েছেন।[৭৪]

১৯৫০-৬০-এর দশকে সাধারণভাবে যখন কথা ওঠে যে, উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, ঠিক তখন জন রলস্ এ বিষয়ে মৌলিক বক্তব্য নিয়ে আসেন। তিনি উদারনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে লক ও কান্টকে অনুসরণ করেন। লক ও কান্ট উদারনৈতিকতার অন্যতম প্রবক্তা, যাঁরা রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তির মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তাঁরা উভয়েই কোনো নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে পূর্বশর্ত হিসেবে স্থান দিয়েছেন। জন রলস্ দুর্বল শ্রেণির কথা মাথায় রেখে এমনভাবে সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের প্রণয়ন করেন যাতে সামাজিক ন্যায়বিচার লাভের পথ সুগম হয়। ১৯৫০ দশকের শেষ দিকেই তিনি তাঁর *A Theory of Justice* গ্রন্থের মাধ্যমে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বকে আশার আলো প্রদান করেন। তিনি শুধু কাজ প্রসঙ্গে ন্যায়-অন্যায় ব্যাখ্যা করেননি, পুরো সমাজ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কেমন করে ন্যায় বা সমতাকে গ্রহণযোগ্য করা যায় তার দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। উদারনৈতিক মতবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রে কীভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায় তার নীতিমালা প্রণয়ন করা। সাম্প্রতিক সময়ে দর্শনে অধিবিদ্যক তাত্ত্বিক দিকের আলোচনার তুলনায় ব্যবহারিক চিন্তার ছাপ দৃশ্যমান হচ্ছে, যা রাষ্ট্রের নীতিতেও প্রয়োগ হচ্ছে। তবে সমতার সাথে অসমতার বিস্তারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে-কারণেই জন রলস এ দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, কিছু সমতা আমরা অর্জন করেছি আইন তৈরির মাধ্যমে; যেমন, ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার। তবে উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজে জাতি ও লিঙ্গ বৈষম্যের দিকগুলো নিয়ে এখনো পুরোপুরি সমতা অর্জনের পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এসব বিষয়ে বিভিন্ন দেশে আইন তৈরি করা হয়নি বা প্রচলিত প্রথাই মেনে নেওয়া হয়।

জাতি ও লিঙ্গ বৈষ্যমের সাথে শ্রেণিবৈষম্য সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। সমতার বিপরীতে রয়েছে বৈষম্য, তা কীভাবে রোধ করা যায় সে-বিষয়টি আমরা রলস্‌ের *A Theory of Justice* এবং *Political Liberalism* গ্রন্থে উল্লেখ পাই। বৈষম্য রোধের মাধ্যমে কীভাবে সমতা অর্জন করা যায় তা তিনি তার উদারনৈতিক দর্শনে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে রলস্‌ তাঁর *Political Liberalism* গ্রন্থে দুটি নীতি ব্যাখ্যা করেছেন; যথা, ১. মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে একটি পর্যাপ্ত পরিকল্পনা থাকবে যা সবার জন্য যে পরিকল্পনা তার সাথে সুসঙ্গত, এবং এই পরিকল্পনার সমান রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ঐ স্বাধীনতার নিরপেক্ষ মূল্যের নিশ্চয়তা থাকবে; এবং ২. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতাকে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে; প্রথম শর্তটি হলো সুযোগের পক্ষপাতহীন সমতার শর্তের অধীনে পদ ও অফিস সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের কম সুযোগ প্রাপ্ত সদস্যের অধিক সুযোগ দেয়া।[৭৫] অর্থাৎ এ নীতি অনুসারে অভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ঐসব স্বাধীনতার নিরপেক্ষতার মূল্য নিশ্চিত থাকতে হবে, এবং দ্বিতীয় নীতিতে প্রথমত, সুযোগের সমতার নিরপেক্ষতা থাকবে, এবং দ্বিতীয়ত, কম সুবিধাপ্রাপ্ত সদস্যদের সর্বাধিক সুবিধা দিতে হবে। প্রথম নীতিটা হলো মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার নীতি। আর দ্বিতীয় নীতি হলো পক্ষপাতহীন সমতা এবং কম সুবিধাভোগীদের সর্বাধিক সুবিধা দেওয়া। কম সুবিধাভোগীদের সর্বাধিক সুবিধা বণ্টনের নীতিকে রলস্‌ 'বৈষম্য নীতি' বলে উল্লেখ করেন। তিনি দ্বিতীয় নীতির চেয়ে প্রথম নীতিকে অর্থাৎ মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার নীতির অগ্রাধিকারের কথা বলেন।

উদারনৈতিক মতের একটি দিক হলো সুযোগের সমতা বণ্টন করা। রলস্‌ও এ প্রসঙ্গে বলেন:

> যাদের সামর্থ্য ও দক্ষতা একই রকম তাদের জীবনের সম্ভাব্যতা একই রকম হওয়া উচিত। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন করা যায় ধরে নিলে যাদের মেধা ও সামর্থ্যের অনুরূপতা আছে, তাদের সাফল্যের সম্ভাব্যতাও একই রকম থাকা উচিত; সমাজ-ব্যবস্থার কোন স্থান থেকে এসেছে তা অবিবেচ্য, অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে শ্রেণিতে তাদের জন্ম হয়েছে তা গণ্য না করা,.... একই সামর্থ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাঙ্খার অধিকারী যারা তাদের সম্ভাবনা সামাজিক শ্রেণি দিয়ে বিচার করা ঠিক নয়।[৭৬]

রলস্‌ সুযোগের পক্ষপাতহীন সমতা বলতে বুঝিয়েছেন সুযোগের দিকটাকে, যা ব্যক্তির স্থান-কাল-বংশ-জাতি-লিঙ্গ-ধর্ম ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র সেটা বিকাশের সুযোগ করে দেয়। তাহলে সুযোগহীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মেধা বিকাশের সুযোগ থাকলে ব্যক্তি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। তিনি মনে করেন, কেউ যদি তার প্রান্তিক অবস্থানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তবে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে অবদান রাখতে পারবে। তাঁর মতবাদকে সামাজিক ন্যায় বলা যায়। কারণ তিনি মনে করেন, সমাজে যেসব বৈষম্য রয়েছে রাষ্ট্র কতকগুলো নিয়ম-নীতির মাধ্যমে তা বিলোপ সাধন করতে পারে। তিনি যুক্তি

দিয়ে বৈষম্য বিলোপ করে সমতা প্রতিষ্ঠার যে ব্যাখ্যা দেন তা উদারনৈতিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি কান্ট ও মিলের মতোই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঊর্ধ্বে রেখে বৈষম্য রোধের কথা বলেন। তিনি বহুত্ববাদকে অস্বীকার না করে বরং গ্রহণযোগ্য করেছেন। আর্থ-সামাজিক সমতা, ব্যক্তি-অধিকার ও বহুত্ববাদ—এগুলোকে তিনি একটি নীতির আওতায় নিয়ে এসেছেন। জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ-ধর্ম ও শ্রেণিভেদে সবাই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হবে। তিনি বহুত্ববাদী সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখেই সমতা আনার কথা বলেন। এমন সমতাকেই আমরা ন্যায় বলে থাকি। এমন সমতা থেকে সমাজ বিচ্যুত হলে সেখানে অন্যায় স্থান পায়, আর তা থেকে মুক্ত থাকার অর্থ দাঁড়ায় 'পক্ষপাতহীন ন্যায়' (Justice as fairness) প্রতিষ্ঠা করা।[৭৭] দ্বিতীয় নীতির দ্বিতীয় অংশে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে, আমাদের এমন পলিসি গ্রহণ করা উচিত যাতে কম সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অধিক সুবিধা পেতে পারে। তাহলে অধিক বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। এভাবে একটি সমাজের বৈষম্যনীতি মোচন করে কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে নৈতিকতার দিক থেকে যে বিষয়টি গুরুত্বপর্ণ তা হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিবোধের অভাব থাকে। ফলে আত্ম-মর্যাদাবোধ অবদমিত থেকে যায় এবং সহমর্মিতার অভাব থাকে। আত্ম-মর্যাদাবোধের অভাব থাকলে তার সূদুরপ্রসারী পরিণতি হলো জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। নিজেকে উচ্চে স্থান দিতে না পারলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরায়ন ব্যক্তিকে দুর্বল করে দেয়, সামগ্রিকভাবে সমাজের নানা সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি করে, যেমন পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক ঘৃণা, সংশয় ও অনাস্থার ভাব গড়ে ওঠে।

রলস্ যে উদারনৈতিক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন সে-মনোভাবের মাঝে নৈতিকতার ভাবটা বেশি স্পষ্ট। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতাকে তিনি পক্ষপাতহীন ন্যায়-নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। রলস্ এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করতে পারলে সমাজে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব এবং তা সহযোগিতার মনোভাবও বৃদ্ধি করতে পারবে। আত্মমর্যাদাবোধ ও সহযোগিতার মনোভাব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তন ঘটায় তা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণমূলক। তাঁর ব্যাখ্যায় গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই বলা যায়, রলসের ন্যায়-সম্পর্কিত নীতি দুটো এমন, যার মাঝে মূল্যবান সারবস্তু আছে—তা হলো সুযোগের পক্ষপাতহীন সমতা ও বৈষম্য-নীতি, যা যে-কোনো রাষ্ট্রে (সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক হোক) প্রয়োগ করে মানুষের জন্য কল্যাণ করা যায়। রলস্ের উদারনৈতিক মত কেবলমাত্র মৌলিক ধারণাগুলো অর্থাৎ স্বাধীনতা ও সমতাকে গুরুত্ব দিয়েছে তা নয়, সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীকে অধিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের মূল স্রোতের সাথে একত্রিত করার চেতনাও সৃষ্টি করেছে। ন্যায় সম্পর্কিত রলস্ের মতকে আমরা গণতান্ত্রিক বলতে পারি। এ মত আমাদের সামনে রাজনৈতিক সমতাকে প্রতিষ্ঠা করার

পরিকল্পনা তুলে ধরেছে, যার মধ্যে রয়েছে সুযোগের পক্ষপাতহীন সমতা, যা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারকে সুরক্ষা দিতে পারে। তাঁর পক্ষপাতহীন ন্যায় কেবল দার্শনিক মতবাদ নয়, এর ব্যবহারিক দিকও রয়েছে। বহুত্ববাদী সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমন মতকে বেছে নিলে একটি ন্যায় ও টেকসই গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। বাংলাদেশও রলস্‌ের পক্ষপাতহীন সমতা নীতিটি গ্রহণ করেছে। যেমন, চাকরির ক্ষেত্র সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ নীতি কার্যকরী। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দরিদ্র থেকে ধনী সকল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী রয়েছে এবং তারা পড়াশুনা শেষ করে সকলেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সরকারি চাকরি করার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের দেশে তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা কার্যক্রমের আওতায় রাষ্ট্রীয় নিয়ম পালন করা হচ্ছে, যেখানে পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাব দেখা যায় না। সুতরাং বলা যায় যে, রলস্‌ের মতে রাজনৈতিক ন্যায়ধারণার বৈশিষ্ট্য হলো কতকগুলো আদর্শ, নীতিমালা ও বিচারের মাপকাঠি এবং এই নীতিগুলো এমন মূল্যকে তুলে ধরে যেগুলোকে আমরা রাজনৈতিক মূল্য বলতে পারি। এ ধারণা নৈতিক হলেও রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধীন। রলস্‌ের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটা সমাজ গড়ে তোলা যেখানে সমাজের কতকগুলো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সহযোগিতার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। এই সমন্বিত ব্যবস্থাকে বা সমন্বিত সামাজিক সহযোগিতাকে তিনি সমাজের মৌলিক সংগঠন বলেছেন।

উল্লেখিত দার্শনিকদের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্র সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে অবাধ আলোচনার মধ্য দিয়ে যৌক্তিক সম্মতির অভিব্যক্তি ঘটে। এরকম পরিবেশ বজায় থাকলে বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী মতামত প্রকাশিত হতে পারে, যা গণতন্ত্রকে সফল করতে পারে। আধুনিককালের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সকল স্তরেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলেরই সমান অধিকার থাকে। উদারনৈতিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলে আখ্যায়িত করা হয় ঠিকই, কিন্তু এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ও অধিকারকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। এখানে ধর্মীয়, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক—সকল ধরনের সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহকে আইনগতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। জন স্টুয়ার্ট মিলও গণতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে বলেছেন। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সাংবিধানিক সরকার থাকে। সাংবিধানিক সরকার বলতে অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত সরকারকে বোঝায়। সৃজনশীল অঙ্গীকারাবদ্ধ নেতৃত্বের মাধ্যমেই আমরা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারি। এ ক্ষেত্রে জনগণকে আন্তরিক হতে হবে এবং ধারণ করতে হবে প্রকৃত গণতন্ত্রের বোধ ও সংস্কৃতি। সবক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, তাদের উদ্যোগ আর কর্মধারা পরিচালনায় প্রাধান্য গণতন্ত্রের জন্য জরুরি।

## ৭.১০ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় রাষ্ট্রদার্শনিকগণ একমত পোষণ করেননি। গণতন্ত্রের সাফল্য নিয়ে যেমন আশাবাদ রয়েছে তেমন আবার এর দুর্বল দিকগুলোর আলোচনায় গণতন্ত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বিষয়টিও আমাদের সামনে আসে। যদি দেশের শাসনব্যবস্থা অজ্ঞ ব্যক্তির হাতে চলে যায় তাহলে দেশ অশান্তি ও নৈরাজ্যে নিমজ্জিত হয়। প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা অবহেলিত হলে সেখানে গণতন্ত্র কার্যকর হয় না। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে গণতন্ত্রে নীতিগত বা লক্ষ্যগত সঙ্গতি বলতে কিছু থাকে না। তবে যারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন তারা বিশ্বাস করেন গণতন্ত্রের এমন কতকগুলো সহজাত ও মহৎ গুণ রয়েছে যা অন্যান্য শাসনব্যবস্থায় অনুপস্থিত। সেদিক থেকে গণতন্ত্রকে উত্তম শাসনব্যবস্থা বলা যায়। সরকার ও শাসিতের মধ্যে স্বার্থগত সমন্বয় বা ঐক্য কেবল গণতন্ত্রে সম্ভব।[৭৮] বর্তমানে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে। রাজতন্ত্রে বা ধনিকতন্ত্রে ক্ষমতা অপব্যবহারের যে সুযোগ রয়েছে গণতন্ত্রে তা নেই। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা যদি সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করে তবে গণতন্ত্র হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। দায়িত্বে অবহেলা করলে বা দুর্নীতির আশ্রয় নিলে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। হাবার্ট স্পেন্সার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করে বলেন, "একমাত্র খাঁটি গণতান্ত্রিক সরকারই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য, কেননা অপরাধ প্রবণতা এর স্বভাব নয়।"[৭৯]

সকলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় বলে জনগণ গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ফলে তারা এর থেকে নতুন ও উন্নততর রাষ্ট্রের কথা ভাবে না। তারা রাষ্ট্রকে নিজের সম্পদ মনে করে রাজনৈতিক কার্যকলাপে স্ব-ইচ্ছায় অংশগ্রহণ করে। গণতন্ত্রে ব্যক্তিকে 'অনুগত প্রজা' হিসেবে দেখা হয় না। সেখানে তাকে মর্যাদা দেয়া হয় একজন 'রাজনৈতিক মানব' হিসেবে। সম্ভবত এসব কারণেই লোকে গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারলে গৌরববোধ করে।[৮০] নাগরিকগণ এখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপে স্ব-ইচ্ছায় অংশগ্রহণ করে বলে তাদের রাষ্ট্রের প্রতি একটি নৈতিক দায়িত্ববোধ সদা জাগ্রত থাকে। এখানে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এখানে মানব মনের বিক্ষোভ চাপা থাকে না, প্রকাশের সুযোগ থাকে। যদি কোনো সরকারি নীতি বা কার্যকলাপ নাগরিকদের নিকট অপ্রীতিকর মনে হয় তখন জনগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সুযোগ পায়। গণতন্ত্র একবার প্রতিষ্ঠা করা গেলে তা প্রায়ই স্থায়ী ও স্থিতিশীল হয়। কোনো প্রকার উগ্রতা বা চরমনীতি এ শাসনব্যবস্থায় স্থান দেওয়া হয় না। এ শাসনব্যবস্থায় বিজয়ী দলকে অন্য বিরোধী দলগুলো অস্বীকার করতে পারে না। কেননা এ রায় থাকে অধিকাংশ নাগরিকের। কাজেই বলা যায়, গণতন্ত্রই একমাত্র শাসনব্যবস্থা যার মূলে রয়েছে

নাগরিকদের পূর্ণ সমর্থন। এ শাসনব্যবস্থায় রয়েছে মানুষের কল্যাণ। এ প্রসঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন: "গণতন্ত্রই আমার ভরসা, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই হবে শেষ কথা। কোনো ব্যক্তির খেয়ালের ওপর নয়, বরং জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারি নীতির ভিত্তি।"[৮১] পৃথিবীর অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশ গণতন্ত্রকে প্রধান আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে। এ আদর্শকে টিকিয়ে রাখতে এদেশের মানুষকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

## তথ্যনির্দেশ


১. ধীরাজ কুমার নাথ, *গণতন্ত্র: সংকট ও উত্তরণ*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১।

২. এথেনীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও আইনপ্রণেতা সলোন, ক্লিসথেনিস থেকে শুরু করে এরিস্টটল, জন লক, উইলিয়াম পেন, ব্যারণ ডি, মন্টেস্কু, জ্যা জ্যাক রুশো, টমাস পেইন, টমাস জেফারসন, জে. এস. মিল, সুশান বি. এ্যান্থনি, এ্যামেলিন প্যাংকহার্স্ট, মিলিসেন্ট ফসেট, মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ জনগণের ইচ্ছার প্রাধান্য দেন এবং মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেন।

৩. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪৭।

৪. ডেভিড বিথাম ও কেভিন রয়েল, আলমগীর সিকদার লোটন (সম্পা.), *গণতন্ত্র ৮০টি প্রশ্ন ও উত্তর*, আকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৯।

৫. *প্রাগুক্ত*।

৬. প্রদীপকুমার রায়, 'দর্শন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বাংলাদেশ', শহিদুল ইসলাম (সম্পাদিত), *মূল্যবোধ ও মানবতা*, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪২।

৭. দেখুন, Montesquieu , *The Spirit of the Laws*, eds. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller and Harold Samuel Stone, Cambridge Texts in the History of Political Thought, Cambridge, 1989.

৮. দেখুন, 'Governance and the Law', World Development Report 2017, A World Bank Group Flagship Report, 1818 H. Street, NW, Washington DC, 20433.

৯. দেখুন, Griffin, Tom, *Plato : The Republic*, Cambridge University Press, 2000.

১০. হাইব্রিড গণতন্ত্রকে মিশ্র বা শংকর ধারার গণতন্ত্র বলা হয়। এ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে অনিয়ম ও ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। হাইব্রিড গণতন্ত্রে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বাংলাদেশসহ থাইল্যান্ড, মায়ানমার, তুরস্ক, মরক্কোর মতো কিছু দেশ রয়েছে যেখানে হাইব্রিড গণতন্ত্র বিদ্যমান, যারা এখনও গণতন্ত্রের পথচলাকে নির্বিঘ্ন করতে পারেনি।

১১. *প্রথম আলো*, ৩১ আগস্ট, ২০১৬।

১২. *প্রথম আলো*, ৫ আগস্ট, ২০২০।

১৩. দেখুন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'গণতন্ত্র ও নয়াগণতন্ত্র' রতনতনু ঘোষ (সম্পা), *গণতন্ত্র: স্বরূপ সংকট সম্ভাবনা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৭৯-১৯৩।

১৪. দেখুন, Busfield Steve (5 July 2010). "BBC 6 Music: Is its Reprieve a Triumph for Social Media?", *The Guardian*, London, Archived from the original on 8 july 2010, Retrived 27 July 2010) . বিবিসি রেডিওর মিউজিক চ্যানেল রেডিও সিক্স ছিল মূলত ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য বিখ্যাত। এই চ্যানেলের সম্প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল India guiter music এর পরিবেশনা। এছাড়াও প্রতিমাসে যেসব নতুন ধারার সঙ্গীতের সৃষ্টি হতো সেগুলো সর্বপ্রথম প্রচারিত হতো এই চ্যানেলে। বিগত ৪-৫ দশকের যুগান্তকারী সব সঙ্গীতের পরিবেশনা হতো নিয়মিত। বিবিসি আর্কাইভে

স্থান পাওয়া সঙ্গীতসমূহের প্রচার ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, প্রতিবছর যুক্তরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি জায়গায় অনুষ্ঠিত সঙ্গীত উৎসবের সরাসরি সমস্প্রচার করা হতো এই চ্যানেলে। ভিন্নধর্মী এবং শ্রোতাদের কাছে খুব পছন্দের চ্যানেল হওয়া সত্ত্বেও ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাণিজ্যিক দিকের ওপর জোর প্রদান করতে গিয়ে বিবিসি ট্রাস্ট মিউজিক চ্যানেল রেডিও সিক্স বন্ধের প্রস্তাব করে। প্রস্তাবিত এ বন্ধের প্রতিবাদে জার্ভিস কুকার নামক প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী 'Save BBC6Music' শিরোনামে তৎক্ষণাৎ ক্যাম্পেইন শুরু করেন। মুহূর্তেই টুইটার ও ফেইসবুকে তা ভাইরাল হয়। নানামুখী প্রতিবাদের মুখে অবশেষে বিবিসি ট্রাস্ট ২০১০ সালের জুলাই মাসে এসে বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করে।

১৫. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ক্ষমতায়িত সুশীল সমাজকে যে-কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে। সুশীল সমাজ বহুত্ববাদকে প্রতিনিধিত্ব ও লালন করে। তারা আরও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নে এবং অংশগ্রহণমূলক ও স্থায়ী উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। বিরোধ মীমাংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনায় প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের, তথাপি রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোর (সিইএসও) যৌথ প্রচেষ্টা দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান অসাম্য, শোষণ-বঞ্চনা এবং অস্থিতিশীল উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করে। নাগরিকদের স্বার্থ তুলে ধরার মাধ্যমে সুশীল সমাজের সংস্থাগুলো অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে পূরণ করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর সংস্থা নিশ্চিত করতে, আরও জবাবদিহিমূলক ও আইনসঙ্গত রাষ্ট্র গঠনে এবং সামাজিক সংযোগ ও গণতন্ত্রের উন্নয়নে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন মনে করে, সিএসও-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সব অ-রাষ্ট্রীয়, বেসরকারি, অলাভজনক ও অরাজনৈতিক কাঠামো যেগুলোর মাধ্যমে জনগণ তাদের সাধারণ লক্ষ্য ও আদর্শের বাস্তবায়ন করতে চায়, হোক তা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোকে তাদের বৈচিত্র্য ও সুনির্দিষ্টতা অনুসারে মূল্যায়ন করে। সামাজিক অগ্রগতি এবং শান্তি, স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও মানবিক মর্যাদার মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের যৌথ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ইইউ সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করে। (বিস্তারিত দেখুন, সুশীল সমাজের সাথে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক ইইউ'র কান্ট্রি রোডম্যাপ।)

১৬. দেখুন, সুশীল সমাজের সাথে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক ইইউ'র কান্ট্রি রোডম্যাপ।

১৭. রতনতনু ঘোষ (সম্পা), 'বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের গতিধারা', *গণতন্ত্র: স্বরূপ সংকট সম্ভাবনা*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২০০-২০১।

১৮. *প্রথম আলো*, ৭ ডিসেম্বর, ২০১৬।

১৯. এমাজউদ্দীন আহমদ, *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, মৌলি প্রকাশনী, ২০০২, ঢাকা, পৃ. ৩৫।

২০. ব্রিটেনকেন্দ্রিক বৈশ্বিক ব্যবসায়িক বোধশক্তিসম্পন্ন বিশ্বনেতৃবৃন্দের যে অর্থনৈতিক গোষ্ঠী রয়েছে তার একটি বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণা ইউনিট হলো ইআইইউ। বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের মাসিক কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের নির্বিঘ্নতা পরিস্থিতি, কলকারখানার মান, কর্মপরিবেশ ও লেবার ইউনিয়ন পরিস্থিতি, বাজার পরিস্থিতি, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ধরন প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে ইআইইউ প্রতিবছর দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনায় সূচক নির্ধারণ করে থাকে।

২১. দেখুন, *BBC Online Reports*, Published in the 29 November, 2016.

২২. ডগলাসন হেভেনের এক প্রতিবেদনে হোয়ে গণতন্ত্র নিয়ে এ প্রশ্ন তুলেছেন ও নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। 'গণতন্ত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ' শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়েছে বিবিসি অনলাইনে।

২৩. *প্রাগুক্ত*।

২৪. দেখুন, *BBC Online Reports*, Published in the 29 November, 2016.

২৫. দেখুন, *ইত্তেফাক* রিপোর্ট, ২০১৬।

২৬. দেখুন, *BBC Online Reports*, Published in the 29 November, 2016.

২৭. *প্রাগুক্ত*।

২৮. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *প্লেটোর রিপাবলিক*, অষ্টম পুস্তক, অধ্যায় ২২, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯ ঢাকা, পৃ. ৩৯৯।

২৯. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *এ্যারিস্টটল: পলিটিক্স*, ষষ্ঠ পুস্তক, চতুর্থ অধ্যায়, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ২৫৪।

৩০. সৈয়দ মকসুদ আলী, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, মাওলা বাদ্রার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৪৬।

৩১. চিরায়ত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে মানব প্রকৃতি থেকে উদ্ভব বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা মনে করেন মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই প্রতিযোগিতামূলক এবং আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক অর্থনীতি মানব-প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। চিরায়ত রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদেরা মানব প্রকৃতি ব্যাখ্যার মাধ্যমে পুঁজিবাদকে যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

৩২. হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২০২-২০৩।

৩৩. সৈয়দ মকসুদ আলী, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, মাওলা বাদ্রার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৪৬।

৩৪. দেখুন, Niccolo *Machiavelli, The Prince* (Trans.) Ninian Hill Thomas, Minerva Publishing, New York, 1532.

৩৫. The Constitution of USA, Art, V1.

৩৬. হারুন রশীদ, 'বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট', *বিশ্বদর্শন দিবস স্মরণিকা ২০১৪*, দর্শন বিভাগ ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৪।

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯।

৩৮. জোয়ান হোয়ে, *BBC Online Reports*, Published in the 29 November, 2016.

৩৯. কিছু নির্দিষ্ট মুসলিম দেশের অভিবাসীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে ট্রাম্পের পেছনে জনসমর্থন থাকতে পারে। কিন্তু শুধু জনসমর্থনের জোরেই ট্রাম্প হয়তো যা খুশি তাই করতে পারবেন না সেখানকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নানা ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থার কারণে।

৪০. দেখুন, Jhon Stuart Mill, *On Liberty*, John W. Parker & Son, London, 1859, p. 3-19.

৪১. দেখুন, Charls, Baron De Montesquieu , *The Spirit of Laws*, Pantianos Classic, 1752.

৪২. ডেভিড বিথাম ও কেভিন রয়েল, আলমগীর সিকদার লোটন (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র: ৮০টি প্রশ্ন ও উত্তর*, আকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭৫।

৪৩. টেকসটই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত এ সংক্রান্ত একচ্ছত্র লক্ষমাত্রা। জাতিসংঘ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রতিস্থাপন করেছে যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এসডিজি এর মেয়াদ ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। এতে মোট ১৬টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯৩টি দেশ এসব লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে একমত হয়েছেন। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে UN Sustainable Development Summit এ বিভিন্ন দেশের সরকার-প্রধানদের আলোচনার মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্মেলনের বিষয়বস্তু *Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development.*

৪৪. ১ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি. তারিখ থেকে ৫ দিনব্যাপী আইপিইউ-এর ১৩১টি দেশের এক হাজারেরও অতিথি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় আইপিইউ এর ১৩৬তম সম্মেলন হয়।

৪৫. দেখুন, Fromm Erich, *Escape from Freedom* , Rinehart & Co., New York, 1941.

৪৬. হারুন রশীদ, 'বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট', *বিশ্বদর্শন দিবস স্মরণিকা ২০১৪*, দর্শন বিভাগ ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩২।

৪৭. আকবর আলী খান, *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজলে রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৪৬।

৪৮. দেখুন, R. Harrison, *Democracy*, London, Routledge, 1995, p.197.

৪৯. দেখুন, L. T. Sargent, *Contemporary Political Ideology*, Homewood, Illinois, The Doresy Press, 1981, p.39.

৫০. *The Analects of Confucius*, tr. by Arthur Welegs, London, 1938, A. J. Mia , "Confucius: Social-ethical Thought", Philosophy and Progress, Dev Center for Philosophical Studies, Dhaka University, vol. IX (1989), pp.47-54.

৫১. F. N. Magill, (ed), Masterpieces of World Philosophy, London, Allen and Unwin, 1963, pp. 131-136.

৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৯৫।

৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩-১৬৮।

৫৪. দেখুন, Majid Fakhry, History of Islamic Philosophy, New York, 1970.

৫৫. *প্রাগুক্ত*।

৫৬. হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৮।

৫৭. F. Mayer, *Modern Philosophy*, New Delhi, 1976, pp. 582-583.

৫৮. আবদুল জলিল মিয়া, 'সমাজ, রাজনীতি ও নৈতিকতা:প্রেক্ষিত বাংলাদেশ', *দর্শন ও প্রগতি*, ১৩শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৫০।

৫৯. হারুন রশীদ, 'বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট', *বিশ্বদর্শন দিবস স্মরণিকা ২০১৪*, দর্শন বিভাগ ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৪।

৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

৬১. *প্রাগুক্ত*. পৃ. ৩৯।

৬২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *রাষ্ট্রচিন্তায় বাংলাদেশ*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮,পৃষ্ঠা. ২৭৮-২৭৯।

৬৩. J. E. Dougherty and R. L. Pfaltzgraff, jr. *Contending Theories of International Relations*, Lippincott, Philadelphia, 1971, P. 311-313.

৬৪. P. Diesing, *Reason in Society: Five Types of Decisions and Their Social Conditions*, University of Illionois Press, Urbana, 1962, P. 198.

৬৫. জে. এস, মিল, *প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার*, দরবেশ আলী খান (অনূদিত), নালন্দা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৪।

৬৬. ল্যাটিন ভাষায় 'লিবার' কথাটির অর্থ হলো স্বাধীন (ফ্রি)। এর থেকে ইংরেজি 'লিবারাল' কথাটির উৎপত্তি। 'দাস' (বন্ডেড) কথাটির বিপরীতার্থক কথা হিসেবেই 'স্বাধীন' (লিবার) অর্থাৎ কর্তৃত্বমূলক শাসন থেকে মুক্ত এই অর্থে 'লিবারাল' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি ভাষায় 'লিবারালিজম্' (উদারনৈতিকতা) কথাটি এসেছে স্পেনীয় ভাষার 'লিবারালেস' কথাটি থেকে।

৬৭. অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, 'উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব', দীপক কুমার দাস (সম্পা.), *রাজনীতির তত্ত্বকথা*, প্রকাশন একুশে, কলকাতা, পৃ. ৮১।

৬৮. দেখুন, F. Funkuma ,*The End of History and the Last Man*, Penguin, 1992.

৬৯. J. Locke. *The Second Treatise of Goverment*, edited with an introduction by T.P. Peardon, New York. Bobbs-Merrill, 1952, pp. 50-55.

৭০. ম'তেস্ক্য শ., *নির্বাচিত রচনাবলী*, মস্কো, ১৯৫৫, পৃ. ২৮৯।

৭১. Kant, *Fundamental Principle of the Metaphysic of Morals*, trans., T.K. Abbott, London, 1949, p. 82.

৭২. *Ibid* , p. 144.

৭৩. জে. এস. মিল, *প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার*, দরবেশ আলী খান (অনূদিত), নালন্দা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯৭।

৭৪. দেখুন, I. Berlin, `Two Concept of Liberty', *Four Essays On Liber*ty, Oxford, Oxford University press. 1979, pp. 118-172.

৭৫. দেখুন, J. Rawls, *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press, 2005, pp. 5-6.

৭৬. দেখুন, J., Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, p.73.

৭৭. *Ibid*, p. 65.

৭৮. সৈয়দ মকসুদ আলী, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, মাওলা বাদ্রার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৪৬।

৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৬।

৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৬।

৮১. *ইত্তেফাক*, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০।

অষ্টম অধ্যায়

# উপসংহার

গণতন্ত্র কেবল একটি রাজনৈতিক দর্শন এবং পদ্ধতি মাত্র নয়, এটি আর্থ-সামাজিক জীবন ও মূল্যবোধের সংস্কৃতিও। মানুষ যদি তার নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা রাজনীতিকে চালিত করে তাহলে রাজনীতির গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব। রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু প্রশাসন চালানোই নয়, জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে গড়ে তোলাও রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। যে-রাষ্ট্র হাতপাতা আর চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়, সে-রাষ্ট্র কিছুতেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে না।[১] আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নীতিদার্শনিক দিক-নির্দেশনা।

সব যুগেই সমাজে দুই ধরনের পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা দেখা গেছে। ফলে আদর্শগত নীতিশৈলীর প্রকৃতি দ্বিবিধ হয়েছে। এদের একটি চায় সংরক্ষণ, আর অন্যটি চায় প্রগতি। এ দুটি প্রবণতারই প্রতিনিধিত্ব করে দার্শনিকেরা। যুক্তিবিজ্ঞান নিজস্ব যুক্তিশৈলীর মাধ্যমে নিজেকে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে পারে। কিন্তু চলমান সমাজ পরস্পর নিয়ামক নীতি ও আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতের সমষ্টি। গণতান্ত্রিক সরকার মানুষকে সভ্যতার আলোকপ্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে। কেননা সভ্যতা বিকাশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এমন একটি গুণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অনন্য। স্বাধীনতা ও উন্নয়ন গণতন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) দ্বিতীয় বার্ষিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো, উন্নতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে ভালো শাসনব্যবস্থা। স্বৈরতন্ত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় স্বল্পমেয়াদি এবং অনিশ্চিত। অন্যদিকে, গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হয়। এ ব্যবস্থায় মানব-সম্পদের উন্নতি বেশি হয়।

উন্নয়ন কেবল আর্থিক দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উন্নয়ন বলতে মত-প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারকেও বোঝায়। উন্নয়নের একটি অংশ হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্র প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মানবসম্পদের উন্নতি করে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা দেয়।[২] গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে আমরা আমাদের সামাজিক সম্পর্ক ও দলীয় বৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধন করে ধারবাহিকভাবে স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার আদর্শ বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে পারি। গণতন্ত্র যদি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সফলকাম হয় তাহলে আমরা বলতে পারি, এটি এমন একটি প্রশাসনব্যবস্থা যা জনগণের সপক্ষে জনগণেরই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন যখন পৃথিবীকে 'গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ' করার কথা বলেন, তখন তিনি এমন একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির কথাই ভাবছিলেন যা গণতান্ত্রিক সভ্যতার উৎপন্ন ফলগুলোর পরিপক্কতা লাভের অনুকূল হবে।[৩] গণতন্ত্র অর্থ কেবল ভোট নয়, কিংবা নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নয়, এর মূল কথা অধিকার ও সুযোগের সাম্য। এটা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সকল মানুষ সমান অধিকার ও সুযোগের অধিকারী, যেখানে একজনের বিকাশ ব্যাহত করবে না অন্যকে, বৈচিত্র্য অবশ্যই থাকবে কিন্তু বৈষম্য থাকবে না। বাগানের সব ফুল যেমন এক নয়, কিন্তু সব ফুলই ফুল, কোনোটাই আগাছা নয়, তেমনি সমাজেও সব ফুল এক ফুল হবে না। তবে সব ফুলই ফুল থাকবে এবং সমাজটা বাগানই হবে, কোনো রকমের জঙ্গল হবে না। পুঁজিবাদ একসময় প্রগতিশীল ছিল। সামন্তবাদের তুলনায় অবশ্যই সে অনেক বেশি আধুনিক ও গণতন্ত্রী। কিন্তু পুঁজিবাদ এখন আর গণতন্ত্রের মিত্র নয়। অপরাধ, অধঃপতন, বর্ণবিদ্বেষ, মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা পুঁজিবাদের অবদান, গণতন্ত্রের নয়।[৪] গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যাস্ত থাকে জনগণের ওপর এবং এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরাসরি জনগণ বা যারা জনগণের প্রতিনিধি। একটি অবাধ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে থাকে।

সকল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নাগরিকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন গণতান্ত্রিক নাও হতে পারে। যেমন কোনো দেশের ৫১ শতাংশ জনগণ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের সুযোগ নিয়ে ৪৯ শতাংশ মানুষের ওপর অত্যাচার করে তাহলে তাকে গণতান্ত্রিক বলা যাবে না। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে অবশ্যই সংখ্যালঘিষ্ঠেরও সুযোগ প্রদান করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সারবস্তু হচ্ছে নাগরিকদের মানবিক মর্যাদার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ। গণতন্ত্র এ কথায় ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা জনগণের সেবায় নিয়োজিত হবে। এই নীতি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যেই প্রশাসনযন্ত্র ও কর্মচারীদের রদবদলের ব্যবস্থা করা হয়। সকল নাগরিকই নির্দিষ্ট সময়ের পর সরকার পরিচালনার জন্য তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পান এবং এ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সাধারণভাবে যে নীতি অনুসরণ করেন, তা তারা অনুমোদন বা প্রত্যাখান করতে পারেন। এখানে শাসনকার্য পরিচালনা ও শাসননীতি নির্ধারণজনিত কর্মোদ্যোগে সকলেরই অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে, যা সকলের সমান নাগরিক মর্যাদা ও মূল্য নির্ধারণ করে। একটি আদর্শ গণতন্ত্রে মানুষ কী চায়, তার চূড়ান্ত লক্ষ্য কী, কী মানদণ্ড নিয়ে সে তার সরকারকে বিচার করতে চায় এবং নিজেকে বিচার করতে প্রস্তুত সে-সকল বিষয় আলোচিত হয়। বাস্তবে গণতান্ত্রিক আর্দশে সকলের অগ্রগতি সমান হয় না। তবে এ আদর্শের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তাদের আচরণের নিয়ামকরূপে কাজ করে। এখানে নাগরিকের সচেতনতা গুরুত্ব পায়। নাগরিকেরা নিপীড়ন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সচেতন থাকে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন নিয়মপ্রণালিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ

ও প্রভাব বিস্তারের যতখানি সুযোগ থাকে তা অন্য কোনো ব্যবস্থায় দেখা যায় না। জনগণ এ সুযোগ কীভাবে ব্যবহার করবে তা নির্ভর করে তাদের চরিত্রের ওপর। তারা নিজেদের যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন সেটাই হচ্ছে তাদের মর্যাদা।

গণতন্ত্রে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো নিয়ে বিতর্ক চলে অহরহ। যারা সচেতন নাগরিক তারা শিখতে পারেন অনেক কিছু। কাজের মধ্য দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা আরও মজবুত হয়। নাগরিকগণ নিজেদের মধ্যে যে অসংখ্য সংঘ-সমিতি গড়ে তোলেন সেগুলো সমাজের সম্প্রীতি ও সংহতি সাধনে এবং নাগরিকদের দায়িত্বপালনের শিক্ষাদানে সহায়তা করে। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় কর্মে নিয়োজিত থাকে সে-ব্যবস্থা তত শক্তিশালী থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন কয়েকটি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকে যার সাহায্যে নাগরিকেরা প্রশাসকদের ভ্রান্তি ও দুর্নীতি উদ্ঘাটনে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ কিছু লোককে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো যায়, কিন্তু সব লোককে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো সম্ভব হয় না। এ নিশ্চয়তাই গণতন্ত্রকে তার নিজের বিচার বিভ্রান্ত বা অপাত্রে আস্থা স্থাপনের কুফল থেকে রক্ষা করে। স্বাধীনতার সাথে বিচারবুদ্ধির ভুলত্রুটি আসবে, তবে ব্যক্তিগত ও নাগরিক পর্যায়েই গণতন্ত্রের শিক্ষা হচ্ছে একবার ভুল করলে দ্বিতীয়বার সাবধান হওয়া এবং আগের তুলনায় পরেরবার উন্নততর মানের পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করা। মানবতার প্রতি গণতন্ত্রের সব চেয়ে বড় অবদান হলো সংশোধনের সুযোগ করে দেয়া।

গণতন্ত্র তার অস্তিত্বের আইনের নির্দেশেই জনকল্যাণে উৎসর্গিত। গণতন্ত্রের আদর্শ ও লক্ষ্যগুলো বলিষ্ঠ ও গতিশীল এবং অন্তর্বস্তু নিরন্তর প্রগতিমুখী ও পুনর্বিন্যাসের পক্ষপাতী। তাই কোনো সমাজ যখন শুধু জ্ঞান ও কুশলতায় নয়, নৈতিক শিক্ষার পর্যায়ের দিক থেকেও প্রগতি লাভ করে তখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতি সে-সমাজের সরকারকে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার মাধ্যমে নবতর উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিকে নীতি ও কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম করে। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তৎপর থাকবে তার উন্নয়নের মান নির্ভর করবে ঐ রাষ্ট্রের শিক্ষার উন্নয়নের ওপর। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রর সকল সুফল বণ্টিত হয় সকল জনগণের মধ্যে। কারণ ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ।

বাংলাদেশের উৎপত্তির যে ইতিহাস তাতে দেখা যায় বন্ধুর পথযাত্রায় জনগণের গণতান্ত্রিক রায় ঘোষণা বারবারই গতিশীল চালিকাশক্তির কাজ করেছে। যদিও এখানে গণতন্ত্র বিকাশের অনুকূল পরিবেশ যথাযথভাবে বিরাজ করেনি। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক গতিধারা গণতন্ত্রের এই নির্ধারকের ভূমিকা, আমরা বারবারই যার প্রকাশ দেখি, তা বিস্ময়করও বটে। গণতান্ত্রিক বিকাশের সমর্থক সমাজের যা

বৈশিষ্ট্য—ব্যাপক শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি, উৎপাদন পদ্ধতির গতিশীল অর্থনৈতিক বিন্যাস এবং সমাজে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বাধীন মননচর্চা ও বাক-স্বাধীনতায় রীতিবদ্ধ রূপ—এর প্রতিটি ক্ষেত্রে অজস্র দুর্বলতা চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষপাতিত্ব ও আনুগত্যের এক উচ্চতর মনোভাব দেখা যায়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় দৈন্যদশা থাকলেও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়। কেননা জার্মানি ও জাপানের গণতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা ধারাবাহিক অর্জনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে প্রগতি নিশ্চিত করেছে।[৫]

গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কিছু স্ববিরোধীতা পশ্চিমা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এসব স্ববিরোধীতা কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক চেতনার প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করতে পারেনি; বরং ইতিহাসের বিকাশের ধারায় তা ক্রমেই কমে এসেছে। কারণ গণতান্ত্রিক আদর্শের একটি সর্বজনীন আদর্শ রয়েছে, যা হলো মুক্তির আদর্শ। এ আদর্শ মানবকে মহামান্বিত করে। ফলে গণতন্ত্রের বাস্তব সীমাবদ্ধতা যাই থাক না কেন, এর একটি সর্বজনীন আবেদন লক্ষ্যণীয় এবং উপনিবেশ সমাজে গণতন্ত্রের প্রবেশ ও ভিত্তি এখানেই। গণতন্ত্র দেশ ও সমাজকে কোথাও পৌঁছে দেয় না, কিন্তু দেশ ও সমাজের বিকশিত হওয়ার পথে গণতান্ত্রিক অবলম্বন ব্যতীত কোনো বিকল্প থাকে না। চরিত্রগত কারণেই গণতান্ত্রিক পথচলা সবসময়ই সমস্যাসঙ্কুল। এ শাসনব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বিরোধের সমস্যা সবসময়েই বিদ্যমান থাকে। গণতন্ত্রের শক্তির দিক হলো সংঘাতকে সামাজিক কার্যকারিতার সাথে সমন্বিত করার মধ্যে। গণতন্ত্র কখনোই নাগরিকদের পরিপূর্ণ তুষ্টি যোগাতে পারে না। কিন্তু এ তুষ্টি অর্জনের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়ার স্বাধীনতা গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করে। গণতন্ত্র বাস্তব প্রয়োগের মধ্যেই সার্থক হয়ে ওঠে। এ সার্থকতা কোনো একদল নেতা, গোষ্ঠী, দল বা আদর্শকে জয়যুক্ত করার মধ্য দিয়েই কেবল অর্জিত হতে পারেনা, বরং বহুমুখী তৎপরতায় গণতন্ত্র আপন শক্তিতে বিকশিত হয়। আমাদের গণতান্ত্রিক পরিক্রমায় সেই যাত্রা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও পুরানো রাজনীতি, পুরানো ধ্যান-ধারণা, পুরানো মানুষের এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে খাপ খাওয়াতে না পারাটা সংকটের দিক বটে। তবে আস্থার দিক হলো সবরকম স্ববিরোধীতা থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক বিধিসমূহ যদি ক্রমাগত প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে পথ চলার সচলতা আমরা অর্জন করবো এবং সচলতা থেকেই জন্ম নিবে নতুন রাজনীতি ও নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত মানুষ। এক্ষেত্রে বলা যায় বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের যে সমস্যা, ত্রুটি ও সঠিক চর্চার অভাব রয়েছে তার সঠিক কার্যকারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে ত্রুটিগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এ কঠিন সংগ্রামে জনগণের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, সরকার, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে বড় সমস্যাটি রয়েছে তা হলো জাতীয় ঐক্যের সমস্যা। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সংগ্রামকে প্রকৃত গণতন্ত্রের সংগ্রাম হিসেবে দেখা হয় না। প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র অর্থাৎ মেয়াদ শেষে নির্বাচন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন এ দেশে শেষ কথা নয়। তার সাথে যুক্ত করা প্রয়োজন আরও কিছু বিষয় যেগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতিগত আত্মপরিচয় শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা, সমাজকে আধুনিক করা এবং উদারনীতির বিকাশ নিশ্চিত করা। এছাড়াও রয়েছে অগ্রসর অর্থনীতি ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ার চ্যালেঞ্জ। স্বাধীনতার পর একত্রে এগুলো আমাদের সামনে এসেছে, পৃথক সময়ে বা পৃথকভাবে আসেনি, যেমনটি দেখা যায় ইউরোপে। এ কারণেই প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা হয়ে ওঠেনি। ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে জাতীয় ঐক্য, উদারনীতির বিকাশ ও আধুনিকায়নের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে বলে এগুলোকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রকে কেবল নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে দেখা অসম্ভব। তবে ইউরোপীয় ধাঁচের গণতন্ত্র থেকে আমাদের গণতন্ত্র কিছুটা পৃথক বিধায় আমাদের সমাধানের পথও হবে ভিন্ন। কেননা আমাদের ইতিহাস ভিন্ন, মানুষের সচেতনতার স্তর ভিন্ন, ভিন্ন প্রায় সবকিছু, তা সত্ত্বেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। এটি উত্তম শাসনব্যবস্থা নাও হতে পারে। তবে অতীতে যে-সকল ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা কোনো অংশেই গণতন্ত্রের চেয়ে উত্তম নয়। গণতন্ত্রের ভুল-ত্রুটি কিছু নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে সত্য, কিন্তু এটিও সত্য যে, দিনে দিনে এ ত্রুটি কমানোর প্রচেষ্টাও কলেবরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনধারায় গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা চর্চা করেছেন। তিনি সমাজের শোষিত জনগণের স্বার্থে গণতান্ত্রিক শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এ ঘোষণায়: "আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করি, গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। ... আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র। ... যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়[৬]।" তিনি পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকে গণতন্ত্র মনে করেননি। তিনি এমন গণতন্ত্র প্রত্যাশা করেছেন যেখানে শোষিতের স্বার্থ বিনষ্ট না হয়। তাঁর গণতন্ত্রের ভিত্তি ছিল সমাজতন্ত্র, যেখানে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ সকল অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে। কিন্তু এর পূর্ণ বাস্তবায়নের পূর্বেই ১৫ আগস্ট গভীর রাতে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিবারসহ নিহত হন। ফলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়েছে। তবে উল্লেখ্য বিষয় এই যে ১৯৮০-এর দশক থেকে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে তা মূলত অপশক্তির গণতন্ত্র। শুধু নির্বাচন ও ভোটাভুটি হলেই তা জনগণের রাজনীতি হয় না এবং একে জনগণের গণতন্ত্র বলা যায় না। গণতন্ত্রের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, তা সার্বিক আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্র ভিন্ন পথে এগিয়েছে। এখানে

গণতন্ত্র ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতা উৎখাতের রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে যে-দলই সরকার গঠন করুক না কেন, তাদের আচরণ পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ছিল না। নির্বাচনের পর যে-দলই বিরোধী দলে থাকে তারা জনগণের জায়গা থেকে প্রতিনিধিত্ব না করে ক্রমাগত সংসদ বর্জন করেন, অথচ রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। কাজেই বলা যায়, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঠিক চর্চা আজও শুরু হয়নি। বর্তমানে এ মূল্যবোধকে চর্চার জন্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে এগিয়ে যাওয়াই বাংলাদেশের লক্ষ্য। তবে এ গণতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি হবে মানবকল্যাণ। যে গণতান্ত্রিক দর্শনের লক্ষ্য হবে মানুষের উত্তম বিকাশ ও সেবা। মানবকল্যাণ ও মানবসেবাকে বাস্তবে রূপ দিতে নীতিদর্শনের যে মানদণ্ডটি কাজ করে তা হলো উপযোগবাদ[৭]। দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল এ নীতিটির প্রসার ঘটিয়েছেন। এ নীতিটিকে কীভাবে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে সমকালীন সময়ে কাজ চলছে। যেমন সাম্প্রতিক নীতিদার্শনিক পিটার সিঙ্গার উপযোগবাদের ত্রুটি দূর করার জন্য নব্য-উপযোগবাদের কথা বলেছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযোগবাদ'—এর ওপর ভিত্তি করে তিনি বলার চেষ্টা করেন, মানবকল্যাণ সম্ভব। এ মতবাদ চিরায়ত উপযোগবাদের মতো শুধু সুখ বৃদ্ধি এবং দুঃখ লাঘবের কথা বলে না, বরং ক্ষতিগ্রস্তদের সকল দিক বিবেচনা করে তাদের স্বার্থগুলো বৃদ্ধি করার কথা বলে। এক্ষেত্রে চিরায়ত উপযোগবাদের সাথে যুক্ত করেন অধিকারের মতবাদ, ন্যায়পরতার মতবাদ, জীবনের পবিত্রতার মতবাদ এবং স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি মতবাদ।[৮] তাঁর এ নব্য-উপযোগবাদের মধ্যে রয়েছে মানব কল্যাণের দার্শনিক ভিত্তি। এ দার্শনিক ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। গণতান্ত্রিক মূলবোধ একটি মূর্ত ধারণা। এটি একটি জীবনব্যবস্থাও, যা রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত হয়। কাজেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে দেশের সকল নাগরিক বাধাহীনভাবে চর্চা করতে পারে। জনগণ যাতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিতে পারে সে-উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তাহলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর গণতন্ত্রের সুষ্ঠু, সুন্দর ও সর্বজনীন বিকাশের মধ্যে রয়েছে আগামী দিনের বাংলাদেশের সুন্দর ভবিষ্যৎ।

সুতরাং বলা যায় যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই যে সব সমস্যার সমাধান হবে তা নয়। তবে গণতন্ত্রের যেসব বিকল্প আছে, সেসব ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ত্রুটি বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের ১১ নভেম্বর উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গণতন্ত্রের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছেন, তা স্মরণ করা যেতে পারেঃ

> Many forms of goverments have been tried and will be tried in the world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all wise. It has been said the democracy is the worst form of goverment except for those all other forms of government that have been tried from time to time.[৯]

যদিও গণতন্ত্র পরিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা নয়, কিন্তু গণতন্ত্রের বিকল্প যেসব শাসনব্যবস্থা রয়েছে তা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের চেয়ে দুর্বল ও অকার্যকর। সুতরাং আমরা যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, জনসমাবেশের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও সুশীল সমাজের ইতিবাচক ভূমিকা নিশ্চিত করতে পারি তবেই গণতন্ত্র নির্মাণ সহজ হবে বলে আশা করা যায়।

## তথ্যনির্দেশ


১. আবুল ফজল, *মানবতন্ত্র*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৭২ ।

২. লেসলি লিপসন, *গণতান্ত্রিক সভ্যতা*, আবুল বাশার (অনূ), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮ পৃ. ২৩৩।

৩. *প্রাগুক্ত*।

৪. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পা.), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদাস, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৬৬।

৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭৬।

৬. আবু সাইয়িদ, *বঙ্গবন্ধুর শোষিতের গণতন্ত্র*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৮।

৭. উপযোগবাদ হলো একটি সুখবাদী মতবাদ, মিল মনে করেন সুখের সাথে উপযোগবাদের কোনো বিরোধীতা নেই, তিনি বলার চেষ্টা করেন যে, এপিকিউরাস থেকে শুরু করে জেরেমি বেন্থাম পর্যন্ত উপযোগ প্রত্যয়টি সুখের বিপরীতধর্মী কোনোকিছুকে ব্যক্ত করে না, বরং সুখকে নির্দেশ করে। মিল এটাও উল্লেখ করেন যে, উপযোগ কোনো বেদনা ছাড়াই নির্ভেজাল সুখকে নির্দেশ করে। মিল উপযোগবাদী মতবাদে সুখের গুণগত পার্থক্য স্বীকার করে বেন্থামের উপযোগবাদ থেকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন।

৮. পিটার সিঙ্গার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, প্রদীপ কুমার রায় (অনু.), অবসর প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২-১৩।

৯. Quoted in Reichard M. Lanworth. htt// reichardlandworth.com/worst-from-of-goverment.

# গ্রন্থপঞ্জি


Ahamed, Emajuddin (ed.), *Bangladesh Politics,* Dhaka: CSS, 1980.

_____, The *Military Rule and Myth of Democracy,* Dhaka: The University Press Limited, 1988.

Ahamed, Fakhruddin, *The Caretaker: A First Hand Account of the Interim Government of Bangladesh,* Dhaka: The University Press Limited, 1998.

Ahamed, Moudud, *Bangladesh Era of Sheikh Mujibur Rahman,* Dhaka: UPL, 1983.

_____, *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy,* Dhaka: The University Press Limited, 1991.

_____, *Democracy and the Challenge of Development,* Dhaka: The University Press Limited, 1995.

Almond, G.A. and Coleman, T.S., *The Politics of Developing Areas*, Princeton: Princeton University Press, 1960.

Aptheker, H., *The Nature of Democracy, Freedom and Revolution*, New York: International Publishers, 1969.

Aristotle, *The Politics*, trans., Rackham, H, London: Heinemann, 1959.

Axtmann, Roland, *Liberal Democracy into Twenty-First Century: Globalization, Integration and Nation-State,* Manchester: Manchester University Press, 1996.

Ball, Alan R., *Modern Politics and Government*, London: ELBS/Macmillan Education Limited, 1986.

Barber, B., *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, USA: University of California Press, 1984.

Barker, Earnest, *Principles of Social and Political Theory*, London: Oxford University press, 1951.

_____, *The Politics of Aristotle*, London: Oxford University Press, 1976.

Barry, B., *Political Argument*, London: Routledge and Kegan Paul, 1965.

Benn, S. I., *A Theory of Freedom*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Birch, Anthony, H., *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, London: Routledge, 1995.

Black, D., *Theory of Committee and Elections*, Cambridge: Cambridge University Press, 1958.

Bobbio, Norberto, *The Future of Democracy*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

Bryce, James, *Modern Democracies*, Vol. 1, 2, New York: The Macmillan Company, 1921.

Chernilo, Daniel, *A Social Theory of the Nation State*, London: Routledge, 2007.

Choudhury, Dilara, *Constitutional Development in Bangladesh: Stresses and Strain*s, Dhaka: The University Press Limited, 1995.

Cohen, Carl, (ed.), *Communism, Fascism and Democracy: The Theoretical Foundations.* New York: Random House, 1962.

Cohen, G.A. and Rogers, J., *On Democracy*, Harmondsworth: Penguin, 1983.

Collier, Ruth. B., *Paths Toward Democracy*, New York: Cambridge University Press, 1999.

Copp, David & Others (ed.), *The Idea of Democracy*, New York: Cambridge University Press, 1999.

Dhal, R.A., *A Preface to Democratic Theory*, New York: University of Chicago Press, 1956.

_____, *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press, 1989.

Diamond Larry, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*, New York: Macmillan, 2008.

_____, (ed.), *Political Culture and Democracy in Developing Countries,* London: Lynne Reinner Publishers, 1999.

Dunning, W. A., *History of Political Theories: Ancient and Mediaeval*, USA: Kessinger Publishing, 2006.

Ebenstein, W., *Modern political Thought the Great Issue*, Oxford: IBH Publishing Company, 1974.

Eccleshall, Robert and Others, *Political Ideologies: An Introduction,* London: Routledge, 2003.

Edwards, P., *The Encyclopedia of Philosophy*, New York: Macmillan, 8 vol., 1972.

Finer, S. E. *Comparative Government*, Great Britain: Penguin Press, 1970.

_____, *The History of Government: From the Earliest Times*, Vol. III, Oxford: Oxford University Press, 1997.

Firoj, Jalal, *How Parliament Works: Bangladesh Experience*, Dhaka: New Age Publication, 2003.

Franda, Marcus, *Bangladesh: The First Decade*, New Delhi: South Asian Publishers Pvt. Ltd., 1982.

Friedrich, Carl J., *Constitutional Government and Democracy*, New Delhi: Oxford and IBH Publishing Company, 1968.

Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man*, New York: Free Press, 1992.

Goodin, R.E., Pettit, P. (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, UK: Blackwell Publishing, 2007.

Grugel, Jean, *Democratization: A Critical Introduction*, New York: Palgrave, 2002.

Hadenius, A., *Democracy and Development*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Harun, Shamsul Huda, *Bangladesh Voting Behaviors: A Psephological Study 1973*, Dhaka: Dhaka University, 1986.

Hasanuzzaman, Al Masud, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: The University Press Limited, 1998.

_____, (ed.), *Political Management in Bangladesh*, A H Development Publishing House, Dhaka, 2010.

Hasina, Sheikh, *Miles to Go*, Dhaka: Government of the People's Republic of Bangladesh, 1998.

_____, *Democracy in Distress: Demeaned Humanity*, Dhaka: Agamee Prakashani, 2003.

Haworth, Alan, *Understanding the Political Philosophers: From Ancient to Modern Times*, London: Routledge, 2004.

Held, David, *Model of Democracy,* Cambridge: Polity Press, 2006.

Hirst, Paul and Khilani, Sunil (ed.), *Reinventing Democracy*, Oxford: Blackwell Publishers, 1996.

Holden, Barry (ed.), *Global Democracy: Key Debates*, London: Routledge, 2000.

Huntington, S. P., *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press, 1968.

_____, *Democracy's Third Wave*, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991.

Husain, Shawkat Ara, *Politics and Society in Bengal, 1921-1936: A Legislative Perspective*, Dhaka: Bangla Academy, 1999.

Husain, Syed Anwar, *Bangladesh: National Scenario Foreign Policy and SAARC*, Dhaka: Agamee Prakashani, 2003.

Islam, M. Nazrul, *Problems of Nation-Building in Developing Countries: The Case of Malaysia*, Dhaka: University of Dhaka, 1988.

Islam, Syed Serajul, *Bangladesh: State and Economic Strategy,* Dhaka: The University Press Limited, 1988.

Jahan Rounaq, *Bangladesh Politics: Problems and Issues.* Dhaka: University Press Limited, 2005.

_____, *The British Constitution*, London: ELBS and Cambridge University Press, 1996.

_____, *Bangladesh: Promise and Performance,* Dhaka: Zed Book, 2000.

_____, *Political Parties in Bangladesh: Challenges of Democratization,* Dhaka: Prothoma Prokashon, 2015.

Jennings, I., *Parliament*, London: Cambridge University Press, 1969.

Johari, J.C., *Indian Political System*, New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd., Third Revised Edition, 1996.

Karim, W., *Election Under a Caretaker Government*, Second Impression, Dhaka: The University Press Limited, 2007.

Khan, Akbar Ali, *Discovery of Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 1997.

Khan, Zillur R., *Marshal Law to Marshal Law: Leadership Crisis in Bangladesh*, Dhaka: The University Press Limited, 1984.

Laski, H .J. *A Grammar of Politics*, London: George Allen and Unwin, 1955.

_____, *Liberty in the Modern State*, London: Faber & Faber, 1930.

Lenin, V. I., *State and Revolution*, New York: Little Lenin Library, 1932.

Lewis, J.R., *Democracy*, London: Allman and Son, 1966.

Lifschultz, Lawrence, *Bangladesh: The Unfinished Revolution*, London: Zed Press, 1979.

Lindsay, Alexander Dunlop, *Essentials of Democracy*, London: Oxford University Press, 1935.

Lipset, S. M., *Political Man: The Social Bases of Politics*, New York: Garden City, 1960.

Locke, J., *Two Treatise of Government*, (ed.) Peter Laslett, Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

Loewenstein, Karl, *British Cabinet Government*, New York: Oxford University Press, 1967.

Mackie, Gerry, *Democracy Defended*, New York: Cambridge University Press. 2003.

Macpherson, C.B., *Democratic Theory: Essays in Retrieval*, Oxford: Clarendon Press, 1973.

_____, *The Life and Times of Liberal Democracy*, Oxford: Oxford University Press, 1977.

Majumder, R. C., *History of Ancient Bengal*, USA: G. Bharadwaj and Co. 1971.

Maniruzzaman, Talukder, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Book International Limited, 1975.

Mannan, Md Abdul, *Election and Democracy in Bangladesh*, Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2005.

Manor, James (ed.), *Rethinking Third World Politics*, London and New York: Longman, 1991.

Marx, K., *Critique of Hegel's Philosophy of Right*, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

_____, *Capital*, Moscow: Progress Publishers, vol. I, II, 1974.

_____, *Theories of Surplus-Value*, Moscow: Progress Publishers, vol. I, II, III, 1971.

_____, *An Agenda for Good Governance*, Dhaka: Shahitya Prokash, 2007.

Masud, J. Chowdhury A. T. M., *Reminiscence of Few Decades and Problems of Democracy in Bangladesh,* Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2005.

Midlarsky, Manus I (ed.), *Inequality, Democracy and Development,* Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Mill, J.S., *On Liberty*, Middlesex: Penguin Books, 1977.

Montesquieu, M. R., *Selected Political Writings*, USA: Hackett Publishing, 1990.

Muhith, A. M. A., *Bangladesh: Emergence of a Nation*, Dhaka: Bangladesh Book International Limited, 1978.

Niemi, Richard G., Wiesberg, Herbert F. and Kimball, D.C., (ed.) *Controversies in Voting Behavio*r, New York: Congressional Quarterly Inc, 1984.

Pateman, Carole, *Participation and Democracy Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Paul, Ellen Frankel and Others (ed.), *Democracy*, New York Cambridge University Press, 2000.

Phillips, Anne, *Engendering Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Pinkney, R., *Democracy in the Third World*, London: Lynne Rienner Publisher, 2003.

_____, *The Republic*, trans. Cornford, F. M., Oxford: Oxford University Press, 1945.

_____, *The Statesman*, trans. Benjamin Jowett, Australia: The University of Adelaide, 2014, 1980.

Rahman, Masihur, *Democracy in Crisis*, Dhaka: The University Press Limited, 2008.

Rahman, Md. Saidur, *Law on Election in Bangladesh,* Dhaka: The University Press Limited, 2001.

Raphael, D.D., *Problems of Political Philosophy*, London: Macmillan, 1970.

Rashid, Harun-or, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1987.

Rawls, J. *A, Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press Paperback, 1973.

Razzaq, Abdur, *Bangladesh: State of a Nation*, Dhaka: University of Dhaka, 1981.

Riaz Ali, *State, Class and Military Rule: Political Economy of Martial Law in Bangladesh,* Nadi New Press, Dhaka, 1967.

Robertson, David, *A Dictionary of Modern Politics*, London: Europa Publication Limited, 1993.

Rousseau, J. J., *The Social Contract*, trans., Maurice Crasston, Middlesex: Penguin Books, Harmondsworth, 1968.

Sabine, G. H., *A History of Political Theory*, Delhi: I.B.H. Publishing Co., 1973.

Sartori, Giovanni, *The Theory of Democracy*, Revised, New Jersey: Chatham House Publishers Inc., 1987.

Schumpeter, J. A, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London: Routledge, 2013.

Sen, Amartaya, *The Idea of Justice*, Allen Lane, London: Penguin Book Limited, 2009.

Sen, Rangalal, *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka: The University Press Limited, 1986.

Siddiqui, Kamal, *Towards Good Governance in Bangladesh: Fifty Unpleasant Essays*, Dhaka: The University Press Limited, 2006.

Sorensen, G., *Democratization in the Third World: The Role of Western Politics and Research,* Purdue University: West Lafayette, 1998.

Suda, J. P., *A History of Political Thought*, India: Jai Parkash Nath and Company, 1969.

Taylor Gooby, P., *Public Opinion*, *Ideology and State Welfare*, London: Routledge and Kegan Paul, 1985.

Tung, Mao Tse, *On New Democracy*, Peking: Foreign Language Press, 1954.

Verma, Vidhu., *Malaysia: State and Civil Society in Transition*, London: Lynne Rinner Publishers, 2002.

Waldron, Jeremy, *The Dignity of Legislation*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Welch, Stephen, *The Theory of Political Culture,* London: The Macmillan Press Limited, 1993.

Wheare, K. C., *Federal Government*, London: Oxford Press Limited, 1968.

Wood, Alan T., *Asian Democracy in World History*, New York: Routledge, 2004.

Zamir, Muhammad, *Reflections on Governance and National Security in Bangladesh*, Dhaka: Nymphea Publication, 2006.

Ziring, Lawrence, *Bangladesh: From Mujib to Ershad, An Interpretive Study,* Dhaka: The University Press Limited, 1994.

আগিবালভা, ইয়েকাতেরিনা ও দনস্কই, *পৃথিবীর ইতিহাস: আধুনিক যুগের সূচনাপর্ব*, সুবীর মজুমদার (অনু.), ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২।

আরেফিন, সামছুল, এ. এস. এম., *বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১*, ঢাকা: বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩।

আহমদ, এমাজউদ্দিন, *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, ঢাকা: মৌল প্রকাশনী, ২০০২।

_____, *গণতন্ত্র*, ঢাকা: মৌল প্রকাশনী, ২০০৮।

_____, *গণতন্ত্রের বিকাশ: বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, ঢাকা: মৌল প্রকাশনী, ২০১০।

_____, *গণতন্ত্র এখন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ২০১৭।

_____, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা*, ঢাকা: করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯১।

আহ্মদ, সালাহ্উদ্দীন, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০০২।

ইসলাম, শহিদুল (সম্পা.), *মূল্যবোধ ও মানবতা*, ঢাকা: উত্তরণ, ২০০৫।

উদ্দীন, মুহাম্মদ আয়েশ, *রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি*, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ২০০২।

উমর, বদরুদ্দীন, *বাঙলাদেশের রাজনীতির দুই রূপ*, ঢাকা: আফসার ব্রাদাস, ১৯৯৫।

_____, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১২।

_____, *বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক*, ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১১।

এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক, *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*, ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৫।

কবির, নূরুল, *নৈর্বাচনিক স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম*, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১২।

করিম, জাওয়াদুল, *গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

করিম, সরদার ফজলুল (অনু.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

কামাল, সুলতানা, *মানবাধিকার সুশাসন ও গণতন্ত্র*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১২।

কালাম, এ.পি.জে. আবদুল, *টার্নিং পয়েন্ট*, মনোজিত কুমার দাস (অনূ.), ঢাকা: অন্যধারা, ২০১।

খান, আকবর আলি, *অবাক বাংলাদেশ: বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

খান, আখতার সোবহান, *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

খান, আজিজুর রহমান, *আমার সমাজতন্ত্র*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯।

খান, ইয়াসমিন (সম্পা.), *মানব অধিকার: নানা দিক*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৫।

খান, বদরুল আলম, *গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭।

_____, *সংঘাতময় বাংলাদেশ: অতীত থেকে বর্তমান*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫।

খান, মিজানুর রহমান, *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বির্তক*, ঢাকা: সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৫।

_____, *তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০।

খান, হায়দার আকবর, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, ২০১২।

খালেক, এ. এস. এম. আবদুল, *সামাজিক ন্যায়বিচার ও জন রলস*, ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১০।

*গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য*, ঢাকা: সংঘ প্রকাশন, ২০১০।

গ্রাৎসিয়ানস্কি, প.স. ও অন্যান্য, *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, ১ম, ২য় খণ্ড, ননী ভৌমিক (অনূ.), ঢাকা: অবসর, ২০০৯।

ঘোষ, রতনতনু (সম্পা.), *গণতন্ত্র স্বরূপ সংকট সম্ভাবনা*, ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১২।

চক্রবর্তী, সত্য সাধন ও নির্মল কান্তি ঘোষ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, কলকাতা: শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৯৯।

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ও রমাকৃষ্ণ মৈত্রী, *পৃথিবীর ইতিহাস*, ঢাকা: মাটিগন্ধা, ২০১৪।

চৌধুরী, মাহমুদ রেজা, *গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি*, ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ২০১৪।

চৌধুরী, *সিরাজুল ইসলাম*, *গণতন্ত্রের অমসৃণ পথ*, ঢাকা: সূচীপত্র, ২০১৭।

_____, *গণতন্ত্রের সন্ধানে*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশ, ২০০৯।

চক্রবর্তী, দেবাশিস, *রাষ্ট্রচিন্তার ধারা*, কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০১২।

জাভেদ, আহমেদ (সম্পা.), *বাংলাদেশের সংবিধান নানা প্রসঙ্গ*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০২০।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পা.), *গণতন্ত্র*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *বাংলাদেশের সুশাসনের সমস্যা*, ঢাকা: ২০১২।

ঠাকুর, আব্দুল হান্নান, *নির্বাচন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রাশিয়ার চিঠি*, ঢাকা: রহমান বুকস, ২০১৪।

দত্তগুপ্ত, শোভনলাল, *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৪।

দত্তগুপ্ত, শোভনলাল ও উৎপল ঘোষ, *মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০।

দত্ত, রমেশচন্দ্র, *বাংলার কৃষক*, কাজি ফারহানা আক্তার লিসা ও সাদাত উল্লাহ খান (অনু.), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮।

দাশ, দীপক কুমার (সম্পা.), *রাজনীতির তত্ত্বকথা*, প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব, কলকাতা: একুশে প্রকাশন, ২০১৬।

দাশ, প্রাণগোবিন্দ, *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০০৭।

_____, *আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব*, কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ২০১১।

নাথ, ধীরাজ কুমার, *গণতন্ত্র: সংকট ও উত্তরণ*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০০৯।

নাহিদ, নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও গণতন্ত্রের পথপরিক্রমা*, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১০।

পারভেজ, *আলতাফ, লেনিনের রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১৮।

ফজল, আবুল, *মানবতন্ত্র*, ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৬।

ফেমা, (FEMA), *জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য*, ঢাকা: ২০০৬।

বটোমোর, টম, *মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতাভ, *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস*, কলকাতা: সুহৃদ পাবলিকেশন, ২০১৭।

বিথাম, ডেভিড ও বয়েল, *গণতন্ত্র: ৮০টি প্রশ্ন ও উত্তর*, আলমগীর সিকদার লোটন (সম্পা.), ঢাকা: আকাশ, ১৯৯৮।

বেগম, এস এম, আনোয়ারা, *তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৩।

ব্যানার্জী, মমতা, *গণতন্ত্রের লজ্জা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

ভট্টাচার্য, মোহিত ও বিশ্বনাথ ঘোষ, *জনপ্রশাসন ও পরিকল্পনা*, কলকাতা: ওয়াল্ড প্রেস, ২০১৯।

ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, *সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন*, কলকাতা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০।

ভূঁইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ, *বাংলাদেশ দলীয় ব্যবস্থা: একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, মিতা প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৫।

মজহার, ফরহাদ, *সংবিধান ও গণতন্ত্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৪।

মজুমদার, বদিউল আলম, *সমকালীন রাজনীতি ও উন্নয়ন ভাবনা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৮।

মজুমদার, সমীরণ, *মার্কসবাদ: বাস্তবে ও মননে*, কলকাতা: স্বপ্রকাশ, ১৪০২।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার, *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংকট ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০১।

মহাপাত্র, অনাদিকুমার, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, কলকাতা: সুহৃদ পাবলিকেশন, ২০০০।

মাননান, মোঃ আব্দুল, *বাংলাদেশের গণতন্ত্র: সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০০২।

মার্কস, কার্ল, *গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা*, ২য় খণ্ড, প্রথম অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২।

মার্কস, কাল, ও এঙ্গেলস ফ্রেডরিক, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, প্রথম খণ্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২।

_____, *জার্মান ভাবাদর্শ*, গৌতম দাস (অনূ.), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৯।

মাহমুদ, শফিক, *বাংলাদেশের স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি*, ঢাকা: বর্ণবীণা প্রকাশনী, ১৯৯৫।

_____, *জনগণ সংবিধান নির্বাচন*, ঢাকা: আমাদের বাঙলা প্রেস লি., ১৯৯৬।

মিল, জন স্টুয়ার্ট, *প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার*, দরবেশ আলী (অনূ.), ঢাকা: নালন্দা, ২০০৭।

মুখোপাধ্যায়, প্রলয়দেব, *রাষ্ট্র ও রাজনীতি*, ঢাকা: বিজয়া পাবলিশিং, ২০১৬।

মুহাম্মদ, আনু, *কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ*, ঢাকা: সংহতি, ২০১৩।

মুহিত, আবদুল মাল আবুল, *নির্বাচন ও প্রশাসন*, ঢাকা: সময়, ২০১৯।

মোস্তফা, মনোয়ার, *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও নাগরিকদের ভূমিকা: একটি সমীক্ষা*, ঢাকা: ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি), ২০০৬।

ম্যাকাইভার, আর. এম., *আধুনিক রাষ্ট্র*, এমাজউদ্দিন আহমদ (অনূ.) সময় প্রকাশন, ২০০০।

রশীদ, হারুন, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪।

রশীদ, হারুনুর, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩।

রহমান, আতিউর, *সুশাসনের সন্ধানে*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৩।

রহমান, তারেক মুহাম্মদ তওফীকুর, *বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা: সুচনা, বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ*, ঢাকা: কেটিথ্রি পাবলির্শাস, ২০০৯।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, *সৃজনশীল গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায়*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৮।

রহমান, মোঃ মাকসুদুর, *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বয়াত্তশাসন*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৮৮।

_____, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, রাজশাহী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বোর্ড, রাজশাহী, ১৯৯৬।

রাজ্জাক, মানিক মোহাম্মদ, *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*, ঢাকা: নালন্দা, ২০১৫।

রায়, জয়ন্তকুমার, *গণতন্ত্র এবং জাতীয়তার অগ্নিপরীক্ষা: বাংলাদেশ ১৯৪৭-১৯৭১*, কলকাতা: এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৬।

রায়, শিবনারায়ণ, *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১।

_____, *প্রবন্ধ সংগ্রহ-২*, কলকাতা: আনন্দ, ২০১২।

রায়, স্বদেশ, *সামরিক গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: পাণ্ডুলিপি, ১৯৯৩।

রাসেল, বার্ট্রান্ড, *ক্ষমতা*, আরশাদ আজিজ (অনূ.), ঢাকা: অবসর, ২০১১।

_____, *নতুন আশা নতুন পৃথিবী*, কামরুন নেছা, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাইভেট) লিমিটেড, ২০০১।

_____, *রাজনৈতিক আদর্শ*, আবুল কাসেম ফজলুল হক (অনূ.), জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১২।

রেহমান, তারেক শামসুর (সম্পা.), *বাংলাদেশ: রাজনীতির ২৫ বছর*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

_____, *বাংলাদেশে রাজনীতির চার দশক*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১।

_____, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১০।

লাস্কি, হ্যারল্ড, *রাজনীতির গোড়ার কথা*, এম.এ. ওয়াদুদ ভূঁইয়া (অনূ.), প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।

লিন্ডসে, এ. ডি., *আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র*, মুহম্মদ আয়েশ উদ্দিন (অনূ.), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

লিপসন, লেসলি, *গণতান্ত্রিক সভ্যতা*, আবুল বাশার (অনূ.), জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশ, ২০১৮।

শফিক, মাহমুদ, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনীতিক বিপর্যয়*, ঢাকা: বর্ণবাণী, ১৯৯৩।

শরীফ, আহমদ, *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০০৬।

_____, *সংকট*, ঢাকা: মহাকাল, ২০১৪।

শিবলী, আতফুল হাই ও মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস*, ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৯।

সেতুং, মাও, *জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে*, পিকিং: বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, ১৯৫৭।

সেন, অমর্ত্য, *নীতি ও ন্যায্যতা*, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ও রানা কুমার (অনূ. ও সম্পা.), কলকাতা: আনন্দ, ২০১৩।

সেন, অরুণ কুমার, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৯৮০।

সেবাইন, জর্জ. এইচ., *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংমু ঘোষ (অনূ.), কলকাতা: বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট, ১৯৯৯।

স্তেপানভা, ইয়েভগেনিয়া, *কার্ল মার্কস*, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৭।

হক, আবুল কাসেম ফজলুল, *গণতন্ত্র ও নয়াগণতন্ত্র*, ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১২।

_____, *অবক্ষয় ও উত্তরণ*, ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০০৯।

_____, *রাষ্ট্রচিন্তায় বাংলাদেশ*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৮।

হক, আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর: টাউন স্টোর্স প্রকাশনী, ১৯৯৫।

হক, মোঃ মোজাম্মেল, *রাজনীতি-নির্বাচন*, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯।

হান্টিংটন, পি. এস., *সভ্যতার বিরোধ ও শান্তি*, আহ্সান উল্লাহ (অনূ.), ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০১৪।

হাসানুজ্জামান, *বাংলাদেশে উপদলীয় কোন্দল ও দল ভাঙার রাজনীতি*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫।

হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন: ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১।

হুইয়ার, কে. সি., *আধুনিক শাসনতন্ত্র*, আরশাদ আজিজ (অনূ.), ঢাকা: অবসর, ২০১২।

হোসেন, আমজাদ, *বাংলাদেশে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, ঢাকা: পড়ুয়া প্রকাশনী, ১৯৯৬।

হোসেন, গোলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, , ১৯৯২।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩।

**পত্রপত্রিকা**

*Bangladesh Observer*, February 28, 1991.

_____, October 2, 2001.

_____, October 3, 2001.

_____, October 4, 2001.

*The Daily Star*, 24 February 2009.

*আজকের কাগজ*, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০০১।

*আজকের সূর্যোদয়*, ৪-১০ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

*দৈনিক ইত্তেফাক*, মার্চ, ১৯৮৮।

_____, জানুয়ারি, ১৯৮৯।

_____, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।

_____, ১৪ জুন, ১৯৯৬।

*দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

_____, ১২ ডিসেম্বর ২০০৬।

*দৈনিক বাংলা*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬।

_____, এপ্রিল, ১৯৮৬।

*দৈনিক যুগান্তর*, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৬।

_____, ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৬।

_____, মার্চ, ২০০৭।

*দৈনিক সংবাদ*, ৫ মে, ১৯৯৬।

*সাপ্তাহিক রোববার*, মার্চ, ১৯৯১।

_____, এপ্রিল, ১৯৯৬।

_____, জুন, ১৯৯৬।

_____, সেপ্টেম্বর, ২০০১।

*সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, এপ্রিল, ১৯৮৬।

_____, মে, ১৯৮৮।

*Dhaka University Institutional Repository*

*জনকণ্ঠ পাক্ষিক*, ৭-২১ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

*প্রথম আলো*, সেপ্টেম্বর, ২০০১।

_____, আগস্ট ২০০১।

_____, মার্চ ২০০৭।

_____, ১০ জুন, ২০১৩।

_____, ৭ জানুয়ারি ২০১৫।

_____, ১৫ নভেম্বর ২০১৬।

_____, ১ অক্টোবর ২০১৬।

_____, ৮ জুলাই ২০২০।

_____, ৫ আগস্ট ২০২০।